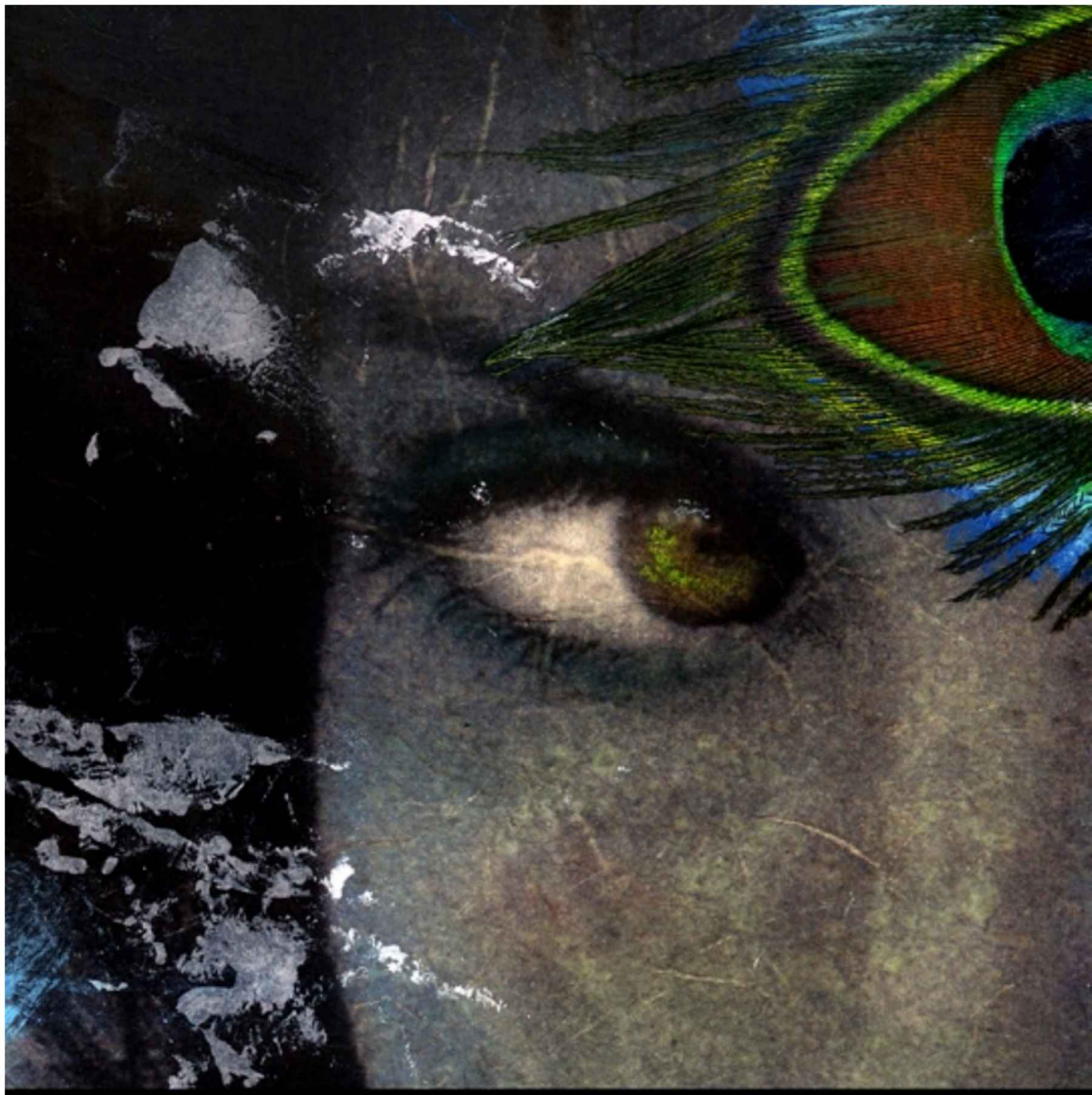

নীল ময়ূরের যৌবন

সেলিনা হোসেন

মেঘবরন চুল শবরীর, তেমন তার গোছা। দুপুরের পর থেকে শুরু করেছে, কাঁকইয়ে ধরে না। সে চুলের গোছা সামলাতে সময়টা শেষবিকেল হয়ে যায়। হাঁটু মুড়ে বসে থাকার জন্য পায়ের পাতায় ঝিঁঝিঁ ধরেছে। খোঁপায় ময়ূর পালক গুঁজে দিয়ে ও উঠে দাঁড়ায়। প্রথমে বাম পা এবং পরে ডান পা বেশ করে ঝাঁকিয়ে নেয়, তবু ঝিম ভাবটা সহজে কাটতে চায় না। এর মাঝে মনে খুশি, পছন্দমতো সাজতে পারলেই শবরী নিজেকে সবচেয়ে সুখী মনে করে। পুবদিকের বেড়া থেকে গুঞ্জার মালা নিয়ে গলায় ঝুলিয়ে দেয়। হাতে কেয়ূর। কটিদেশে মেখলা, পায়ে মল শবরীর বিশেষ সখ। ঘুরেফিরে নিজেকে দেখে। সারাদিন চন্দন লেপে রাখার দরুন মুখটা এখন আশ্চর্য পেলব, গালে হাত ঘষে নিজেই অবাক হয় ও। চন্দনের মৃদু সুরভি শরীর থেকে উঠে আসে। ওর মনে হয় সৌন্দর্যচর্চা প্রার্থনার মতো, গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হয়ে না থাকলে প্রার্থনা ছুটে যায়। ছুটে গেলে ঈশ্বরকে যেমন একমনে ডাকা যায় না, তেমন সৌন্দর্যচর্চাতেও খুঁত থাকে। তখন অস্বস্তি হয় ওর। নিজেকে আর কিছুতেই সৌন্দর্যের স্রষ্টার ভূমিকায় রাখতে পারে না। কাহ্নুপাদও শবরীর সেই ত্রুটি সইতে পারে না। তাই সৌন্দর্যচর্চায় শবরীর বিরামহীন প্রচেষ্টায় ও যখন শিল্পী হয়, তখন কাহ্নুপাদ ওর সামনে নতজানু হয়। গদগদ স্বরে প্রার্থনার ভাষায় ভালোবাসার কথা বলে। বলে, 'তুমি এক পবিত্র মন্দির শবরী। সারাক্ষণ সেখান থেকে আরতির ঘণ্টা শুনতে পাই। এ এক চমৎকার প্রার্থনার ভাষা। এর বাইরে আমি আর কোনোকিছু বুঝতে চাই না। বুঝি না ঈশ্বর, বুঝি না বেদ।'

কিন্তু একই সঙ্গে হৃদয় তার ভিন্ন কথা বলে। প্রবল যন্ত্রণায় ছটফটালে উচ্চারিত হয়, এই সৌন্দর্য অর্থহীন, যদি না বেঁচে থাকা অর্থবহ করা যায়, যদি না বেঁচে থাকার পরিবেশ নিজের না হয়, যদি না পরিবেশ প্রভুত্বের জাঁতাকলে পিষ্ট হয়।

শবরী দৃষ্টি সুঁচালো করে বলল, 'কী ভাবছ?'

'কিছু না।'

কাহ্নুপাদ মাথা নাড়ে। শবরী তখন বাঁধ ভেঙে খিলখিলিয়ে হাসে। হাসতে হাসতে টের পায় ওর বুকের ভেতর সুখের হরিণ কাঁপে। কাহ্নুপাদের কাছ থেকে যেটুকু শোনে তাই নিয়েই ভাবে, 'কানু কী সুন্দর করে কথা বলে। ওর মতো আর কেউ পারে না।'

টিলার ওপরের এই চাঁচর বেড়ার ঘর থেকে দূরের অরণ্য নীলাভ দেখায়। রোদ এখন নেই, শবরী চঞ্চল হয়ে ওঠে। একটু পরে কানু আসবে। এই সময়টায় ওর খুব অস্থির লাগে। পোষা ময়ূরের সঙ্গও তেমন আনন্দদায়ক মনে হয় না। ও ঘর-বার করতে থাকে। সারাদিন কাহ্নুপাদের দেখা মেলে না। ভোর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত রাজদরবারে ওর সময় কাটে। সন্ধ্যার আগে ও ঘরে ফেরে। এ নিয়মের ব্যতিক্রম নেই। মাঝে মাঝে কাহ্নুপাদ এ কাজ ছেড়ে দিতে চায়। একদিন ও হয়তো তাই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করবে। ওর কখন যে কী ভালো লাগে বোঝা দায়। শবরী বোঝে রাজদরবারের কাজ অনেক সম্মানের, ছাড়বে কেন কানু? এ প্রশ্নের উত্তর ও কোনোদিনই পায় না। বিয়ের প্রথম দিকে খারাপ লাগলেও এখন ও মেনে নিয়েছে। বরং প্রতীক্ষার এ তীব্রতায় রাত্রি অন্যরকম হয়। ওর এ রাত্রির নিজস্ব রং আছে; তা কালো নয়, বর্ণাঢ্য। চাঁদের নরম আলো চাঁচর বেড়ার বাড়িটাকে উৎসবমুখর করে তোলে। টিলাজুড়ে কার্পাস ফুল ফুটে আছে। সাদা কার্পাস ফুল ছুঁয়ে শবরী টিলা বেয়ে নামতে থাকে। ওর মনোযোগ না পেয়ে ময়ূরটা আরও আগে নীচে নেমে গেছে। সাদা ফুলের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ওটা এখন পেখম ছড়িয়ে নাচছে। বাড়ির পেছনে কঙ্গুচিনা ফলের গাছ, ফল পেকেছে। তা দিয়ে হাঁড়িয়া বানিয়েছে শবরী। ও কার্পাস গাছের পাশে পা ছড়িয়ে বসে, ঝুমঝুমিয়ে মল বেজে ওঠে। চারদিকে নীলাভ অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। বুনোফুলের তীব্র গন্ধ দিকবিহীন ছুটছে। ঝিম ধরে শবরীর মাথায়। চারদিকের পরিবেশ উৎসবের জন্য প্রস্তুত, অথচ কানু নেই। এই টিলা, অরণ্য, কার্পাস বাগান, কঙ্গুচিনা গাছের সারি কানু ছাড়া অর্থহীন। কিছুই ভালো লাগে না ওর। এখন তো সংসারে তেমন করে প্রবেশ করেনি, সন্তান নেই, বাড়তি কাজের ঝামেলা নেই, এখন তো স্বপ্নের সময়, শুধু স্বপ্ন কেটে যায় ঠিকমতো কানুকে না পেলে। ওর মনে হয় কানু ওকে ঘরগেরস্থির গৃহিনী হিসেবে দেখে না। কানুর কাছে ও আরও একটু ওপরের কিছু, যেটাকে ও ধুলোবালির আবর্জনা থেকে আড়াল করে রাখে। সেজন্যই ওর এত আয়োজন, নিরাভরণ শবরী কাহ্নুপাদের মনোযোগ ধরে রাখে না। হয়তো কাহ্নুপাদ কবি বলে এমন চায়, যে চাওয়া মানুষকে স্বপ্নের মধ্যে টেনে নেয়। যে চাওয়ার ভেতর দিয়ে কানু সবাইকে সৌন্দর্যপ্রিয় করে তোলে, সবাইকে কবি করতে চায়।

ঝিঁঝিটের একটানা শব্দ আসে। শবরীর মন খারাপ হয়ে যায়। আজ যেন একটু বেশি দেরি হচ্ছে কানুর। ও ঘাসের ওপর জোরে জোরে পা দাপায়। দূর্বায় ডুবে যায় পা। আর তখুনি ওর ইন্দ্রিয় তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে। ও বুঝতে পারে যে দ্রুতপায়ে কাহ্নুপাদ আসছে। শিস বাজিয়ে চলা ওর অভ্যেস এবং ওর শিসের একটা নিজস্ব ঢং আছে। যে কেউ বুঝতে পারে ওটা কাহ্নুপাদই। কানু এসে ওর হাত ধরে কার্পাস গাছের আড়ালে আসে। শবরীর শরীরের চন্দনের গন্ধ ওকে পাগল করে দেয়। ময়ূর পালক গোঁজা চুলের অরণ্যে মুখ গোঁজে। এ সবই ওর প্রিয় অভ্যেস।

অভিমানে শবরীর ঠোঁট কাঁপে, 'আজ এত দেরি করলে যে?'

'দেরি কোথায়? দ্যাখো পাহাড়ের মাথা থেকে সন্ধ্যার আলো এখনও মুছে যায়নি।'

'মিথ্যে কথা। রাত নেমেছে কখন। আমার মনে হয়েছে কত রাত ধরে যেন বসে রয়েছি।'

'প্রতীক্ষার সময় খুব খারাপ সখি। আর সেজন্যই মিলন এত মধুর। তা ছাড়া তুমি আমাকে বেশি ভালোবাসো কিনা—'

'মোটেই না।'

শবরী মাথা ঝাঁকিয়ে প্রতিবাদ করে। কাহ্নুপাদ প্রাণভরে হাসে। ও জানে শবরী মিথ্যে প্রতিবাদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মধ্য দিয়ে অভিমান তীব্র করে। এসবের মধ্য দিয়ে সারাদিনের ক্লান্তি মুছে যায় এবং সেদিনের মতো গ্লানিটুকুও ধুয়ে দেয় শবরী। কাহ্নুপাদ পরের দিনের জন্য নিজেকে নতুন করে তৈরি করে, ভুলে যায় রাজদরবারের মেকি জৌলুস এবং আড়ম্বরের ঘনঘটা। শবরীর কাছে ফিরে এসে ও মনেপ্রাণে নিজেকে নিজের মতো করে ভাবতে চায়। বুঝতে চায় রাজদরবারের ফাঁকিটুকু। এই বোধ একটু একটু করে ওকে অনুপ্রাণিত করে। ও বুঝতে পারে নিজেরটুকু নিয়ে বেঁচে থাকার মধ্যেই সব গৌরব। শবরীর গলা থেকে গুঞ্জার মালা খুলে নিজের হাতে জড়িয়ে নেয় কাহ্নুপাদ। তারপর ওর কোলের ওপর মাথা রেখে টানটান শুয়ে পড়ে। পায়ের কাছে কার্পাসের ডাল নুয়ে থাকে। ময়ূরটা নেচে নেচে ঘরে ফিরে যায়। চঞ্চল হয়ে ওঠে শবরী।

'ঘরে চলো কানু।'

'ঘর? ঘর আবার কী? এই তো ঘর। আমি বুঝি না এমন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ফেলে মানুষ কেন ঘরে যায়। ঘরে আমি আনন্দ পাই না সখি। মনে হয় চারপাশের বেড়াগুলো বাতাসের পথ আটকে দেবার জন্য, ফুলের সৌন্দর্য ঢেকে রাখার জন্য, অন্ধকারের মোহন আকর্ষণ উপেক্ষা করার জন্য তৈরি।'

'সবাই তো তোমার মতো কবি নয়।'

'একটা বিশেষ সময়ে সবার কবি হওয়া উচিত সখি। নইলে আনন্দের মুহূর্ত তেমন জমে না। জানো আমি দেশের রাজা হলে কী করতাম?'

'কী?'

'বলতাম, যে যে কাজই করুক সকলেরই বিশেষ সময়ে কবি হতে হবে, বাধ্যতামূলক। এটাই হবে আমার রাজ্যের আইনের প্রথম শর্ত। নইলে বেঁচে থাকা অর্থহীন।'

'ভাগ্যিস তুমি রাজা হওনি, তাই সবাই বেঁচে গেছে।'

শবরী খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে। এক ঝলক ঠান্ডা বাতাস বয়ে যায়, অনেক দূরে ভূতুম ডাকে একটা। কাহ্নুপাদ আনমনা হয়ে যায়। বুকের ভেতর চাপ অনুভব করে। না, রাজা নয়, ও তো সবাইকে নিয়ে তেমন একটা বিশাল ঘর চায় যেখানে ওরা নিজেরাই সব। ওদের ওপর কারও কোনো কর্তৃত্ব থাকবে না। এসব কথা কাউকে বলা যায় না। এসব ভাবনা ওর মাথায় প্রবল হয়ে উঠলে ও হাঁড়িয়ার তৃষ্ণায় ব্যাকুল হয়ে যায়।

তখন শবরী প্রিয় কথা বলে, 'ওগো হাঁড়িয়া করেছি।'

'হাঁড়িয়া? আজ হাঁড়িয়ার উৎসব। আহ্—।'

কাহ্নুপাদ উঠে বসে, 'এখুনি নিয়ে এসো।'

শবরী দ্রুত টিলা বেয়ে উপরে উঠে যায়। কাহ্নুপাদের মগজে নেশার আমেজ। শবরীর দেহে আছে এক অপরূপ মদিরা, মৃদঙ্গের মতো বাজে। কঙ্গুচিনার হাঁড়িয়া ওই নেশাকে আরও জমিয়ে তোলে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বুকের মধ্যে মৃদঙ্গের ধ্বনি ভৈরবী রাগের লয়ে কাহ্নুপাদকে এক বিস্মৃতির তলে টেনে নিয়ে যায়। ও ক্লান্তি ভুলতে থাকে। হঠাৎ মনে হয় প্রকৃতি নীরব, উদাস। ভূতুমের ডাক নেই। এখনই সময় সৃষ্টির। কাহ্নুপাদ চুমুক চুমুক হাঁড়িয়ার সঙ্গে শবরীর শরীরে নেশার উৎসব ঘনিয়ে তোলে। জীবনের এত আনন্দ আর কোথাও নেই।

'ওগো, আর খেয়ো না।'

শবরী কাহ্নুপাদের হাত চেপে ধরে।

'না, না, বাধা দিও না।'

কাহ্নুপাদের কণ্ঠ জড়িয়ে যায়। চোখের সামনে থেকে অদৃশ্য হয়ে যায় চাঁচর বেড়ার বাড়ি, কার্পাস ফুল, কঙ্গুচিনার গাছ। কোথাও কিছু নেই। কাহ্নুপাদের চোখের সামনে ময়ূরের মতো পেখম তুলে জেগে উঠেছে শবরী। পটভূমিতে অনন্তকালের রাত্রি।

'আর খেয়ো না গো—'

'বাজে কথা বলতে নেই সখি। তোমার কণ্ঠে বাজে কথা কেন? তুমি এত অপূর্ব কেন শবরী? কেন তোমার সব কিছুতে এমন নিপুণ শিল্পীর হাত? এমন হাঁড়িয়া আমি কখনোই বানাতে পারব না। তুমি আমাকে বাধা দিও না।'

বলতে বলতে আচ্ছন্ন হয়ে আসে কণ্ঠ। ও স্পষ্ট দেখতে পায় নিজের অস্তিত্বে আর স্থিতি নেই শবরীর। ও এখন এক চমৎকার মায়ার হরিণ, সামনে বিশাল বন। তিরধনুক হাতে নিয়ে ছুটছে কাহ্নুপাদ, কিন্তু কিছুতেই হরিণের নাগাল পায় না। ছুটে বেড়াচ্ছে বনের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে, পথ আর ফুরোয় না। কিন্তু পথ যত দীর্ঘই হোক না কেন ওই হরিণীকে ধরা চাই। হাঁড়িয়ার হাঁড়িতে শেষ চুমুক দেয় কাহ্নুপাদ। তারপর শবরীকে কাছে টেনে বলে, 'জানো সখি, নেশা হওয়ার পর তোমাকে আর বউ বলে মনে হয় না, মনে হয় অন্য নারী। যে নারীর ওপর কোনো অধিকার নেই, অথচ যাকে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা দুর্বার হয়ে ওঠে। যাকে পাওয়ার জন্য মন পাগল হয়ে যায়।'

শবরী মুখ ঘুরিয়ে বলে, 'তুমি এমন করে কাছে রেখে আমাকে পর করো।'

কাহ্নুপাদ শবরীর মুখ নিজের দিকে ঘুরিয়ে বলে, 'তোমাকে কেন্দ্র করেই তো আমার সব ইচ্ছা জাগে। তোমাকে আমি কতভাবে যে দেখি সে তুমি বুঝতে পারবে না। আমি তোমাকে তা বোঝাতেও চাই না শবরী। শুধু আমার স্বপ্নের রাশ তুমি টেনে ধরবে না।'

'তোমার এসব কথা শুনলে আমার ভয় করে। মনে হয় তুমি অনেক দূরের কেউ। তোমার নাগাল আমি পাব না।'

সাড়া নেই কাহ্নুপাদের। ও নেশায় নিমজ্জিত হয়ে গেছে। শবরী কাহ্নুপাদের চুলের ভেতর হাত রাখে। ডাকতে গিয়ে থমকে যায়, থাক বেচারা! ও দেখে কাহ্নুপাদের পুরুষালি কালো গাট্টা শরীরটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেমন অসহায়ের মতো ঘাসের ওপর পড়ে আছে। একজন অচেনা মানুষ দেখার মতো ও কানুর দিকে তাকিয়ে থাকে। ভেবে কুলিয়ে উঠতে পারে না যে কানুর মাথার ভেতর কেমন করে এতকিছু আসা-যাওয়া করে। শবরীর বুকের ভেতর সুখের হরিণ কাঁপে।

রাজদরবারে পাখা টানার কাজ করে কাহ্নুপাদ। রাজা বুদ্ধমিত্রের অশেষ দয়ায় কাজটা জুটেছে। নইলে ব্রাহ্মণদের প্রচণ্ড প্রতাপে তার পাশে যাবার সাধ্য কারও নেই, অন্তত অন্ত্যজ শ্রেণির লোকদের। একদিন বুদ্ধমিত্র ঘোড়ার শকটে যাবার পথে গাড়ির চাকা কাদায় দেবে যায়। কাহ্নুপাদ চালকের সঙ্গে ভীষণ পরিশ্রমে সে চাকা তোলায় সাহায্য করেছিল। রাজা খুশি হয়ে ওকে রাজদরবারে কাজ দিয়েছে। প্রথম প্রথম কাহ্নুপাদের ভালোই লাগত। অন্তত মাস গেলে একটা মাসোহারা পাওয়া যেত। কিন্তু আস্তে আস্তে ও বুঝতে পারে যে প্রতিদিন ওকে গরল হজম করতে হয়। রাজার ব্রাহ্মণ মন্ত্রী এবং পরিষদের অন্যান্যরা ব্যাপারটা সুনজরে দেখে না। সবসময় এটা-ওটা নিয়ে ওকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে, পেছনে লেগে থাকে। এই অপমান ওর গাঁয়ে বিছুটির জ্বালা, কিন্তু যেহেতু রাজা ওকে স্থায়ী করেছে সেজন্য ছেড়ে চলে যাবার অধিকার নেই ওর। রাজদরবার ইচ্ছে করলে ওকে ছাড়িয়ে দিতে পারে, সেটা রাজার খুশি। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত একটুও বিশ্রাম নেই কাজের। রাজা দরবারে না থাকলেও পাখা টানতে হয়। অন্য লোকেরা তো থাকে। পাখা টানতে টানতে কাহ্নুপাদের হাত যখন অবশ হয়ে আসে মনের মধ্যে কবিতার পংক্তি গুনগুনিয়ে ওঠে। কখনো সে পংক্তি ভালোবাসার, কখনো প্রতিবাদের। কিন্তু প্রতিবাদ সরাসরি করতে পারে না বলেই তার গায়ে আবরণ দিতে হয়। ওদের জীবনের চারদিকে ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রবল প্রতাপ। সে শ্বাসরোধী প্রতাপ ওদেরকে কোনোদিনই এগুতে দেয় না। কার্পাস ধুনোর মতো আনন্দ ছিন্নভিন্ন হয়। কাহ্নুপাদ বিষণ্ণ হয়ে থাকে। ব্রাহ্মণ্যবাদের এই পীড়ন থেকে মুক্তি পেতে চায় কিন্তু পথ খুঁজে পায় না।

আলিএঁ কালিএঁ বাট রুন্ধেলা।
তা দেখি কাহ্নু বিমনা ভইলা।।

পাখা টানতে টানতে কাহ্নুপাদ কেবলই নিজেকে প্রকাশের পথ খোঁজে। ভেতরে ভেতরে নিদারুণ জ্বালা গনগনে হাঁপরের মুখ খুলে রাখে, ও অনবরত পোড়ে। কোথায় গিয়ে কী করবে বুঝতে পারে না।

কাহ্নু কহিঁ গই করিব নিবাস।
জো মন গোঅর সো মো উআস।।

কাহ্নুপাদ আজও হাঁড়িয়ার নেশার ভেতর যখন স্বপ্ন দেখে তখন ঠিক এ ধরনের যন্ত্রণাই তীব্র হয়ে ওঠে। ও ঘুমের ঘোরে বিড়বিড় করে। সে অস্পষ্ট ধ্বনিতে শবরীর ঘুম ভাঙে। তখনও পুরো ভোর হয়নি। শবরী কাহ্নুপাদের গাঁয়ে ঠেলা দেয়।

'ওগো ওঠো, কী বলছ ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

‘চারদিকে ভীষণ অন্ধকার, পথও বন্ধ। এগুতে পারছি না।’

‘কী ছাইপাশ যে বলো কিছুই বোঝা যায় না।’

‘আমিও বুঝি না, শুধু মাথা ভার হয়ে থাকে।’

কাহ্নুপাদ চোখ বোজে। শবরী শিথিল বসন গোছায়। আড়মুড়ি ভাঙে। দু-পা মেলে দিলে দেখে পায়ে আলতার রং ফিকে হয়ে এসেছে। ও ঘাসে পা মোছে। কাহ্নুপাদের পাল্লায় পড়ে ওকে মাঝে মাঝে এমনই খোলা আকাশের নীচে রাত কাটাতে হয়। কিছুতেই ঘরে যেতে চায় না। ওর নিজেরও যে ভাল লাগে না তা নয়। শবরী কাহ্নুপাদের মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে, ‘ওঠো, আলো ফুটেছে।’

‘তাতে কী? আমি উঠব না।’

‘তোমাকে কাজে যেতে হবে।’

‘কাজ?’

কাহ্নুপাদ চোখ খোলে। রাজা কিছু না বললেও মন্ত্রী দেবল ভদ্র একটুও এদিক-ওদিক সইতে পারে না। সময়মতো দরবারে পৌঁছোতে হয়। ও খোঁয়ারি নিয়ে উঠে বসে। মাথা সোজা রাখাই মুশকিল। দু-হাতে মাথার চুল ধরে ঝাঁকুনি দেয়। তারপর শবরীর আঁচল ধরে টানে।

‘চলো নদী থেকে নেয়ে আসি।’

‘আহ্ ছাড়ো।’

‘না।’

কাহ্নুপাদের হাঁড়িয়া-দৃষ্টিতে বুনো-রোদ ঝিলিক দেয় এবং তা সঙ্গে সঙ্গে শবরীর চন্দন-শরীরে লুটিয়ে পড়ে।

কাগনি ধানের ভাত রেঁধেছে শবরী। ঘরের মেঝেয় হরিণের চামড়া বিছিয়ে খেতে বসেছে কাহ্নুপাদ। সামনে ভাতের থালা, ধোঁয়া উঠছে। জলের ভাঁড় তরকারির বাটি। কাঁসার বাটিতে মৌরলা মাছের ঝোল এবং হরিণের মাংসও আছে। সামনে হিঞ্চে ডাঁটার আসনে হাঁটু মুড়ে বসে আছে শবরী। বেশিরভাগ সময় ও এই ভঙ্গিতেই বসে। হাতে কেয়ূর নেই, কটিদেশেও খালি, দিগলদাগল চুলের রাশি বেয়ে জল ঝরে। নদীতে ডুবিয়ে আসার পর ভালো করে চুল ঝাড়া হয়নি। কাহ্নুপাদ খেয়ে চলে গেলে তখন নিজেকে নিয়ে বসবে। নিরাবরণ শবরীর দীপিত সৌন্দর্য ওকে মুগ্ধ করে। হরিণের মাংস মুখে দিতে গিয়ে সেটা শবরীর মুখে গুঁজে দেয়।

আকস্মিকতায় বিব্রত হয় শবরী, ‘আহ্ কী হচ্ছে?’

‘তুমি খাও আগে, তারপর তোমার প্রসাদ আমি নেব।’

‘না, কখনো না।’

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

‘হ্যাঁ।’

‘পাপ হবে।’

‘পাপ? কীসের পাপ, কীসের পুণ্য? তুমি তো জানো এটাই আমার প্রার্থনা। এভাবেই আমি দেবতাকে তুষ্ট করি।’

কাহ্নুপাদের চোখে অনুরাগের শাসন। শবরী মাংসের টুকরো দাঁতে কামড়ে ধরে। মনে মনে বলে, ‘ও এমন পাগল বলেই ওর জন্যে মরে যেতেও কষ্ট হবে না।’

হরিণের মাংসের ছোটো ছোটো টুকরো দিয়ে তৃপ্তি সহকারে খায় কাহ্নুপাদ। মাছের ঝোলও চমৎকার হয়েছে। শবরী নিজে যেমন কালো পাথরে খোঁদাই করা মসৃণ মূর্তি, তেমনই তার হাতের কাজ। ওর মসৃণ পেলব ত্বকে আলো ঝলকায়, চমৎকার শরীরের গঠন, বাঁকে বাঁকে টাল খায়। ওর জুড়ি হয় না। শুধু পেট নয়, কাহ্নুপাদের মনও ভরে থাকে কানায় কানায়। খেতে ভালোবাসে ও। শবরী যতটা সম্ভব নতুন নতুন খাবার বানাতে চেষ্টা করে। বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে নানারকম জিনিস সংগ্রহ করে। বেতি শাক, হেলেঞ্চা, গিমা, সজনে, সরপুঁটি, চিংড়ি, শামুক, কাঁকড়া সব কাহ্নুপাদের প্রিয়। ও পাহাড়ের দিক থেকে শামুক খুঁজে আনে, কচি বেতের ডগা কেটে আনে। বেতের ডগা দু-দিন জলে ভিজিয়ে রেখে মসুরির ডালের সঙ্গে বেটে বড়া ভেজে দেয়। গুঁড়া মাছ ধনে পাতা, কাঁচামরিচ এবং মশলা দিয়ে মাখিয়ে কলাপাতায় মুড়ে মাটির খোলায় করে রেঁধে দেয়। এসব পেলে সেদিন উৎসবের মতো আনন্দ করে ভাত খায় কাহ্নুপাদ, কিন্তু সবসময় এসব করার সঙ্গতি কোথায়? ইচ্ছে থাকলেই কি তার পূরণ হয়? একটা বা দুটো, এর বেশি ব্যঞ্জন এক বেলায় রাঁধা হয় না। তখন নিজেকে খুব অপরাধী মনে হয় ওর। তবু সংসারে লোক কম বলে এইসব জোটে। একটা খরগোশ পেলে ও নিজে না খেয়ে কানুর জন্য দু-বেলা করে।

‘কী ভাবছ? নাও, এই মাংসটা আর একটু খাও।’

‘না, তোমার জন্য থাক। হরিণের মাংস তুমি বেশি ভালোবাসো।’

‘ভালোবাসলেই একলা খেতে হবে?’

‘আমার তো বেশি ভালো লাগে না।’

কাহ্নুপাদ হো-হো করে হাসে, ‘তোমার কী ভালো লাগে?’

‘এই ধরো, শুক্তো, চিংড়ি দিয়ে সাদা ডাঁটার চচ্চড়ি, ভাদাল পাতার ভর্তা, এই সব আর কি।’

‘বুঝেছি, ভালো কিছু শুধু ছল করে আমাকে খাওয়াতে চাও। খাইয়েই তোমার সুখ, না?’

‘হ্যাঁ,’ ও মৃদু হেসে মাথা নাড়ে। তারপর মাংসের টুকরো কাহ্নুপাদের থালায় তুলে দেয়।

‘হরিণের মাংস আজ শেষ হয়ে গেল।’

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

‘তাহলে কী হবে?’

‘তোমার ভাবতে হবে না। আজ আমি নদীর ধারে গিয়ে কাঁকড়া ধরে আনব।’

‘রোদে কষ্ট হবে যে?’

শবরী খিলখিলিয়ে হাসে, ‘পাখা টানতে তোমার কষ্ট হয় না?’

‘হলে কী? আমি সইতে পারি।’

‘আমিও পারি।’

‘তার মানে তুমি হারতে চাও না। ঠিক আছে, তপ্ত খাবার পেলে আমারই লাভ, পেটে গাদিয়ে ঘুম দেওয়া যায়।’

কাহ্নুপাদ তৃপ্তির ঢেকুর তোলে। চেটেপুটে খাওয়া শেষ করে, ঢকঢক করে জল খায়। শবরী বাসনকোসন গুছিয়ে বেড়ার গায়ে হরিণের চামড়া ঝুলিয়ে রাখে। কলাপাতার ছাই দিয়ে ধোওয়া জামাটা দড়ির ওপর থেকে টেনে নিয়ে পরতে পরতে কাহ্নুপাদ বলে, ‘আজ এত খেয়েছি যে হাঁটতে কষ্ট হবে। তুমিও তো খাবারগুলো একটু সামলে রাখতে পারো? না, সব আমাকে দেয়া চাই।’

‘হয়েছে থামো, নাও।’

ও কর্পূর দেয়া পানের খিলি এগিয়ে দেয়। কাহ্নুপাদ ওকে বিদায়-সোহাগ জানায়।

‘কখন ফিরবে?’

‘ঠিক সন্ধ্যায়।’

‘সারাদিন খুব একলা লাগে।’

শবরীর দৃষ্টি ম্লান হয়ে যায়।

‘মুখটা উজ্জ্বল করো সখি, আমি যাই। এমন করে বিদায় দিলে সারাদিন খারাপ যাবে।’

শবরী জোর করে হাসে। কাহ্নুপাদ টিলা বেয়ে নেমে যায়। যতদূর দৃষ্টি যায় তাকিয়ে থাকে ও। একসময় কানু আড়াল হয়ে গেলে ও ঘরে ঢোকে। ময়ূরটা কাছে এসে দাঁড়ায়। শবরী ওটার গলা জড়িয়ে ধরে নিজেকে সামলায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অপণা মাঁংসে হরিণা বৈরী

প্রতিদিনই পল্লির ভেতর দিয়ে অনেকটা পথ পেরুতে হয় কাহ্নুপাদকে। দু-ধারে ঘরবাড়ি, দোকানপাট, একটু দূরে বাজার। সূর্য ওঠার আগে থেকেই লোকজন বাড়ির সামনে প্রতিদিনের কাজ শুরু করে। আজও পাড়া জেগে উঠেছে, সবাই কাজে যাবার জন্য তৈরি হচ্ছে। বেশিরভাগ লোকই চাষাবাদ করে, কেউ কার্পাস বোনে। বাকিরা চাঙারি বানায়, নয়তো শিকার করে। পুবদিকের বাড়িগুলোর সামনে বাচ্চাদের হইচই বেশি। ছেঁড়া একটা জাল বেড় দিয়ে ওরা মুরগি ধরার চেষ্টা করছে, এটা ওদের খেলা। তবে খেলতে খেলতে ওরা শিকারের তালিম নেয়। তারপর পাকা হয়ে বনে রওনা দেয়। বাচ্চাদের এইসব খেলা কাহ্নুপাদের ভালো লাগে। ছোটো থেকেই নিজেদের প্রস্তুত করা উচিত বলে ও মনে করে। অলস সময় কাটানো ওর একদম পছন্দ নয়। ছুটকিকে একপাশে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে কাহ্নুপাদ অবাক হয়।

'কী রে তুই দাঁড়িয়ে রয়েছিস যে?'

'শিকার আমার ভালো লাগে না কাকা। ওরা জীবগুলোকে বড়ো কষ্ট দেয়। আমার মায়া লাগে। সইতে পারি না।'

কাহ্নুপাদ থমকে ওর মুখের দিকে তাকায়। ছেলেটার টানা টানা বড়ো চোখে বিষাদ, ও যেন সবার চাইতে একটু আলাদা। ও ভাবুক, কখনো উদাসীন, যা ওর বয়সের সঙ্গে মানায় না। হয়তো ওর আলাদা কোনো চেতনা আছে, যা ওকে অন্যকিছু করার প্রেরণা দেয়। এজন্য কাহ্নুপাদ ছুটকিকে ভালোবাসে। ওর মাথায় হাত রেখে বলে, 'তোকে তো কিছু কাজ শিখতে হবে ছুটকি।'

'কেন, আমি চাঙারি বানানো শিখছি। দেশাখ কাকা বলেছেন, আমার হাতে নাকি চাঙারি সুন্দর হয়। বড়ো হলে এই পল্লিতে আমার মতো কেউ আর বানাতে পারবে না।'

'তাই নাকি? খুব ভালো।'

কাহ্নুপাদ ওর পিঠ চাপড়ে দেয়।

'তুমি কোথায় যাচ্ছ কাকা?'

'কেন, কাজ করতে।'

'আমি একদিন তোমার সঙ্গে রাজদরবারে যাব।'

'গিয়ে কী করবি?'

'ঝাড়বাতি দেখব, রাজার সিংহাসন দেখব।'

'ওসব দেখে আমাদের কী হবে ছুটকি?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

‘তুমি বোধহয় আমাকে নিতে চাও না?’

‘না, তা তো বলিনি।’

ও হেসে ছুটকির ঘাড়ে হাত রাখে। ছুটকি ওর পিছু পিছু হাঁটছে। দুধ দোহানোর জন্য পিঠা হাতে দাঁড়িয়ে আছে ধনশ্রী। গোয়াল থেকে গোরু বের করছে ভৈরবী। ওদের ছয়টা গোরু, দুধ বিক্রি করে ধনশ্রী। খুব একটা রোজগার নেই, তবু কিছুতেই অন্য কাজ করতে চায় না। রাতদিন দাবার নেশা, খেলায় জমে গেলে ওঠায় কারও সাধ্যি। কাহ্নুপাদকে দেখে পিঠা হাতে এগিয়ে আসে।

‘তোমার মতো একটা কাজ আমাকে জুটিয়ে দাও না কানুদা।’

‘তুমি কি পারবে কাজ করতে?’

‘কেন পারব না, একশোবার পারব।’

‘তাহলে দাবা খেলবে কে?’

ধনশ্রী হো-হো করে হাসে।

‘ঠিকই বলেছ। আসলে আমাকে দিয়ে কিছুই হবে না।’

‘হবে না তা নয়। দাবা খেলাটা চাকরি হলে তোমাকে দিয়ে অনেক কিছু হত।’

‘সবই কপাল কানুদা, কপালে না থাকলে কিছু হয় না।’

ভৈরবী গোরু নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, বাছুরগুলো ডাকছে। কাহ্নুপাদ সেদিকে ইশারা করে, ‘তোমার ডাক পড়েছে ধনাদা?’

‘হ্যাঁ, যাই। পারলে বিকেলে একবার এসো।’

‘দেখি।’

কাহ্নুপাদ আর দাঁড়ায় না। তাড়াতাড়ি হাঁটে।

চাঙারি বোনার বাঁশের পাতগুলো ঘরের সামনে জড়ো করে রাখছে দেশাখ। ওর বউদি সুলেখা বড়ো দ্রুতহাতে চাঙারি বোনে। দেশাখ ওগুলো নিয়ে শহরে বিক্রি করে আসে। এর বাইরে তিরধনুক ছাড়া ও আর কিছু বুঝতে চায় না। শিকারে ওর তুখোড় হাত, বনে বনে পাগলের মতো ঘোরে। শিকার শুধু ওর জীবিকা নয়, জীবিকার অতিরিক্ত অন্যকিছু। ও কাহ্নুপাদকে দেখে বাঁশের চিকন গোছা ফেলে ছুটে আসে।

‘মনে আছে তো কানুদা যে আমরা আগামী হপ্তায় হরিণ শিকারে যাব?’

‘হ্যাঁ, খুব মনে আছে।’

‘সব ব্যবস্থা ঠিক করে রেখেছি।’

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

‘আচ্ছা।’

‘তোমার যা ভুলো মন! রোজ রোজ মনে না করালে চলে না।’

‘তোরা আমাকে কী ভাবিস বল তো?’

‘তুমি কবি, তাই তুমি আমাদের মাথার মণি। তোমাকে নিয়ে আমরা গর্ব করি কানুদা।’

কাহ্নুপাদ হো-হো করে হাসে। ছুটকি অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

‘এমন করে হাসছ যেন আজব কথা বলেছি।’ দেশাখ কৃত্রিম রাগ দেখায়। ‘ঠিক আছে যাই। আমার আবার শহরে ছুটতে হবে। ঘরে হাঁড়ি ঠনঠন।’ দেশাখ বুড়ো আঙুল দেখায়, তারপর দ্রুত কাজে চলে যায়।

কাহ্নুপাদও দ্রুত পা চালায়। ওরও দেরি হয়ে যাচ্ছে। পথে বেরুলে এর-ওর সঙ্গে কথা না বলে উপায় নেই। সবাই ওর আপন, সবাইকে নিয়ে ওর ভাবনা। সবার সঙ্গে হাসিমুখে কথা বলে। ও জানে একটুখানি হাসিমুখে কথা বললেও ওদের ক্ষুধার জ্বালা একটুক্ষণের জন্য কমে যাবে। এটুকু থেকেই বা অন্যদের বঞ্চিত করে লাভ কী? ওরা ওকে ভালোবাসে। ও কবিতা লেখে বলে মনে করে ও ওদের চাইতে আলাদা। বিপদে-আপদে ওর কাছেই ছুটে আসে সবাই। ও কি পারবে ওদেরকে নেতৃত্ব দিতে? কাহ্নুপাদ আপন মনে হাসে। সব কিছুই আপন নিয়মে চলে, নিয়মটাকে শুদ্ধ রাখতে পারাটা কঠিন, এর জন্য যোগ্যতা অর্জন করতে হয়।

ছুটকি ওর চিন্তায় বাধা দিয়ে বলে, ‘কাকা তুমি কেমন করে লেখো? আমারও লিখতে ইচ্ছা করে।’

‘ঠিক আছে লিখবি, বড়ো হয়ে নে।’

পথের পাশে কামোদের মুদির দোকান। কামোদ দোকান খোলেনি। ও একটু দেরি করেই ঘুম থেকে ওঠে। বেশ খানিকটা এগুলে রামক্রির মদের দোকান, সেটাও বন্ধ। রামক্রির বউ দেবকি একাই একশো। মদের দোকানে রামক্রির না থাকলেও চলে। দেবকি একাই মদ চোলাই থেকে আরম্ভ করে খদ্দের আপ্যায়ন এবং কড়ির হিসেব রাখা সবই অবলীলায় করে। দেবকিকে খুব পছন্দ কাহ্নুপাদের। সবসময় মুখে হাসি লেগেই থাকে, কখনো কেউ ওকে রাগতে দেখেনি। দেবকি দারুণ সতেজ, স্নিগ্ধ। শবরীর সৌন্দর্য ধনুকের ছিলার মতো টানটান, শাণিত। কিন্তু দেবকি অসম্ভব নমিত, দৃষ্টি আঁকড়ে রাখে, ব্যাকুল করে, শবরীর মতো উদ্দাম করে না। অথচ বার বার ফিরে আসতে ইচ্ছা করে, যেন বকুল ছায়া, স্নিগ্ধ এবং গন্ধময়।

গত রাতের হাঁড়িয়া কাহ্নুপাদের মাথার মধ্যে এখনও ক্রিয়া করে। খোঁয়ারির এই সময়টা ওকে দুর্বল করে রাখে। কোনো কিছু ভালো লাগে না তখন, অথচ দেবকির কথা ভাবতে খারাপ লাগছে না। কেন এমন হয়? দেবকির সঙ্গে তেমন কিছু সম্পর্ক নেই, অথচ ওর কথা ভাবতে ভালো লাগছে, ভেবে আনন্দ পাচ্ছে। আসলে ও কখনো এমন করে সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, ও বোঝে না

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেন এমন হয়। প্রচণ্ড শূন্যতা মন জুড়ে হা-হা করে। ও বুঝতে চায় কোন পথে এগুলে একটা সিদ্ধান্তে আসতে পারবে।

'কাকা তুমি কী ভাবছ?'

কাহ্নুপাদ চমকে ফিরে তাকায়, 'কই কিছু না রে।' হেসে ছুটকির মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়। এই ছেলেটা ওর খুব ভক্ত, একবার জুটে গেলে আর সঙ্গ ছাড়তে চায় না। ও রাজদরবারে যেতে চায়, কিন্তু কাহ্নুপাদ তো জানে ছুটকি যেতে পারবে না। রাজার প্রহরীরা ওকে ঢুকতে দেবে না। জন্মগতভাবে ওখানে ঢোকার অধিকার অর্জন করেনি ও। ওকে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। নগরের বাইরে ওর মতো শত শত লোককে কেমন নির্বিবাদে আলাদা করে দিয়েছে ওরা। ওদের জন্য দেশের রাজার কোনো দায়ভার নেই। নিজেদের দারিদ্র্যের কথা স্মরণ করলে কাহ্নুপাদের ভেতরে এক প্রবল তাড়না হয়। রাজসভায় কত ঐশ্বর্য, কত বিলাস, কত অনাচার, কোনোকিছুই লেখাজোখা নেই। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা ওকে নিয়ে যে নাক সিঁটকানো ভাব দেখায় সেটা মোটেই ওকে স্বস্তি দেয় না, গ্লানি ওকে মরমে মারে। ধর্মেকর্মে, আচার-অনুষ্ঠানে বিধিনিষেধের আইনকানুনের হোতা সেজে আছে ব্রাহ্মণরা। এদের প্রতাপকে অস্বীকার করে কার সাধ্য! ভেতরে যত ক্ষোভ, যত জ্বালাই থাক না কেন কাহ্নুপাদকে স্বীকার করে নিতে হচ্ছে এই ব্যবস্থা। ইচ্ছে করলেই ও এর থেকে ছুটে বেরিয়ে যেতে পারে না। পায়ে লাগানো আছে হাজার বেড়ি।

ভাবতে ভাবতে কাহ্নুপাদ যখন নদীর ঘাটে এসে পৌঁছোয় বেলা তখন বেশ চড়চড়িয়ে উঠেছে। ঘাটের ওপর পা ছড়িয়ে একা বসে গুনগুনিয়ে গান গাইছে ডোম্বি। সবাই ওকে ডোম্বি বলে ডাকলেও কাহ্নুপাদ ওর নাম দিয়েছে মল্লারী। অদ্ভুত প্রাণবন্ত মেয়ে। নৌকা যেমন অবলীলায় দ্রুত বায়, তেমনই গাইতে পারে, নাচতে পারে। এমন সরেস মেয়ে এ অঞ্চলে একটিও নেই। মল্লারী মন্দিরার মতো বাজে না, সে ধ্বনি মৃদু নয়। প্রাণের গভীরে ধীর লয়ে সঞ্চারিত হয় না। মল্লারীর কোথাও মৃদুমন্দতা নেই, ও নদির উত্তাল স্রোতের মতো ঊর্মিমুখর, নিমেষে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। কাহ্নুপাদকে আসতে দেখে ও উঠে দাঁড়ায়।

কাহ্নুপাদ ছুটকিকে বলে, 'ছুটকি, তুই ঘরে যা।'

'না।'

'কী করবি?'

'এদিক ওদিক ঘুরব। বনের দিকেও যেতে পারি।'

'বেশি দূরে যাসনে যেন।'

বলতে বলতে ও লাফিয়ে নৌকায় ওঠে। নৌকা দুলে উঠলে নদীর বুকে পানি ছলকায়। মল্লারী কাছি গুটিয়ে বইঠা হাতে নেয়। কাহ্নুপাদ পাটাতনের ওপর বসে। অনেকটা পথ হেঁটে এসেছে, ওর কপালে ঘাম চিকচিক করে। হাঁটুর ওপর কপালটা ঘষে নিয়ে ও ঘাম মোছে। বলে, 'আমি বুঝি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রথম খ্যাপ?'

'তুমি না এলে আমার খ্যাপ সাঁইত করবে কে?'

'সাঁইত হয় কী করে? আমার কাছে তো কড়ি নাও না।'

'তুমি নৌকায় উঠলেই হয়। তোমাকে নিয়ে নৌকা বাইতে পারলে আমার কড়ির চেয়ে বেশি পাওয়া হয়।'

'বেশ কথা বলতে শিখেছ।'

'তোমার সঙ্গে থাকলে না শিখে উপায় আছে? তোমার মতো কথা বলতে না পারলে আমাকে তোমার ভালো লাগবে কেন?'

'তোমাকে ভালো লাগার অনেক গুণ আছে।'

'সত্যি?'

'হ্যাঁ গো, সত্যি।'

'কী গুণ বলো দেখি?'

'সে মেলা, কয়টা বলব?'

'যে কয়টা মনে আসে তাই বলো?'

'যেমন গাইতে পারো, নাচতে পারো, নৌকা বাইতে পারো, ভালোবাসতে পারো এবং কবির মনে শক্তি যোগাতে পারো।'

'মা গো এত?' মল্লারী হেসে গড়িয়ে পড়ে। 'কিন্তু আমি তো নিজের কিছুই দেখি না?'

'কেউ কেউ নিজেরটা দেখে না। সেটা অন্যের দেখার জন্য। অন্যে দেখে সুখ পায়।'

'আচ্ছা, এ নইলে কবি। কবি মানেই অপরেরটা লুকিয়ে দেখার অভ্যেস।'

মল্লারী ঠোঁট ওলটায়। কাহ্নুপাদ মৃদু হেসে ওর দিকে তাকিয়ে থাকে। নৌকা মাঝনদীতে, তীরে আছড়ে পড়ছে ঢেউ। ছলাৎ ছলাৎ শব্দ ও দু-কান ভরে শোনে। ও চারদিকে তাকিয়ে বুক ভরে শ্বাস নেয়, আনন্দে চোখে জল আসে। বিধাতা ওদের জন্য প্রাণভরে ঢেলে দিয়েছে, কিন্তু রাজসভায় গেলে টের পায় কিছুই ওদের জন্য নয়। সব ওদের যারা উঁচু বর্ণের, ওরা ভোগ করবে, খাবে, ফেলবে, ছিটোবে। যেটুকু কাঁটাকুটো তা ওদের জন্য—যারা নীচু জাতের, যাদের শরীরে নীল রক্ত নেই। ওইটুকু চেটেই ওদের খুশি থাকতে হবে, কোনো কিছুই চাইতে পারবে না।

'কী ভাবছ কানাই?'

'কিছু না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

‘মাঝে মাঝে তুমি কী যেন ভাবো।’

‘কই না তো? তুমি বেশি দেখতে পাও।’

‘আমাকে ফাঁকি দিও না। তোমার মুখ দেখলে আমি সব টের পাই।’

কাহ্নুপাদ কথা না বলে হাসে। কাকে বলবে ও মনের কথা? ভেতরটা যে অনবরত ক্ষয়ে যায়।

‘আমার জন্য একটা গান লিখবে বলেছিলে, আমি গাইব।’

‘লিখছি, শেষ হয়নি। তোমার কণ্ঠে নিজের গান শুনতে কী যে সুখ মল্লারী, জগৎসংসার ভুলে যাই।’

কাহ্নুপাদের দৃষ্টিতে মুগ্ধতা। প্রশংসায় মল্লারীর চেহারা অন্যরকম হয়ে যায়। ওর সব কিছু কানুর ভালো লাগুক এটুকুই তো ও চায়, আর কিছু না। কাহ্নুপাদ দৃষ্টি ফেরায় না, মল্লারী মুখ নত করে। লম্পট ব্রাহ্মণরা রাতের অন্ধকারে ওর কাছে আসে, দিনেরবেলায় মুখ ফিরিয়ে নেয়। পল্লির লোকগুলোও তেমন, বাঁকা চোখে তাকায়। কেবল কাহ্নুপাদ ওকে সম্মান করে, ভালোবাসে। প্রথম যেদিন কাহ্নুপাদ ওর গান শুনে মুগ্ধ হয়েছিল, বলেছিল, ‘সবাই তোমাকে ডোম্বি ডাকে আমার ভালো লাগে না, আমি মল্লারী ডাকব।’

ও খুশি হয়ে বলেছিল, ‘সবার আড়ালে ডেকো।’

মল্লারীর সুগঠিত বলিষ্ঠ দু-বাহুর দিকে তাকিয়ে থাকে কাহ্নুপাদ। কী অবলীলায় নৌকা বায় ও! যেন জিনিসটা ওর আজন্মের দখলে, ইচ্ছেমতো ব্যবহার করে, একটুও এদিক-ওদিক হয় না। ওর ভঙ্গিটি মোহনীয়, স্বচ্ছন্দে পারার এই আশ্চর্য গুণ কাহ্নুপাদকে বিহ্বল করে, মনে মনে ও এই শক্তির কাছে নতজানু হয়।

‘সারা দিন নৌকা বাইতে তোমার খারাপ লাগে না মল্লারী?’

ও প্রবলভাবে মাথা ঝাঁকায়, ‘মোটেই না। খেয়া পারাপার ছাড়া আর কীই-বা করার আছে আমার? অন্য কাজ তো জানি না। তা ছাড়া সারা দিন তো বাইতে হয় না, যখন খ্যাপ জোটে তখন।’

‘বেশ কাজ। নদীর বাতাসে শরীরও ভালো থাকে।’

‘হয়েছে, কবরেজি কোরো না।’ মল্লারী মৃদু হাসে, ‘খেয়া পারাপার না করলে তোমাকেই বা রোজ রোজ পেতাম কোথায়?’

‘নিজের গরজেই আমি তোমার কাছে আসতাম মল্লারী।’

ও আর এ কথার উত্তর দেয় না। ঘাটে এসে নৌকা বাঁধার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ে। কাহ্নুপাদ লাফ দিয়ে নেমে যায়। পায়ে কাদা লাগলে নদীর জলে ধুয়ে ফেলে।

‘অমন তাড়াহুড়ো করে লাফ না দিলেই পারতে?’

‘তাতে কী? কাদাই তো লেগেছে, পড়ে তো যাইনি।’

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

‘কখন ফিরবে?’

‘সবার মুখে কেবল ফেরার কথা। যদি বলি ফিরব না? ফিরতে আমার ভালো লাগে না।’

ডোম্বি তাকিয়ে থাকে, জবাব দেয় না। কাহ্নুপাদ আর দাঁড়ায় না। দ্রুত পা বাড়ায়। বেলা উঠেছে, পৌঁছোতে সময় লাগবে। অবশ্য রাজার বাড়ির ঘুম এখনও কারও ভাঙেনি। ডোম্বি দড়িদড়া গুছিয়ে নেয়, কাছি খোলে আবার। পারাপারের জন্য লোক এসে ঘাটে দাঁড়িয়েছে। ওদের মুখের দিকে তাকিয়ে ওর মনে হয়, আজকের সকালটা প্রসন্ন। এমন ভাবার কোনো কারণ নেই, তবু মনে হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটি ছোলঙ্গ সুতোয় বেঁধে গাছের ডালে ঝুলিয়ে দিয়েছে দেশাখ। অরুণ ওটা বার বার দুলিয়ে দেয়। দোলানো ছোলঙ্গটাকে তিরবিদ্ধ করে হাতের তাক ঠিক করে ও, একটুও এদিক-ওদিক হয় না। যত জোরেই দুলুক না কেন দেশাখ ঠিক সেটাকে বিদ্ধ করে ফেলে। প্রতিদিন ও অনুশীলন করে, শরীর দিয়ে দরদরিয়ে ঘাম ঝরছে। পেশিবহুল বাহু টানটান হয়ে থাকে। অরুণ মুগ্ধ চোখে ওকে দেখে।

'তোমার মতো হাতের তাক আর কারও নেই দাদা, ইস তুমি কী সুন্দর পারো!'

'তোকেও শেখাব, শুধু ধৈর্য আর সাহস চাই।'

'আমিও তোমার মতো শিকারি হব। শিকারে উত্তেজনা আছে, আমি সেটা চাই। জানো দাদা ছুটকি না শিকার দু-চোখে দেখতে পারে না।'

'হুঁ।'

দেশাখ ওর কথায় খুব মনোযোগ দেয় না। একমনে লক্ষ্য ঠিক করে। এ সময়ে কথা বলা ও একদম পছন্দ করে না।

'অরুণ ছোলঙ্গটা এবার গড়িয়ে দে।'

অরুণ ফলটা দড়ি থেকে ছিঁড়ে মাটিতে গড়িয়ে দেয়। ও জানে দেশাখ গড়িয়ে যাওয়া ফলটাকেও তিরে গাঁথবে। অরুণ বেশ জোরেই ফলটা গড়িয়েছে, কিন্তু দেশাখ অবলীলায় সেটা তিরে গাঁথে। সাধনায় ওস্তাদ ও, প্রতিদিনের এই একাগ্রতাটুকু আছে বলেই হাত নষ্ট হয়নি। ও ফলসহ তিরটা উঠিয়ে নিতেই সুলেখার ডাক শোনে।

'ও দেশাখ এবার যাও ভাই, বেলা হয়ে যাচ্ছে। রোদ উঠলে আবার নিজেই বিরক্ত হবে এবং পূর্বপুরুষসহ আমাকে উদ্ধার করে ছাড়বে।'

'আমি আর কী উদ্ধার করব? নিজেই তো উদ্ধার হয়ে আছ।'

সুলেখা কথা বলে না। দেশাখের স্বভাব জানে। শিকারের বাইরে কোনো কাজ খুব একটা করতে চায় না। তার ওপর মনমতো না হলে সবাইকে গালাগাল করে। ওর রুক্ষ চেহারায় কোথাও কোনো মায়াদয়া নেই বলেই মনে হয়। মোটা ঠোঁটের ওপরে ঘন গোঁফ দেখলে ভয়ই করে। সুলেখার ডাকে আঙিনায় ফিরে বাঁশের তৈরি চাঙারিগুলো দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলে বাঁশের দু-মাথায় দুটো অংশ ঝুলিয়ে দেয়। বাঁশটা কাঁধে ফেলে এখুনি শহরের দিকে রওনা দিতে হবে। বেচে কিছু কড়ি পেলে এবং তা দিয়ে চাল কিনতে পারলে তবে খাওয়া। নইলে সবাই উপোস দেবে। গতদিন শিকারে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটা সজারু আর কয়েকটা ঘুঘু পেয়েছিল, তা বেচে মা-কে আর বউদিকে একজোড়া কাপড় এনে দিয়েছে। তাই এখন ঘরে খাবার নেই। কাগনি ধানের চাল এসেছে বাজারে, একদিনও কেনা হয়নি। বাড়িতে আটজন লোক, পঙ্গু বাবা, বৃদ্ধ মা, তরুণী দুই বোন, ছোটো ভাই, বড়োভাইয়ের বউ সুলেখা। বড়োভাই পরের নৌকায় বাণিজ্যে গেছে; নিজের বাণিজ্য নয়, কড়ি রোজগারের জন্য অন্যের নৌকায় খাটতে যাওয়া, কবে ফিরবে কেউ জানে না, কোনো খবরও নেই। সংসারের সবাই ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বসে আছে। কেবল সুলেখা চাঙারি বোনে বলে কিছুটা রক্ষা। তা ছাড়া কেউ একটা কড়ি আনতে পারে না। মাঝে মাঝে বিরক্ত লাগে দেশাখের। সব ছেড়েছুড়ে একদিকে পালিয়ে যেতে ইচ্ছে হয়, কেবল অভাব আর অভাব। কখনো স্বপ্ন দেখে দেশাখ, রাজা যদি একদিন কিছু জমি দান করে দেয়; পরক্ষণে নিজেকে শাসন করে, ছোটোলোকের আবার স্বপ্ন দেখা? মুরোদ নেই এক কড়ির, লজ্জাও করে না। এজন্য সুলেখা বলে, 'তুমি একদম শুকনো কাঠের মত নীরস। এত কঠিন যে কী করে থাকতে পারো?'

দেশাখ সোজা জবাব দেয়, 'বেশি ছেঁদো কথা আমার ভালো লাগে না। আমি কাজের মানুষ হতে চাই।'

বোঝাটা যখন কাঁধের ওপর উঠিয়ে নেয় তখন কচি বাঁশের পাত দিয়ে তৈরি ঝকঝকে চাঙারিগুলো সূর্যের সোনালি আলোয় চিকচিক করে। তখন মনে হয় কাজ করতে খারাপ লাগে না ওর, শুধু অভাব আর দারিদ্র্য বড়ো বেশি যন্ত্রণাদায়ক। কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারছে না। কখনো নিজের দশাসই শরীর নিয়ে বিব্রত বোধ করে। মনে হয় আরও অনেক কিছু পারা উচিত, কিন্তু পারছে না কেন? বাধাটা কোথায়?

রওনা করার আগে সুলেখা সামনে এসে দাঁড়ায়।

'তোমার দাদার একটু খবর নিও।'

শহরে যাবার সময় হলে সুলেখা সব সময় এই এক কথাই বলে। যাদের নৌকায় ভুসুকু বাণিজ্যে গেছে তাঁদের লোকজনও জানে না নৌকা কবে ফিরবে। বাণিজ্য মানেই অনির্দিষ্টকালের যাত্রা। ভাগ্য ভালো হলে নির্ঝঞ্ঝাটে ফিরে আসা যায়, নইলে একদিকে যেমন রয়েছে ঝড়বৃষ্টির ভয় তেমনই অন্যদিকে আছে জলদস্যুদের উৎপাত। সামনে পড়লে নিঃস্ব করে। বাধা পেলে গলা কেটে নদীতে ফেলে দেয়। এসব ভাবতে ভাবতে দেশাখ জামা গায়ে দেয়। হাতকাটা ফতুয়া, নীল রঙের। শহরে যাবে বলে সুলেখা হয়তো খড়িমাটি দিয়ে কেচে রেখেছে, নইলে বেশিরভাগ সময় ওর জামা নোংরাই থাকে। বিশেষ করে ঘামের গন্ধ ওকে কষ্ট দেয়। শহর থেকে ফিরে সুলেখাকে মিথ্যা কথা বলতে হবে। সুলেখাও জানে দেশাখের পক্ষে খবর আনা সম্ভব নয়। তবুও দেশাখকে একই কথা বলবে ও এবং দেশাখ একই উত্তর দেবে। এই নিয়ে সুলেখার সঙ্গে ওর একটা মনগড়া সম্পর্ক দাঁড়িয়ে গেছে, চতুরালিতে দুজনেই ওস্তাদ। কেউ কারও কাছে হারতে রাজি নয়। দেশাখ মনে মনে হাসে, দাদাকে ছাড়া বউদির দিন যেন আর কাটে না। তার শারিরিক মানসিক পারিপার্শ্বিক ভুসুকুর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জন্য উন্মুখ হয়ে উঠেছে। একটু পর সুলেখা এসে ওর হাতে এক টুকরো হরিণের মাংস গুঁজে দেয়, কবেকার মাংস দেশাখও জানে না। একসঙ্গে বেশি মাংস পেলে লবণ-হলুদ দিয়ে সেদ্ধ করে শুকিয়ে রাখা হয়। দরকারমতো বের করে গরম পানিতে ভিজিয়ে রেখে ভুনা করে সুলেখা।

'এটা খেয়ে যাও ভাই। আর কিছু নেই।'

সুলেখার 'আর কিছু নেই' কথায় দেশাখের সংকোচ হয়। পরের ঘরের এই মেয়েটি ওদের সংসারে কষ্ট করছে। বাপের বাড়ি গেলেও বেশিদিন থাকে না।

'ভাবছ কী? নাও?'

'না থাক, বাবাকে দিও।'

'না, না তুমি খাও। তুমি এতদূর হেঁটে যাবে, পথে কষ্ট হবে। বাবাকে আমি অন্য কিছু দেব। বাবার জন্য তোমার ভাবতে হবে না।'

'কী দিতে পারবে তা তো জানি।'

দেশাখ হাত বাড়িয়ে মাংসের টুকরো নেয়। মুখে পোরার সঙ্গে সঙ্গে ভেসে আসে বাপের কাশির শব্দ। ওর মা বুকে তেল মালিশ করে আর গালি দেয়। দেশাখ নির্বিকার মাংস চিবোয়। এসবে ও অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে, এ নিত্যদিনের ঘটনা।

শুনতে পায় মা-র খনখনে কণ্ঠ, 'মরেও না বুড়ো, মরলে তবু হাড় জুড়োয়। এ জ্বালা আর সইতে পারি না।'

বাবার উত্তর ওরা কেউ শুনতে পায় না। প্রবল কাশির তোড়ে ভেসে যায় তার সুখদুঃখ। যৌবনে বাবা ভীষণ রাগী ছিল। মা-কে মারত, পান থেকে চুন খসলে সইতে পারত না। একদিন রাগ করে দেড় বছরের ভুসুকুকে ছুঁড়ে মেরেছিল উঠোনের ডাঁটা খেতে। সে শোক ওর মা আজও ভোলেনি। আজ মা সুযোগ পেয়েছে, কথার শাণিত চাবুকে প্রতিশোধের মাসুল ওঠাচ্ছে।

'ওকে না নিলে আমাকে উঠিয়ে নাও ভগবান।'

দেশাখ ও সুলেখা মুখ চাওয়াচাওয়ি করে। আসলে দুজনের প্রয়োজন দুজনের কাছে ফুরিয়েছে। বাবা অথর্ব বলে মুখ খোলে না, মা-র শরীরে কিছু শক্তি আছে বলেই গালাগাল করে। বাবাকে সহ্য করতে পারে না। ভাবনার মাঝে দেশাখের চকিতে মনে হয়, অথচ সুলেখা ভুসুকুর বাড়ি ফেরার আশায় উদগ্রীব হয়ে আছে। কেন? ভুসুকু জোয়ান, উপার্জন করতে পারে, সুলেখার সবরকম প্রয়োজনে লাগে এজন্য কি? দেশাখ উত্তর খুঁজে পায় না। হঠাৎ করে সুলেখাকে প্রশ্ন করে, 'দাদাকে তুমি খুব ভালোবাসো, না বউদি?' দেশাখের প্রশ্নে সুলেখার মুখ লাল হয়ে ওঠে, উত্তর দেয় না। যাবার জন্য ওকে তাড়া দেয়।

'তোমার দেরি হয়ে যাচ্ছে, তাড়াতাড়ি যাও, রোদও চড়চড়িয়ে উঠছে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

‘যাচ্ছি। কিন্তু জানি, প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে তুমি মা-র মতো দাদাকে গালাগাল করবে, জোর করেও ভালোবাসতে পারবে না। আমার বউও আমার সঙ্গে এমন করবে।’

সুলেখা হেসে বলে, ‘বাবা, অত ভবিষ্যৎবাণী করতে হবে না।’

দেশাখ মাথা ঝাঁকিয়ে বেরিয়ে যায়, দ্রুত চলতে থাকে। সুলেখা আনমনে সেদিকে তাকিয়ে থাকে, মনখারাপ হয়ে যায়। দেশাখ কেমন অনায়াসে কথাগুলো বলে গেল। সবার জীবনেই কি এমন ঘটে? হয়তো সত্যি, হয়তো নয়, কে জানে। বছর দেড়েক ধরে ভুসুকু ওর কাছে নেই, কিছুই ভালো লাগে না। দেশাখ রোজগার করেই দায় সারে, তা দিয়ে সংসার চলুক আর না চলুক সে নিয়ে ও ভাবে না। অথচ এই অভাবের সংসারকে দু-হাতে বেড় দিয়ে রাখতে হচ্ছে ওকে। সকলের দাবি ওর কাছে। অরুণ এসে আঁচল ধরে টানাটানি করে, ‘খিদে পেয়েছে বউদি?’

সুলেখা অরুণের দশ বছরের শুকনো মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। ওর চেহারায় ভুসুকুর আদল আছে।

‘খিদে পেয়েছে বউদি?’

‘খিদে পেয়েছে তো আমি কী করব?’

‘বা রে, তুমি না করলে কে করবে?’

সুলেখা হেসে ফেলে, ‘আয়।’ ওর হাত ধরে টেনে নিয়ে ঘরে ঢোকে।

‘তুমি না থাকলে আমাকে কেউ খেতে দিত না বউদি।’

অরুণের চোখ ছলছল করে ওঠে। সুলেখা ওর কপালে চুমু দেয়, ‘পাগল। একজনের জন্য কি সব কিছু আটকে থাকে রে? ঠিকই দিন চলে যায়।’

‘মিছে কথা। তুমি না থাকলে আমার দিন যেত না। আমি পালিয়ে যেতাম। জলদস্যুর নৌকায় উঠে দস্যু হয়ে যেতাম। বড়ো হলে আমি দাদাকে খুঁজতে যাব বউদি।’

‘ও কি আসবে না? কবে আসবে?’

সুলেখার বুক গুমরে ওঠে। অরুণকে সে-কথা বলা হয় না। বোঝে এইসব দায়িত্বের জন্য ও এই সংসার থেকে নড়তে পারে না। ভুসুকু যাবার পর বাবা তো ওকে কতবার নিয়ে যেতে চেয়েছে। কিন্তু ও একবারে যেতে পারে না, ক-দিন বেড়িয়ে আবার চলে আসে। যাবার কথা উঠলে দেশাখসহ আর সবাই এমন অসহায়ভাবে ওর মুখের দিকে তাকায় যে তখন আর কিছুই করার থাকে না ওর। কেউ ওকে জোর করে না, যেতে দেবে না বলে শাসায় না তবু কোথায় যেন কী একটা বন্ধন আছে, অদৃশ্য সুতোয় বাঁধা সেটা।

গতরাতের হাঁড়িয়ার তলানিটুকু শ্বশুরকে দেয় সুলেখা। বৃদ্ধ বড়ো আগ্রহে টেনে নিয়ে কয়েক চুমুকে শেষ করে ফেলে। সুলেখা আবার সবার মুখে কী দেবে সে চিন্তা করতে থাকে। অরুণ একমুঠি পান্তা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এক সানকি পানির মধ্য থেকে সপসপ করে খাচ্ছে, আর সবাই উপোস। লোকি আর গুনি বারান্দার কোণে চুপচাপ বসে আছে। ওরা বড়ো লক্ষ্মী, কখনো কিছু চায় না, বরং এদিক-সেদিক ঘুরে এটা-ওটা জোগাড় করার চেষ্টা করে। কোঁচড়-ভরতি শাক আনে, ফল-পাকুড় খোঁজে, কখনো অন্যের গাছ থেকে কিছু চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে বকা খায়, এখন সবই ওদের গা-সওয়া। সুলেখা ওদের ডেকে বলে, 'তোরা নদীর ধার থেকে একবার ঘুরে আয়।'

এর অর্থ দুজনই বোঝে। জেলেরা যেখানে বড়ো জাল ফেলে মাছ ধরে সেখানে ওরা প্রায়ই ঘোরাফেরা করে। কখনো ট্যাঁকে গুঁজে মাছ নিয়ে আসে, কাঁকড়া পেলে তো কথাই নেই। জাল থেকে ছাড়া পেলে কাঁকড়াগুলো ছুটতে থাকে। দু-বোনে সেগুলো ধরার চেষ্টা করে। পেলে শাড়ির আঁচলে বেঁধে ফেলে। তারপর ছুটতে ছুটতে ঘরে ফেরে। অনেক সময় অন্যেরা কেড়ে নেয়। যেদিন আনতে পারে সেদিন ওদের আনন্দ আর ধরে না। সুলেখা যত্ন করে রাঁধে। আর দু-বোন কুয়োতলার ঠান্ডা ছায়ায় বসে গায়ে পানি ঢালে, কাদা ধুয়ে ফেলে। ওদের উত্তেজনা ফুরোয় না, সম্ভব-অসম্ভব হাজার কথায় ভরিয়ে রাখে সময়। আজও সুলেখার ইশারা পেয়ে দুজনে ছুটে বেরিয়ে যায়। সুলেখা সংসারের নিত্যকাজে মন দেয়।

এই এক অবস্থা ধনশ্রীর চাঁচর বেড়ার ঘরেও, ভৈরবী গালে হাত দিয়ে বসে আছে। তিন বছর আর দু-বছরের ছেলে দুটো একটানা কাঁদছে। ওদেরকে কোলে নিতেও ইচ্ছে হয় না ওর। ভাবে, কাঁদুক। কেঁদে কেঁদে শক্ত করুক নিজেদের। মায়ের আদর দিয়ে ও কি আর ওদের ধরে রাখতে পারবে? নগরের বাইরের এই কাদা-গড়াগড়ির জীবনে শক্ত না হলে ওদের সামনে সবটাই অন্ধকার। যে অন্ধকারে তলিয়ে গেছে ভৈরবী নিজেই। ভোরে গোরু দুয়ে তিন সের দুধ পেয়েছে ধনশ্রী, বিক্রি করে চাল আনবে। কখন ফিরবে কে জানে, খেয়ালি মানুষ। দাবার আড্ডায় মজে গেলে সারা দিনে হয়তো আর ফিরবে না। একদিকে অভাব আর অন্যদিকে স্বামীর খামখেয়ালি, এ দুইয়ের মধ্যে অনবরত যুদ্ধ করতে হয় ওকে। ও একেই ভাগ্য বলে মেনে নিয়েছে, আক্ষেপ নেই, প্রতিবাদ নেই। ভীষণ মনখারাপ হলে নিজের মধ্যে গুমরে মরে। নিজেকে পীড়ন করেই ও আনন্দ নিংড়ায়। শান্ত স্বভাব ভৈরবীর, কথা বলে কম, যখন বলে তখন সুন্দর করে বলে। সেজন্য সবাই পছন্দ করে। ছেলে দুটো একটানা কাঁদছে, ভৈরবী আনমনে তাকিয়ে থাকে। অতিথি এসেছে দুজন, শ্বশুরবাড়ির আত্মীয়। ধনশ্রীর দূর-সম্পর্কের ভাই। একমুঠো চাল নেই ঘরে যে সেদ্ধ করে দেবে। ভয় হয় ওর, অতিথিদের অভুক্ত রাখলে পাপ হবে। ধনশ্রী কখন ফিরবে? কত বেলা পর্যন্ত ও অপেক্ষা করবে? ও মনে মনে প্রার্থনা করে, বিধাতার কাছে ক্ষমা চায়। হঠাৎ করে নিজের নিরুপায় অক্ষমতার জন্য রাগও হয়। একমাত্র কামোদের কাছে যেতে পারে, চাইলে সের খানেক চাল বাকিতে দেবে। কেন দেয় কামোদ? পুরোনো ভালোলাগার জন্যই তো। সে অধিকার কি ভৈরবী এখন খাটাবে? পরক্ষণে ঝেড়ে ফেলে সব নীতিবোধ। ছোটো ছেলেটাকে কাঁধে নিয়ে বড়োটার হাত ধরে বেরিয়ে যায়। অতিথিরা ঘরে নেই, এক্ষুনি হয়তো আবার ফিরে আসবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেশ ভিড় কামোদের দোকানে। ভৈরবী এককোণে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। এসেছে বাকি নিতে, সুতরাং খদ্দের সব বিদেয় না হলে কোনো কথা বলাই সম্ভব নয়। কামোদের সঙ্গে দু-বার চোখাচোখি হয়েছে। ওর চোখে ভৈরবীর জন্য ভাষা থাকে, ভৈরবী তা বুঝতে পারে কিন্তু উত্তর দিতে জানে না। আবেগের প্রকাশ ও আবেগ দিয়ে ফিরিয়ে দেয় না। ও বোঝে না কেন এমন হয়। ছোটোবেলা থেকে কামোদের সঙ্গে বড়ো হয়েছে ও। কামোদ ওকে ভালোবাসত, চেয়েছিল বিয়ে করতে। কিন্তু ভৈরবীর বাবা পাত্র হিসেবে কামোদকে পছন্দ করেনি, বরং গালাগাল করে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছিল। ভৈরবীর নিজের কোনো ইচ্ছে-অনিচ্ছে ছিল না। বাবা যা করেছে সেটাকে ও ভালো বলে মেনে নিয়েছে। এই মুহূর্তে সে-কথা মনে পড়লে ও ক্রমাগত সংকুচিত হতে থাকে। কামোদের অবস্থা এখন ভালো। ও নিজের সঙ্গে জেদ করে অনেক কিছু করেছে, অন্তত ঘরে চাল বাড়তি থাকে। ভৈরবী চাইলে কামোদ কখনো ফিরিয়ে দেয় না, তাই দোকানে অনেক বাকি। ধনশ্রীর সাধ্য হয় না শোধ করার। ওই দাবার আড্ডায় মন না থাকলে হয়তো অনেক কিছু করতে পারত। বেশি কিছু না পারুক নিজের সংসার ঠেকাতে পারত, ভৈরবীর যন্ত্রণা কমত কিন্তু ও জানে ওই নেশা ছাড়া ধনশ্রী অচল। খেলা ছাড়তে বললে ও সংসার থেকে পালিয়ে যাবে। সুতরাং মানসম্মানের তোয়াক্কা না করে সব সামলাতে হয় ভৈরবীকে। ঘরে অতিথি বলেই লজ্জাশরমের মাথা খেয়ে আসতে হয়েছে ওকে। ও জানে অতিথিকে উপোস রাখলে সবচেয়ে বড়ো পাপ হবে। ও চোখ বুজে মনে-প্রাণে ভগবানকে ডাকে। হরিপালকে বেশ কড়া ভাষাতেই ফিরিয়ে দিল কামোদ, কিছুতেই বাকি দেবে না, বড্ড লোকসান হচ্ছে। ভৈরবীর মনে হয় ও দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না, পা ক্রমশ ভারী হয়ে আসছে। ছেলেটা কাঁদতে কাঁদতে বুকের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছে। বড়োটি বাড়ি ফেরার জন্য টানাটানি করছে। ও একবার ভাবে ফিরে যাবে, পরক্ষণে অতিথির চেহারা ভেসে ওঠে। যার ঘরে নুন আনতে পান্তা ফুরোয় তাঁর আর শরম কী! বিদেয় হয়ে যাবার পরও অনেকক্ষণ কথা বলতে পারে না ভৈরবী। কামোদ এক সের চাল মাপতে মাপতে বলে, জানি কী বলবে? কিন্তু খদ্দের বিদেয় না করে তো কথা বলতে পারি না।

'জানি কামোদদা। কী করব বলো, ঘরে অতিথি।'

'হাঁড়িতে ভাত নেই, নিত্য অতিথি! এ জ্বালা তোমার জুড়োবে কবে বলো তো?'

'ছিঃ ছিঃ কামোদদা ওকথা বলতে নেই।'

ভৈরবী মনে মনে শিউরে ওঠে। ওর মনে কি পাপপূণ্য বোধ নেই? এমন কথা বলে কী করে? ওর ফ্যাকাশে মুখের দিকে তাকিয়ে কামোদ আর কথা বলে না। এই অবুঝ নিষ্পাপ মহিলাকে দুঃখ দিয়ে লাভ কী? ও ওর মতো পাপপূণ্য নিয়েই চলুক। চালটা পোঁটলা বেঁধে ভৈরবীর দিকে এগিয়ে দেয়। ভৈরবী ভাবে কামোদ কি এখনও ওর ওপর রাগ করে আছে? কে জানে, কোনোদিন তো কিছু বলে না। বলে না কেন? কেন মুখ ফিরিয়ে রাখে না?

চালের পোঁটলা ভৈরবীর দিকে এগিয়ে দিতে দিতে হেসে বলে, 'অনেক বাকি তোমাদের।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভৈরবী এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, 'ও এলেই তোমার কাছে পাঠিয়ে দেব।'

'না, ধনাদাকে আর পাঠাতে হবে না। তোমার কাছে আমার বাকিই থাক।'

ভৈরবীর হাত কাঁপে। কামোদের চোখের ভাষা তীব্র হয়ে উঠেছে, ওর পালানো দরকার। পোঁটলাটা আঁচলের নীচে নিয়ে দ্রুত হাঁটে। কামোদ অন্যমনস্ক হয়ে ভাবে, নিত্যদিন অভাব তবু মুখের হাসিটি কখনো মিলিয়ে যায় না ভৈরবীর। কামোদের বুক হুঁ-হুঁ করে ওঠে, এমন একটা মেয়েকে বউ করার সাধ ছিল ওর। স্বপ্ন দেখেছে কত!

'এক কড়ির তেল দাও কামোদদা?'

'তেল?'

'হ্যাঁ, কী ভাবছ? এমন ভ্যাবলাকান্ত হয়ে থাকলে কি দোকান চলবে?'

'তেল দিয়ে কী রাঁধবে?'

'সে কি আর আমি জানি? জানে বউ।'

'তাই তো।'

কামোদ হেসে ফেলে। খদ্দের চলে যায়। কামোদ কিছুতেই নিজের স্বস্তি ফিরে পায় না। ভৈরবী দোকানে এলেই সেদিন ওর পুরো দিন নষ্ট।

ঘরে ফিরে ভৈরবী চাল সেদ্ধ বসায়। এতক্ষণ কেমন একটা দুঃখ ভাব ছিল মনের মধ্যে। সারাটা পথ গলার কাছে কী যেন আটকে ছিল। কেবলই মনে হয়েছে কোনোদিন যদি বড়ো সরপুঁটির দোপেঁয়াজা করে সামনে বসিয়ে কামোদকে খাওয়াতে পারত। শুধু একদিন যদি এমন ঘটনা ঘটত ওর জীবনে! কেন এমন আকাঙ্ক্ষা এতবড়ো হয়ে ওকে আচ্ছন্ন করে? ওর স্বামী আছে, সন্তান আছে। না, এতবড়ো পাপের কথা ও কিছুতেই ভাববে না। টগবগে ভাতের দিকে তাকিয়ে এসব কথা ভুলে যাবার চেষ্টা করে। উঠোন থেকে লাউ আর বেগুন তুলে এনে কাটতে বসে। মন খুশিতে ভরে ওঠে। অতিথিকে গরম ভাত আর গরম তরকারি দিতে পারবে, এই মুহূর্তে ভৈরবী এর বেশি কিছু আর ভাবতে পারে না। ওর চাওয়া খুব কম, বড়ো অল্পে তৃপ্ত হয়ে যায়। ছেলে দুটোকে গরম ভাত দিয়ে বসিয়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গে আনন্দে চোখে জল আসে ওর। মনে হয় জীবনে আর কোনো কিছু চাইবার নেই, বড়ো কিছু চাইতে ভয় করে ওর, ভয় হারাবার। পেয়ে ধরে না রাখতে পারার ভয়ও আছে ওর মনে। কেন যে এমন হয় ও বোঝে না। আর অনেক কিছু বোঝে না বলেই ওর জীবনের জটিলতা কম। দুঃখবোধও কম এবং অনায়াসে বেদনা কাটিয়ে উঠতে পারে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অপণা মাঁংসে হরিণা বৈরী

হরিণ শিকারের আয়োজনে মেতে উঠেছে সবাই। আজ ওরা তিন মাইল দূরের বনে হরিণ শিকারে যাবে। দেশাখের উৎসাহ সবচেয়ে বেশি। ও দলের নেতৃত্ব দিচ্ছে। কাহ্নুপাদ, ধনশ্রী, কামোদ, রামক্রি, দেবেন, সাধন সবাই আছে। দলবেঁধে হরিণ মারতে যাওয়া এক বিশেষ উৎসবের মতো। এতে আনন্দ যেমন আছে, রোজগারও তেমন, বেশ লাগে। তিনটে শিকার হলে তো সারা পাড়া উৎসবে মেতে উঠবে। বেলা ওঠার আগেই দলেবলে রওনা করে ওরা।

ওদেরকে একসঙ্গে ঘাটে দেখে মনে মনে হাসে ডোম্বি। আজ কাহ্নুপাদের সঙ্গে ওর খাতির নেই। এতক্ষণে একটা খ্যাপও দেয়নি, বেশ কতকগুলো কড়ি আদায় হবে চিন্তা করতেই ও উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। এতক্ষণে বসে বসে ঝিমুনি ধরে যাচ্ছিল। নদীর বাতাসে মাঝে মাঝে মন কেমন হয়ে যায়, তখন শরীরে ব্যথা হয়। বুক মুচড়ে ওঠে। ওদের দেখে ডোম্বি হেসে বলে, 'আজ ভোরে কার মুখ দেখে যে উঠেছি কে জানে? রোজগারের এমন সুবিধে রোজ রোজ কেন যে হয় না?'

'হরিণের মাংসে তোকেও ভাগ দেব ডোম্বি, বিনে কড়িতে পার করে দে?'

দেশাখের অনুরোধে দপ করে ওঠে ও, 'ইস আমার নাগর! বললেই দিলাম আর কি!'

দেশাখ মুখ খিস্তি করতে গিয়েও চেপে যায়। অপমানটা নিঃশব্দে হজম করে। যাত্রার মুখে কোনো বাদবিবাদে যেতে চায় না ও।

'হরিণ পাবে কি না ঠিক নেই। আগেই লোভ দেখাচ্ছে?'

দেশাখ চটে ওঠে, 'অলুক্ষণে কথা বলবি না। পার করে দিবি কি না বল?'

'কড়ি দিলেই দেব।'

'এমনিতে দিবি না?'

'না। আমাকে বলছ অলুক্ষণে কথা না বলতে। আর নিজেরা যে অলুক্ষণে কাজ দিয়ে যাত্রা শুরু করতে চাচ্ছ? শুভ কাজে আবার বিনে কড়ি কী?'

ঝাঁঝালো স্বরে কথা বলে ডোম্বি, চোখে ক্রোধ। দেশাখও সরোষে বলে, 'ঠিক আছে তোকে উৎসবেও ডাকব না।'

মুহূর্তে চোখের রাগ উবে যায়। খিলখিলিয়ে হেসে বলে, 'খুব ডাকবে, নইলে নাচবে কে? আর নাচ না হলে কি তোমাদের রক্ত গরম হবে, না কি আসর জমবে?'

কাহ্নুপাদ অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। এ ডোম্বিকে ও চেনে না। কেমন অবলীলায় এতগুলো মানুষের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কথা বলছে এবং নিজের ওপর ভীষণ বিশ্বাসে বইঠা হাতে কেমন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পুরুষালি ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে। কাহ্নুপাদকেও যেন চেনে না। ওর চোখে একবারও চোখ ফেলেনি। যেন কারও কাছে ওর কোনো দায়দায়িত্ব নেই। কামোদ নীচু স্বরে অশ্লীল গাল দেয়, জোরে দেবার সাহস নেই। তাহলে হাতের বইঠার ঘায়ে মাথা দু-ফাঁক হয়ে যাবে। অবশেষে রামক্রী একটা রফা করে। তিনজন পিছু এক কড়ি দিয়ে পার করিয়ে দেবার জন্য রাজি করায় ওকে। দেশাখ রাগে গোঁ-গোঁ করে, কথা বলতে পারে না। দু-দফায় ওদেরকে পার করে দেয় ডোম্বি। সবার আগে নৌকার ওপর লাফিয়ে ওঠে দেশাখ। ওর চোখের সামনে দূরের অরণ্য উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। শিকারের নামে ওর স্নায়ু উদ্দাম হয়ে ওঠে।

ডোম্বির বইঠার চাপে ছলছল শব্দ ওঠে নদীর বুকে। কাহ্নুপাদ কান পেতে শোনে। ওই শব্দ যেন ওর নিজের বুকের তল থেকে উঠে আসছে। জাগতিক সুখ-দুঃখ-ভালোবাসার আলোড়ন। মাঝনদীতে এসে ডোম্বি খিলখিলিয়ে হাসে, 'এখন নৌকা ডুবে গেলে বেশ হয়?'

'ইস ডুবলেই হল? যেন বিনে কড়িতে নৌকায় উঠেছি। আর ডুবলে আমি তোকে নিয়ে ডুবব।'

দেশাখের মুখ-খিস্তিতে সবাই হেসে ওঠে। ডোম্বি অপ্রতিভ না হয়ে আরও জোরে হাসে। সে হাসির রেশ নদীর খোলা বুকে বাতাসে তরঙ্গ তোলে। নদীর বুকে জেলেদের নৌকাগুলো ঘাপটি মেরে বসে থাকার ভঙ্গিতে মৃদু নড়ছে। ইতস্তত ঘোরা নয়, একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্য সামনে রেখে এগুচ্ছে। জেলেদের চোখেমুখে উদ্বেগ, একটা বড়ো কিছু ধরার প্রত্যাশা। হাসির রেশ শেষ করে জোরে জোরে শ্বাস টানে ডোম্বি। বলে, 'মাছের আগমন টের পাচ্ছি। মনে হয় ঝাঁক বেঁধে সব এদিকেই আসছে।'

'তুই কেমন করে জানলি?'

'সারা দিন নদীর বুকে থাকলে এসব টের পাওয়া যায়।'

'ইস রাজসভার পণ্ডিতের মতো কথা।'

দেশাখের মুখ-ভেংচিতে সবাই হেসে ওঠে। কড়ি দেবার জ্বালাটা ও ভুলতে পারেনি। সুযোগ পেলেই ডোম্বিকে আক্রমণ করছে। আর ডোম্বি ওকে উপেক্ষা করছে, যেন দেশাখের মূল্যহীন এইসব কথায় ও থোড়াই তোয়াক্কা করে।

ডোম্বি দেশাখকে উদ্দেশ্য করেই বলে, 'যাই বলো না কেন, নির্ঘাত বড়ো কিছু পাবে ওরা। জেলেদের চোখমুখের দিকে দ্যাখো না তোমরা।'

কথা শেষ হতে-না-হতেই দেশাখ চেঁচিয়ে ওঠে, 'দ্যাখো দ্যাখো, কানুদা কত বড়ো একটা মাছ উঠেছে।'

ডোম্বি হাতের বইঠায় জোরে ঘা দিয়ে বলে, 'এত বড়ো মাছ দু-চার বছরে দেখিনি?'

'মাছ দেখতে গিয়ে তুই আবার আমাদের ডুবিয়ে দিস না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

‘কেবল ডোবার কথা কেন রে দেশাখ?’

কাহ্নুপাদ মৃদু ধমক দেয়। তাজা মাছটার রুপালি আঁশে রোদের ঝিলিক, নৌকায় ঠেলে ওঠানোর সঙ্গে সঙ্গে দু-তিনজনে চেপে ধরে, অনবরত লেজ আছড়ায় ওটা। কামোদ জিহ্বায় শব্দ করে বলে, ‘মনে হচ্ছে আমার খিদে পেয়েছে কানুদা?’

ধনশ্রী পেটে হাত বুলোতে বুলোতে বলে, ‘কাগনি ধানের ভাত আর ওই মাছের দোপেঁয়াজা, উঃ যা মজা হবে না। কবে অমন বড়ো মাছ খেয়েছি যে ভুলেই গেছি।’

‘তোমার জিভ থেকে জল ঝরছে না তো, ধনাদা?’ কাহ্নুপাদ হেসে বলে।

‘ধনাদার ঝরছে কি না জানি না, কিন্তু আমি আর ঠেকিয়ে রাখতে পারছি না।’ রামক্রী বড়ো করে ঢোক গেলে।

‘জল কিন্তু আমার জিভেও আসছে—’

ডোম্বি কথা শেষ করার আগে লুফে নেয় দেশাখ, ‘শুধু তোর জিভে আসেনি, ওই জল বইঠা বেয়ে নদীতে নেমেছে, ওই তো দেখতে পাচ্ছি।’

ডোম্বি দেশাখকে উপেক্ষা করে বলে, ‘কিন্তু ওই মাছ তো আমাদের কপালে জুটবে না। ও তো আগে রাজার হেঁসেলে যাবে।’

ফোড়ন কাটে সাধন, ‘অতদূর যাবে কি না কে জানে। দেবল ভদ্রের হেঁসেলে তো নির্ঘাত যাবে।’

কাহ্নুপাদ দ্রুত বলে, ‘তা যাবে। আমাদের জন্য কাঁটাও জুটবে না। তবে যতই শিকারে যাই না কেন ওই মাছ দেখলে প্রাণটা কেমন করে ওঠে, বলে বোঝানো যায় না। মাছে-ভাতে বাঙালি, এ কি আর মিথ্যে!’

‘ঠিক বলেছ।’

সবাই কলরব করে ওঠে। কাহ্নুপাদের কথায় ওরা একমত হয়। সবাই এই কথাগুলোই বলতে চাচ্ছিল, কিন্তু ঠিকমতো কেউ বোঝাতে পারছিল না। কাহ্নুপাদের কথায় ওদের চোখের সামনে একটা ছবি ভেসে ওঠে। সবাই এক অদৃশ্য মাছ-ভাতের উৎসবে বসে গেছে। কত মাছ, কত তার আয়োজন। ওদের কারোই মাছ-ভাতের বাইরে জীবনের চাওয়া আর খুব একটা নেই। এ দৃশ্য স্থির ছবি হয়ে আটকে যাচ্ছে সকলের হৃদয়ে। পরমুহূর্তে ছবিটি যন্ত্রণা হয়ে যায়, ফুঁড়ে যায় বুক। ওরা চাইলেই কোনো কিছু পাওয়ার অধিকার ওদের নেই। এসব ভাবতে ভাবতে নৌকা এসে ঘাটে লাগে। দেশাখ শিকারি বলেই ও চট করে বেদনা ভুলে বলে, ‘অত বড়ো মাছ যখন দেখেছি নিশ্চয়ই আমাদের যাত্রা আজ শুভ।’

ও লাফিয়ে নেমে যায়। ওকে আবার শিকারের উদ্দামতায় পেয়ে বসে। ডোম্বি কাছি দিয়ে নৌকা বাঁধতে বাঁধতে বলে, ‘শিকারের নামে দেশাখের রক্ত গরম হয়ে ওঠে।’

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

‘যেমন নাচের নামে তোমার রক্ত।’

কাহ্নুপাদ আস্তে করে বলে। বাকিরা নেমে গেছে। ঢেউয়ে নৌকা মৃদু দুলছে।

‘গীত লেখা ছেড়ে দিয়ে হরিণ শিকারে যে?’

‘কেবল গীত লিখলে কি পেট ভরে?’

‘কবির আবার পেটের চিন্তা? কবির জন্য আকাশ রয়েছে, বাতাস রয়েছে, চাঁদ রয়েছে—’

মল্লারীর কণ্ঠে মৃদু শ্লেষ। কাহ্নুপাদ গাঁয়ে না মেখে হাঁটতে থাকে। পাড়ে গিয়ে রামক্রী কড়ি গুনে ওকে দেয়। ওরা চলে গেলে পাটাতনের ওপর বিছিয়ে ওগুলো ও আবার গোনে, তারপর কোমরে গুঁজে রাখে। ওর কোমরে কালো সুতো পাকানো আছে। ওর বিশ্বাস এটা থাকলে আয় ভালো হয়। মনে খুশি, কৌটো খুলে পান খায় এবং গুনগুনিয়ে গান ধরে, কাহ্নুপাদের কাছ থেকে শেখা গান, যা ওকে নিয়েই লেখা। এ এক আশ্চর্য ভালোলাগা। ওকে নিয়ে একজন ভাবে এবং লিখতে প্রেরণা বোধ করে ভাবতেই ওর শরীর শিরশির করে। ওর ঠোঁট নড়ে, ও গায়,

একশো পদমা চৌষঠঠি পাখুড়ী
তঁহি চড়ি নাচঅ ডোম্বি বাপুড়ী।

ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পংক্তি দুটো ভীষণ আবেগে গাইতে থাকে ও। গানের বাকি অংশটুকু শেখায়নি কাহ্নুপাদ। এইটুকুই গাইতে ওর ভালো লাগে, যেন সমস্ত ইন্দ্রিয় ওই পংক্তিতে নিয়ন্ত্রিত। গাইতে গাইতে ডোম্বির চোখে জল আসে, বিহ্বল হয়ে তাকিয়ে থাকে। মেঠো পথে একদল লোক ক্রমাগত অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে, গাছগাছালির আড়াল হচ্ছে, আবার কখনো দেখা যাচ্ছে, তারপর আর না, কেউ কোথাও নেই। পারাপারের লোক এসেছে, ডোম্বি আবার নৌকার কাছি খোলে।

বনে ঢোকার আগে ওরা চুমুক চুমুক হাঁড়িয়া খেয়ে নেয়। ব্যবস্থাটা রামক্রীর, ওর মদের দোকান আছে। হরিণ উৎসবের নামে ও ভীষণ উত্তেজিত হয়, তাই বিনা কড়িতে সকলকে হাঁড়িয়া দেয়। ওর মতে হাঁড়িয়া না খেয়ে শিকারে নামলে শিকার তেমন জমে না, রক্ত গরম হওয়া চাই, ঠান্ডা রক্ত শিকারের জন্য উপযুক্ত নয়। কাহ্নুপাদ আর দেশাখ বেশি খায়, রামক্রী দেশাখকে ইচ্ছে করেই বেশি দেয়। শিকারে ও প্রধান ভরসা। হইহই করে ওরা যখন বনে বেড়ে দেয় তখন কাহ্নুপাদের বুক ধড়ফড় করে, কেবলই মনে হয় ডোম্বি এখন মাঝনদীতে। ও কোনো পারানির সঙ্গে কড়ি নিয়ে দর কষাকষি করছে এটা ভাবতে ওর খারাপ লাগে। বেঁচে থাকার জন্য কত কিছুই তো করতে হয়।

‘তোমাকে একটু আনমনা দেখাচ্ছে কানুদা?’

‘ও কিছু না।’

‘নেশা বেশি হয়নি তো?’

‘পাগল।’

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

‘কী যে বলিস দেশাখ। নেশা কানুদাকে কখনো ধরে না, যদি না কানুদা নেশাকে ধরে।’

‘তা ঠিক। আমরা চলি কানুদা, তোমরা ঠিকমতো এগুবে কিন্তু।’

দেশাখ, কামোদ, রামক্রী ও আরও কয়েকজন তিরধনুক নিয়ে গাছের আড়ালে চলে যায়। বাকি সবাই চারদিক থেকে টিন বাজিয়ে ভীষণ শব্দে হরিণ তাড়া করে, ভয়ে হরিণগুলো এদিক-ওদিক ছুটতে থাকলে ওরা মারবে। সবাই আনন্দ-উল্লাসে মুখ দিয়ে অদ্ভুত শব্দ করতে করতে ছুটছে, বনের কিছু অংশ ঘিরে ধরেছে—এখনও একটা হরিণও বের হয়নি, প্রাণভয়ে লুকিয়েছে যেন কোথায়। তবে বেশিক্ষণ থাকতে পারবে না, বেরুতে হবেই। হাঁটতে হাঁটতে কাহ্নুপাদ একসময় একলা হয়ে যায়, ইচ্ছে করেই ও কেটে পড়েছে, ভালো লাগে না। তা ছাড়া রাজদরবারে বসে পাখা টানতে হয়, ছুটোছুটিতে ওর তেমন অভ্যেস নেই, অল্পেই হাঁফিয়ে ওঠে। এদিক-ওদিক কাউকে না দেখে একটা ঝোপের আড়ালে বসে পড়ে ও, বুক ভরে শ্বাস নেয়, হাঁফ ধরে গিয়েছে। তা ছাড়া ঘামও ঝরছে প্রচুর। ফতুয়াটা খুলে ফেলে ঘাসের ওপর মেলে দেয়, হাতের তালুতে কপালের ঘাম মুছে ফেলে। পাশের ঝোপে খসখস শব্দে তাকাতেই লক্ষ করে চমৎকার এক মায়া হরিণের বাচ্চা বড়ো বড়ো চোখের টলটলে দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। কাহ্নুপাদের বুকটা ধ্বক করে ওঠে। হরিণের মাংস ওর ভীষণ প্রিয়, সেজন্য এদের সঙ্গে আসা। বাচ্চাটা একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে, দৃষ্টি সরায় না। কাহ্নুপাদের মনে হয় ও বুঝি মা-কে হারিয়ে ফেলেছে। তখুনি ওকে তাড়াবার কোনো ইচ্ছে হল না কাহ্নুপাদের, থিতিয়ে এল মাংস খাওয়ার লোভ। শিউরে উঠল ও নিজে নিজেই, এ জায়গায় ও না হয়ে দেশাখ হলে কী হত? পরমুহূর্তে প্রচণ্ড টিনের শব্দে বাচ্চাটি ভয়ার্ত দৃষ্টিতে এদিক-ওদিক তাকায়, কালো চোখের ভীরু দৃষ্টি ছলছলিয়ে ওঠে। শবরীর কথা মনে হয় কাহ্নুপাদের, শবরী এমন, বিহ্বল মুহূর্তে ছলছল করে ওর সমস্ত শরীর। হাসি পায় ওর, হরিণের মাংস যতই প্রিয় হোক না কেন ও নিজে কোনোদিন শিকারি হতে পারবে না। বাচ্চাটা যে ওর কাছে আশ্রয় চাইছে, কাহ্নুপাদ অসহায় বোধ করে। দেশাখের হাত থেকে ও কিছুতেই বাচ্চাটিকে রক্ষা করতে পারবে না। বিড়বিড়িয়ে ওঠে, ‘আপন মাংসই ওর সবচেয়ে বড়ো শত্রু।’ কে ওকে রক্ষা করতে পারবে? কাহ্নুপাদ বাচ্চাটিকে ধরতে গেলে ওটা দৌড়ে পালিয়ে যায়। কোনদিকে যে গেল ও তা হদিস করতে পারে না। সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত পরিশ্রম করে তিনটে বড়ো হরিণ মেরেছে ওরা, দুটো দেশাখ, একটা রামক্রী। দেশাখ একই সঙ্গে আরও চারটে খরগোশ মেরেছে। কামোদ মেরেছে একটি সজারু, বাকিরা সবাই কম বেশি পাখি মেরেছে, সবার মনে খুশির ভাব। হরিণের বাচ্চাটাকে দেখে ক্ষণিকের জন্য বিভ্রান্ত হলেও কাহ্নুপাদ ভীষণ খুশি, তিনটে হরিণ কম কথা নয়। হল্লা করতে করতে ফিরে আসে ওরা। দুটো হরিণ টুকরো টুকরো করে কেটে ভাগ করে নেয়, অন্যটা রেখে দেয়। সন্ধ্যায় ওটাকে আস্ত গুড়িয়ে ওদের উৎসব হবে, পুরো পাড়া খুশিতে মেতে ওঠে। বিরাট আগুনের কুণ্ড করে হরিণ পোড়াবার আয়োজন করে, ছোটোদের উল্লাস আর চিৎকারে সরগরম হয়ে ওঠে পাড়া। সব আয়োজন ঠিকঠাক করে হাতে একটি খরগোশ দোলাতে দোলাতে পুবপাড়ার দিকে ছোটে দেশাখ, বেশ কয়েকদিন বিশাখার সঙ্গে দেখা নেই, মন ছটফট করছে, তা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছাড়া উৎসবের খবরটাও দিতে হবে ওকে। ওই পাড়াটা সবচেয়ে সুন্দর আর ছিমছাম, ছোটো ছোটো টিলার পাশে চাঁচর বেড়ার বাড়িগুলো একদম ছবির মতো। বিশাখার বাবা খুব গরিব। একগাদা ভাই-বোনের মধ্যে ও সবার বড়ো, ঠিকমতো খাওয়া জোটে না। রোগা শরীরের মাঝে জ্বলজ্বল করে চোখ জোড়া। ওই চোখের দীপ্র ঔজ্জ্বল্যে দেশাখের প্রতিদিনের অবগাহন, নেশার মতো লাগে, যেন ওই সাগর এক ভিন্ন হাঁড়িয়া। ভুলে যায় অভাবের কথা, শিকারের কথা। বিশাখার অবুঝ চেতনায় নিজেকে দেখতে ভালো লাগে দেশাখের। আর কেউ ওকে এমন করে ধরে রাখতে পারে না। বউদি একদিন হাসতে হাসতে বলেছিল, 'ওই রোগা, পুঁচকে মেয়েটার কী আছে বলো তো?'

'কী আছে তা তো জানিনে।'

'ওমা কেমন কথা?'

'অত জানতে গেলে প্রেম হয় না বউদি।'

'তাই নাকি?'

'তোমরা যেন কী? মাঝে মাঝে বেশি হিসেব আমার একটুও ভালো লাগে না বউদি।'

'হিসেবই তো তোমার কাজ। এই যেমন হিসেব করে তির ছোঁড়া।'

'সবসময় কি আর এসব পোষায়। তাই কখনো কখনো ওটাকে মাঝনদীতে ফেলে দেই।

'তাই বলো।'

বউদির বাঁধভাঙা হাসিতে দেশাখ লজ্জা পেয়েছিল। ভাবতে ভাবতে দেশাখ বিশাখাদের বাড়ি ছাড়িয়ে চলে যায়।

'কোথায় যাচ্ছেন দেশাখদা?'

'এই যে নিশু তোদের বাড়িতে যাচ্ছি।'

'বা রে, বাড়ি ছেড়ে তো চলে এসেছেন।'

'তাই তো, তোর দিদি কই রে নিশু?'

নিশু পোকা খাওয়া দাঁতগুলো বের করে হাসে, হাত দিয়ে দূরের টিলা দেখায়, 'ওইখানে গেছে।'

'কেন?'

'শামুক খুঁজতে।'

'এই অবেলায় শামুক খুঁজতে?'

'বাহ্, দিদি শামুক আর নলতে শাক না আনলে যে রাতে আমাদের উপোস দিতে হবে। তিনদিন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থেকে বাবার জ্বর, ঘরে একটু বার্লিও নেই। মা বসে বসে কাঁদছে।'

'অ।'

দেশাখের বুক ভার হয়ে যায়। নিশুর বয়স হয়তো বারো হবে, দেখতে তেমন দেখায় না, মুখটা কচি পেলব। ও সংসারের খবর মুখস্থের মতো বলে যায়, ঠিক যে অনুভব করে তা নয়। ওর পোকা-খাওয়া দাঁত বের করা হাসিতে আর যাই হোক অভাবের ছোবল নেই।

'তুমি কি ওইদিকে যাবে দেশাখদা? তাহলে দিদিকে বোলো আমি বাড়ি চলে যাচ্ছি, একা একা দাঁড়িয়ে থাকতে ভালো লাগে না।'

'ঠিক আছে যা।'

নিশু ছাড়া পাওয়া ছাগলের মতো লাফাতে লাফাতে চলে যায়। বিশাখা ওকে এখানে পাহারায় রেখে গিয়েছিল। দেশাখ খরগোশটা ডান হাত থেকে বাম হাতে নেয়। ভালোই হল, ওই টিলায় গেলে বিশাখাকে একা পাওয়া যাবে। পরক্ষণে মনে হয় বিশাখা অতদূরে একা একা না গেলেই পারত। কত কিছুর ভয়, বেশি ভয় রাজার লোকদের পছন্দ হলে যে কাউকে নিয়ে চলে যায়, তখন ওদের বাছবিচারের বালাই থাকে না, জাতধর্ম মাথায় ওঠে। দেশাখ একটু দ্রুত হাঁটে, মনে হয় খরগোশের ওজন অনেক বেড়ে গেছে। এই মুহূর্তে ওটা বিশাখার সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন, এক রাতের জন্য ওদের বাড়িতে উৎসব জমবে। ওর মা-বাবা ছেলেমেয়েদের সঙ্গে গোল হয়ে বসে চাঁদের আলোয় গল্প করবে। বেশ রাতে ঘুমুতে যাবে ওরা। ভাববে, অন্তত একটি দিন তো পার হল। ছেলেমেয়েরা ঘুমিয়ে গেলে বাবা-মা হয়তো আরও দু-একটা টুকটাক কথা বলবে।

পাহাড়ের গায়ে ধান চাষ করেছে রাজার লোকেরা। এগুলো রাজা বুদ্ধমিত্র কর্তৃক প্রদত্ত মন্ত্রী দেবল ভদ্রের নিষ্কর জমি। ওইখানে আগে বিশাখার বাবার জমি ছিল, জমি ছিল ধনশ্রী ও আরও অনেকের। একদিন দেখা গেল ওটা আর ওদের নেই, রাজা খুশি হয়ে মন্ত্রীকে দান করেছেন। কাউকে জিজ্ঞেস করা হয়নি, কেউ কোনো আপত্তিও করতে পারবে না, কেননা রাজা দেশের ভূমির একমাত্র মালিক। দেশাখের দাঁতে দাঁত লেগে হঠাৎ করে কড়কড়িয়ে ওঠে, ওরা সব ছোটোলোক, ওদের কোনো কিছুতে কোনো অধিকার নেই। পাহাড়ের গায়ে গজিয়ে ওঠা কচি ধানের চারা বাতাসে দুলছে। দেশাখ দূর থেকে দেখতে পায় বিশাখাকে, ও নীচু হয়ে শামুক খুঁজছে। এ সমস্ত ধানের খেত পাহারা দেয় রাজার লোকেরা। ধানখেতের স্যাঁৎসেঁতে মাটিতে শামুক পাওয়া যায় সবচেয়ে বেশি, তাই দল বেঁধে ছেলেমেয়েরা আসে শামুক খুঁজতে, তখন ধানের চারা নষ্ট হয়। পাহারাদারের হাতে ধরা পড়লে মার খায়। সেজন্য বিশাখা কখনো দলেবলে আসে না, একা একা আসে, ভাই-বোনদেরও সঙ্গে আনে না, ওরা বড্ড হইচই করে, অনেক সময় আসল কাজই ভন্ডুল হয়ে যায়।

কোঁচড়-ভরতি শামুক নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াতেই দেশাখকে দেখতে পায় বিশাখা, কাদা-মাখা পা জোড়া খেতের মধ্য থেকে টেনে তুলে ঘাসে মোছে, তারপর তরতরিয়ে নেমে আসে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

‘তুমি?’

‘কেন আসতে নেই বুঝি?’

‘যাহ্, তাই বলেছি নাকি!’

‘নইলে অবাক হলে কেন?’

‘বড্ড প্যাঁচাতে পারো। অবাক হয়েছি খুশিতে।’

‘কীসের খুশি?’

‘কাছে পাওয়ার খুশি। তোমাকে দেখলেই তো আমি খুশি হই, তবু কেন জিজ্ঞেস করো!’

‘সেটা আমার খুশি, মন চায় বলে জিজ্ঞেস করি।’

‘আসলে তুমি একটা সজারু।’

‘না, কখনো না, আমি মোটেই সজারুর মতো ভীতু নই।’

‘ভীতু নও, কিন্তু সজারুর মতো তোমার মনের মধ্যে কাঁটা।’

‘ও তাই বলো।’ দেশাখ হো-হো করে হাসে। বিশাখা ভেংচি কাটে। দেশাখ ওর হাত ধরে টিলার কোল ঘেঁষে বসে।’

‘দেখো তোমার জন্য কী এনেছি?’

‘খরগোশ? তুমি মেরেছ?’

‘তবে আর কে? মেরেছি আবার বাড়ি বয়ে নিয়ে এসেছি।’

‘যা মজা হবে! মা-কে বলব অনেক মশলা দিয়ে রাঁধতে। আজকে একটা দিনের মতো দিন। কী যে খুশি লাগছে!’

দেশাখের বুক কেমন করে। বিশাখা বড়ো অল্পে খুশি হয়, ওর ওই খুশিটুকু যদি প্রতিদিনের করে দেয়া যেত!

‘এই কী ভাবছ?’ বিশাখা দেশাখের পিঠে হাত রাখে।

‘তুমি এতদূর একলা একলা কেন এসেছ বিশাখা?’

‘মা কাঁদছিল, নইলে রাতে উপোস—’

‘ও আর বলতে পারে না।’

‘থাকগে এসব কথা।’

দেশাখ ওকে বুকে টেনে নেয়। শুকনো চুল সরিয়ে দেয় কপালের ওপর থেকে। পেটে আগুন নিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আগুপিছু ভাবা যায় না, এটা দেশাখ বোঝে, তবু মন মানতে চায় না। বিশাখার বিষণ্ণতায় ও ভীষণ অনুতপ্ত হয়, কথাটা না বললেই পারত। বিশাখাও জানে ওর এই আসাটা দেশাখেরও পছন্দ নয়, কিন্তু উপায় কী, বিশাখার গলা ধরে আসে। দেশাখ ওকে খুশি করার জন্য বলে, 'দেখি কতগুলো শামুক পেয়েছ?'

'অনেক, আমাদের দু-দিন হবে, আজকে আমার ভাগ্য খুব ভালো, শামুক আবার খরগোশ!'

দেশাখের মনে হয় ওর বোন দুটিও এমন শামুক খুঁজতে আসে, কাঁকড়া ধরতে যায়। ও বিরক্ত হয়, এই প্রসঙ্গ থেকে নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা করে।

'বিশাখা আজ সন্ধ্যায় হরিণ-উৎসব।'

'সত্যি?' ও আবেগে দেশাখকে জড়িয়ে ধরে।

'সন্ধ্যা হয়ে আসছে, চলো এখন যাই। আমি নীচে দাঁড়াব, তুমি মা-কে বলেই চলে আসবে।'

বিশাখা লাফিয়ে ওঠে। সবুজ টিলাগুলো ভীষণ নির্জন, যেন টিলার ওপরের ছোটো ছোটো বাড়িগুলো প্রস্ফুটিত কার্পাস। দেশাখের শিকারে অব্যর্থ হাতের মুঠোয় বিশাখার শামুক-খোঁজা কাদা লাগা হাত। দূর পাহাড়ের দিক থেকে মৃদু হাওয়া আসছে। সবুজ টিলার পাদদেশে একজোড়া মানব-মানবীর আকাঙ্ক্ষা নদীর মতো বয়ে যায়। দুজনে কথায় হাসিতে মগ্ন হয়ে পথ চলে।

বিশাখাকে উৎসব-প্রাঙ্গণে রেখে দেশাখ বাড়ি আসে। টিনের তোরঙ্গের নীচ থেকে বহুদিনের পুরোনো নীল জামাটা বের করে গায়ে দেয়। চুপচুপে করে দেয়া সরষের তেলে চুলগুলো চকচকে করে তোলে, জুলফি বেয়ে সে তেল গড়ায়। ভাঙা আয়না বারান্দায় নিয়ে এসে মাঝখান দিয়ে সিঁথি করে চুল আঁচড়ায়। বাবার ঘর থেকে কাশির শব্দ আসে, মা-র সাড়াশব্দ নেই, ভাই-বোনগুলো চলে গেছে উৎসব-প্রাঙ্গণে। বেরোতে গিয়ে দেশাখের বুক খচ করে ওঠে, চাঁচর বেড়ার ওই পাশে সুলেখা কেমন চুপচাপ বসে আছে, পিঠের ওপর রাশি রাশি চুলের গোছা যেমন কালো তেমন ঘন এবং লম্বা। ও থমকে দাঁড়িয়ে এক মুহূর্ত দেখে নিজে নিজেই বলে, 'অপূর্ব!' অনেকদিন হল সুলেখা আর ভুসুকুর কথা জিজ্ঞেস করে না, যত দিন যায় ও ম্রিয়মাণ হতে থাকে। ভুসুকু যাদের সঙ্গে বাণিজ্যে গেছে তারা কেউ ফেরেনি, কোনো খবরও নেই। হঠাৎ দেশাখের মনে হয় অর্থহীন অপেক্ষা, ভুসুকু আর ফিরবে না। নৌকা হয়তো জলদস্যুরা নিয়ে গেছে, তরঙ্গসংকুল মাঝনদীতে ওদেরকে চ্যাংদোলা করে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে, নয়তো ঝড়ে নদীতে ডুবেছে। সুলেখা মিছেই দিন গুনছে। এই বয়স কি সুলেখা আর কোনোদিন ফিরে পাবে? না কি আনন্দে নিজেকে মাতিয়ে তোলার সুযোগ হবে? রাতদিন তো এই সংসারের পিছে খেটে মরে, তবে কেন একদিনের জন্য উৎসবে যাবে না? কেন মন খারাপ করে বসে থাকবে?

ভাবতে ভাবতে ও এক পা দু-পা করে সুলেখার পিছে এসে দাঁড়ায়, 'বউদি?'

'বলো।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুলেখা মুখ না ঘুরিয়েই উত্তর দেয়, গলা ভারী, চোখের কোনা ভেজা। কিন্তু দেশাখকে অশ্রু দেখাতে চায় না।

'আমার চেহারা কি এতই খারাপ যে তাকাবে না বলে ঠিক করেছ?'

দেশাখ ওকে হাসাবার চেষ্টা করে, নিজেও হাসে। কিন্তু লাভ হয় না। সুলেখা একইভাবে বলে, 'কী বলবে বলো?'

'চলো।'

'কোথায়?'

'কেন হরিণ-উৎসবে?'

'তুমি যাও।'

'আমি তো যাবই, তোমাকেও নিয়ে যাব।'

'বাবা-মা?'

'অত সংকোচের দরকার নেই বউদি। এ সংসারে আমার ওপর কে কথা বলবে? কেউ কিছু বললে সেসব আমি দেখব। তুমি ওই বিয়ের সময়কার মেঘডুম্বুর শাড়িটা পরে নাও। আমি উঠোনে দাঁড়াচ্ছি।'

সুলেখা আর কোনো কথা না বলে ঘরে চলে যায়, মনে কৃতজ্ঞতা, দেশাখ যেন ওকেও ভুসুকুর বাণিজ্যের নৌকায় উঠিয়ে দিয়েছে, ও বন্দর অভিমুখে চলেছে। পটহ-মাদলের শব্দ উত্তাল হয়ে ওর দিকে ছুটে আসছে। কুয়োতলার ছোলঙ্গ গাছটায় বসে একটা কাক ডাকছে, চারদিকে ছমছমে আঁধার, ঘরের ভেতর একজন বৃদ্ধের কাশি দমকে দমকে বাড়ে, তার পাশে কেউ নেই। এক সময়ে এসব উৎসবে তার রক্ত ছলকে উঠত, এখন কি শুনতে পাচ্ছে পটহ-মাদলের শব্দ? অল্পসময়ে সুলেখা বেরিয়ে আসে, অন্ধকারে ওকে রহস্যময়ী মনে হয়। কাপড়ের খসখস শব্দ সে রহস্যকে আরও ঘনীভূত করে। সুলেখাকে সঙ্গে নিয়ে হাঁটে দেশাখ।

হরিণের পোড়া মাংসে ভুরভুর করছে সমগ্র পল্লি। আগুনের লাল শিখা গনগনে, সাত-আটজন মিলে ঝলসাচ্ছে মাংস। কাছেই পটহ-মাদলের ঝংকারে নাচছে ডোম্বি, কোনোদিকে ভ্রুক্ষেপ নেই। দেশাখ সুলেখার হাতে চাপ দেয়, 'দেখছ ডোম্বিটা যেন কী?'

'ও নইলে আসর জমে না।'

সুলেখা গাঢ় কণ্ঠে বলে। সে স্বরে সুলেখার দিকে চমকে তাকায় দেশাখ, বোঝে এ নারী বদলে গেছে, লাস্যময়ী হয়ে উঠেছে, ওর চোখের দীপিত বাসনার ফুলকি হাওয়াই-বাজির মতো জ্বলছে আর নিভছে। দেশাখ ওর হাত ছেড়ে দেয়, ওর ঘাড়ে মৃদু চাপড় দিয়ে ভিড়ে মিশে যায় সুলেখা। দেশাখ কিছুক্ষণ একা দাঁড়িয়ে থাকে, ওর মনে হয় চারদিকের মানুষের তপ্ত নিশ্বাসে সময়টা এখন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাত নয়, যেন এক প্রচণ্ড দুপুর, একটু পর খাওয়াদাওয়া শেষ হলে উদ্দাম হয়ে উঠবে পটহ-মাদলের শব্দ, সঙ্গে জোড়া জোড়া মানুষগুলোও। ও বিমূঢ়ভাব কাটিয়ে বিশাখাকে খোঁজে। ও একমনে ডোম্বির নাচ দেখছিল, ওকে হাত ধরে টেনে অর্জুন গাছের আড়ালে নিয়ে আসে।

বিশাখা ছটফটিয়ে ওঠে, 'এত দেরি করেছ কেন? তোমাকে খুঁজে—'

দেশাখ ওকে কথা বলতে দেয় না, ঠোঁটে ঠোঁট চেপে ধরে। অর্জুন গাছের আড়ালের আধো-অন্ধকারে ওরা মিশে যায়।

খাবার সময় হয়েছে, পটহ-মাদল থেমে থেমে শব্দ করছে, তালের বাইরে এলোপাতাড়ি বাড়ি পড়ছে, ডোম্বি পা ছড়িয়ে বসে আছে, বাচ্চারা খেয়েদেয়ে চলে গেছে। দেশাখ মাংস বিতরণ করছে, সুলেখাকে কোথাও দেখতে পাচ্ছে না ও। সবাই গোল হয়ে বসে আসর জমিয়েছে, ছোটো ছোটো হাড় এ ওর গায়ে ছুঁড়ে মারে। সঙ্গে হাঁড়িয়া আছে, নেশার এখন প্রচণ্ড গতি, ঠেকিয়ে রাখে কারও সাধ্যি। দেশাখের মনে হয় চমৎকার সেজেছে শবরী, অপূর্ব দেখাচ্ছে ওকে। বিশাখা নিজেকে সাজাতে পারে না, বোঝে না কোন জিনিসে ওকে মোহিনী মনে হবে, শবরী জানে। কাহ্নুপাদের কবিতার মতো শবরী নিজেকে সাজায়। এসব ব্যাপারে এই পল্লিতে ও-ই সেরা। দেশাখ শবরীকে একটা বড়ো মাংসের টুকরো দিতে দিতে বলে, 'খাও বউদি নাচের সময় কাজে লাগবে।'

'দ্যাখো কাণ্ড, আমি খেতে পারব না।'

'বললেই হল? পারতেই হবে।'

সবাইকে দিয়ে নিজে একটা মাংসের টুকরো নিয়ে বসে। অন্যপাশে বিশাখার চোখে চোখ পড়তে দেখে ও মিটমিটি হাসছে। দেশাখ ওকে জিভ দেখায়।

কাহ্নুপাদের পাশে বসেছে শবরী, ওর ঝকঝকে সাদা দাঁত ঝিলিক দেয়, অকারণে হাসে, কায়দা করে দাঁতের ফাঁকে মাংসের টুকরো ধরে রাখে। কখনো কাহ্নুপাদের পিঠে হাত রেখে কথা বলে। এ দৃশ্যে ডোম্বি চোখ ঘুরিয়ে নেয়, ক্রোধ দমন করার জন্য গুনগুনিয়ে গান গায়, দুম করে পা ফেলে ঘুঙুর বাজায়, বাজনাদারদের গায়ে গড়িয়ে পড়ে, মনে আগুনের জ্বালা, অসম্ভব কষ্টে নিজেকে সামলিয়ে রাখে। কাহ্নুপাদ ওকে যতই ভালোবাসার কথা শোনাক—গোপনে মল্লারী ডাকুক, উৎসবে শবরী সব। ডোম্বি ঢকঢক করে হাঁড়িয়া গেলে। বাঁধা দেয় নিশিকান্ত, 'এত খেলে নাচবি কী করে? শরীর নড়বে না তো।'

'নাচব না।'

'নাচবিনে মানে? রাত কত বাকি—'

'তাতে কী? নাকি রাতটুকু তো সবার। সবাই তো তখন জোড়ায় জোড়ায় নাচবে।'

নিশিকান্ত হাঁ-করে ওর দিকে তাকিয়ে থাকে। দীর্ঘদিন ধরে এই রমণীর নৃত্যের সঙ্গে ও বাজনা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাজায়, কিন্তু কোনোদিন ওকে বুঝতে পারে না। ও একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে। ডোম্বির ঝাঁঝালো কণ্ঠ শিথিল হয়ে যায়, কারও ওপরই-বা রাগ করবে, রাগ করলে শরীর কিড়মিড় করে, নাচতে ইচ্ছা করে না। তাতে লাভের বদলে লোকসান। জীবনভর লোকসানের পাল্লাই ভারী হয়েছে, ও আর সে বোঝা বাড়াতে চায় না। এখন মন চায় কেবল প্রতিশোধ। কার ওপর, কীসের ওপর বুঝতে পারে না। বোঝার চেষ্টায় ও নিজেকে ক্ষয় করে।

সুলেখা অন্ধকার হাতড়ে সঙ্গী খুঁজে পেয়েছে, বিপত্নীক সুদাম ওর সঙ্গী হয়েছে। গত বছর বউ মরেছে সুদামের, সারা দিন খেতে কাজ করে, রাজার জমিতে ধান বোনে। কারও সাতে-পাঁচে নেই, মুখে হাসি লেগেই থাকে। সবসময়ই সুদামকে পছন্দ করত ও। আজ সুযোগ পেয়ে দুজনে প্রাণভরে নাচবে বলে ঠিক করেছে।

পোড়া মাংসের গন্ধ এখন আর বাতাসে তীব্র নয়, মৃদু। হাঁড়িয়ার নেশা সবার মগজে, কিন্তু পটহ-মাদলের ঝংকৃত শব্দে জোড়া পা চঞ্চল, উদ্দাম, কোনোদিকে খেয়াল নেই ডোম্বির, একমনে হাঁড়িয়া খায়, ওর নেশা আজ সমুদ্র হয়েছে, যত ঢালো কোনো আপত্তি নেই, ওর ঘুঙুর আর বাজে না।

পিপুল গাছের নীচে কাহ্নুপাদ শবরীর খোঁপা খুলে দেয়, ও ভিন্ন পরিবেশে ভিন্ন নারী হয়ে কাহ্নুপাদকে আচ্ছন্ন করে রাখে। জোড়া জোড়া নর-নারী কেউ কারও দিকে তাকায় না, নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত। দেশাখের মনে হয় চারপাশের এইসব মানুষকে ও চেনে না, ও বিশাখার মধ্যে নিজের অস্তিত্ব খোঁজে। এক সময়ে পটহ-মাদল থেমে যায়, বাতাসে মাংসের গন্ধ আর নেই, আগুন নিভে ছাই, উৎসব শেষ। খোলা আকাশের নীচে ওরা ঘুমিয়ে থাকে, শেষরাতের হিমেল বাতাস সে ঘুম আরও গাঢ় করে দেয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্রাহ্মণ মন্ত্রী দেবল ভদ্র বৌদ্ধ রাজা বুদ্ধমিত্রের অপরিহার্য অঙ্গ। দেবল ভদ্র ছাড়া কোনো রাজকাজ চলে না। বৌদ্ধ রাজা বেদ-বিরোশি হলেও আর্য-সংস্কারের বিরোধী নয়। ব্রাহ্ম্য সমাজের সঙ্গে আপোস করেছে বুদ্ধমিত্র। সে কারণে তার রাজসভায় ব্রাহ্মণ মন্ত্রী থেকে আরম্ভ করে অনেক রাজকর্মচারী নিযুক্ত রয়েছে। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরা এখানে নিত্যদিন আসর বসায়। স্বভাবতই বাঙালির দৈনন্দিন জীবনের ক্রিয়াকর্মের হোতা হয়ে ওঠে তারা। সমাজ ও ব্যক্তিজীবনের গভীরে এ শিকড় প্রোথিত হয়ে যায়, আর এ আধিপত্যের শিকার হয় নিম্নবর্ণের মানুষ।

বুদ্ধমিত্র দেবল ভদ্রকে নিষ্কর জমি দান করেছে, মাইলের পর মাইল সে জমির বিস্তার, বিশাখাদের বাড়ির পাশের টিলার গা ঘেঁষে এ জমির সীমানা শুরু, শেষ যে কোথায় দেবল ভদ্র নিজেও হদিস করতে পারে না। চন্দ্র-সূর্য-চাঁদ-তারা যতদিন স্থির থাকবে ততদিন পর্যন্ত দেবল ভদ্র বংশপরম্পরায় এ জমি ভোগ করবে, যে রাজাই আসুক রাজকোষে তাদেরকে কোনো রাজস্ব দিতে হবে না। অবশ্য রাজা বুদ্ধমিত্র এজন্য দানপুণ্যের একষষ্ঠ ভাগের অধিকারী হয়েছে, তাই তার লাভ, নরকের দ্বার বুদ্ধমিত্রের জন্য বন্ধ হয়ে গেল। দেবল ভদ্রকে যথেষ্ট সমীহ করে বুদ্ধমিত্র, আচারে এবং অনাচারে দু-ভাবেই দেবল ভদ্র এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করে। ফলে আধিপত্য এবং অর্থ দুই-ই এখন তার হাতের মুঠোয়।

বুদ্ধমিত্র এবং দেবল ভদ্র দুজনেই ইন্দ্রিয় কর্তৃক শাসিত হতে বড়ো বেশি ভালোবাসে, জীবনকে তারা বোঝে ভোগে, সে ভোগ যেভাবে যে পথে যে উপায়েই হোক না, কোনো আপত্তি নেই। এ ছাড়া জীবনের আর সব ফাঁকি, ওই ফাঁকিতে পড়লে জীবনকে কেউ আর ভোগ করতে পারে না। তাঁদের দুজনের জীবনদর্শন আশ্চর্যভাবে মিলে যায়, তাই কোনো বিরোধ নেই। স্থায়ী নর্তকী মাধবী আছে রাজদরবারের জন্য, কিন্তু তাতেও হয় না। রাতের অন্ধকারে চর আসে তাঁদের সুখের উপকরণ খুঁজতে। এ ছাড়া বিশেষ উৎসব অনুষ্ঠান তো লেগেই আছে। পানীয়ের সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে যায় অনেক মেয়ের শরীরের কলস, বিরামহীন এ আকাঙ্ক্ষা। জীবনের এ উৎসবকে বহুবিধ বর্ণ আর সঙ্গীতে সাজাতে দক্ষতার সীমা নেই দেবল ভদ্রের, কী যে সঞ্জিবনী শক্তি ক্রিয়া করে তার নিপুণ আকাঙ্ক্ষায়। আয়েশের বিশ্রস্ত আলাপে বসে অন্ধকারের আকাশ হাতড়ে চাঁদ খোঁজে দেবল ভদ্র। এসব অনাচারের বিরুদ্ধে মাঝে মাঝে আপত্তি করে পণ্ডিত সুধাকর ভট্ট—জ্ঞান, অনুশীলন এবং শাস্ত্র-আলোচনা ছাড়া জীবনের আর কোনো অর্থ যার জানা নেই। কিন্তু সুধাকর ভট্টকে পরোয়া করার মতো লোক দেবল ভদ্র নয়, তবে মাঝে মাঝে সমীহ করে। সুধাকর ভট্টের ব্যক্তিত্ব অসাধারণ, অস্বীকার করার আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও সমীহ না করে উপায় নেই। বুদ্ধমিত্র এই পণ্ডিতকে শ্রদ্ধা করে, সেজন্য মন্ত্রীর জোর সবসময় খাটে না, অনেক কিছুই চুপচাপ হজম করে নিতে হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাজসভার এ ধরনের পরিবেশ কখনো ভীষণ শ্বাসরুদ্ধকর হয়ে ওঠে কাহ্নুপাদের জন্য, বলির পাঁঠার মতো ছটফট করে কেবল। ব্রাহ্মণরা সবসময় কোণঠাসা করে রাখে ওকে। মুখটি খুলবার জো নেই, অথচ ও নিজে একজন কবি, সে-কথাও ভুলতে পারে না। ভেতরে প্রকাশের আকাঙ্ক্ষা যখন তীব্র হয় তখন ওই রাজসভা তছনছ করে ফেলতে ইচ্ছে করে কাহ্নুপাদের। ও প্রবলভাবে অনুভব করে যে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের রাশভারী সংস্কৃত ভাষার পাশাপাশি ওর লৌকিক ভাষাকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে, এ ভাষাতেই কথা বলে ওর মতো শত শত জন। ওরা ওকে নিয়ে যত হাসাহাসি এবং বিদ্রুপ করুক না কেন, ওই ভাষাই কাহ্নুপাদের বুকের ভাষা, সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে ওর কোনো সম্পর্ক নেই, নেই নাড়ির টান। সেজন্য মাথাব্যথাও নেই, যতই পবিত্র এবং রাজসভার ভাষা হোক না কেন। শাস্ত্র আলোচনার পাশাপাশি মাসে একটা-দুটো গীতের আসর বসে। দেবল ভদ্রকে অনেক অনুনয়বিনয় করা সত্ত্বেও এ পর্যন্ত একটাও গীত পড়ার অনুমতি পায়নি ও, উপরন্তু ব্যঙ্গ করেছে মন্ত্রী, 'ছুঁচোর কেত্তন' বলে ওকে ভাগিয়ে দিয়েছে। বলেছে, লৌকিক ভাষা অগ্রাহ্য, অকথ্য। 'নম্লেচ্ছিতবৈ, নাপাভাবীতবৈ'। এটা ম্লেচ্ছ ভাষা, এই ভাষা ব্যবহার করলে অপরাধ হয়, যদি কেউ ব্যবহার করে তাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। কাহ্নুপাদ ভেবে পায় না যে রাজদরবার আর পুজো-অর্চনা ছাড়া যে ভাষার কোনো ব্যবহার নেই তার এত মূল্য কীসের? মাথায় তুলে রাখলে তো তার প্রবহমানতা থাকে না। বরং ওদের মুখের ভাষাই মুখে মুখে ঠিক থাকবে, বিস্তৃত হবে এক জন্ম থেকে আরেক জন্মে। ভাবতে গিয়ে ওর মাথায় ঝিম ধরে, দেবল ভদ্রের টুঁটিটা ছিঁড়ে ফেলতে ইচ্ছে করে। নিজের মুখের ভাষাকে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে ভীষণ প্রতিজ্ঞা করে, তখন কাহ্নুপাদের মুখের কালো রং বেগুনি হয়ে যায়।

রাজসভায় আগামীকাল নৃত্যগীতের আসর বসবে সন্ধ্যায়। ফুল-লতা-পাতা-আলপনায় উৎসব-প্রাঙ্গণ সাজানো হয়েছে। ঘিয়ের প্রদীপ জ্বলবে গোধূলির পর। দেবল ভদ্রের উৎসাহের শেষ নেই। স্থায়ী নর্তকী মাধবী ছাড়াও আরও পাঁচজন তরুণী এসেছে। তাই আজ সারাদিনের ছুটি। গতকাল কাহ্নুপাদ দেবল ভদ্রের অলক্ষে বুদ্ধমিত্রের কাছ থেকে কথা আদায় করেছিল যে আজকের উৎসবে ওর লেখা গীত ও রাজসভায় পড়বে। বুদ্ধমিত্র রাজি হয়। আনন্দে দিশেহারা কাহ্নুপাদ ছুটতে ছুটতে বাড়ি আসে, ভাবতে পারেনি যে বুদ্ধমিত্র এত সহজে রাজি হবে। ফেরার পথে নৌকায় ডোম্বির সামনে উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়ে, 'কাল আমার গীত রাজসভায় পড়ব মল্লারী।'

'সত্যি?' মল্লারীর বইঠা নদীর বুকে জোর শব্দ ওঠায়।

'এতদিনে আমাদের ভাষার মর্যাদা হবে মল্লারী। আমি দেখাব ওদের ওই বড়ো বড়ো তালের মতো শব্দগুলো কেবল ভাষা নয়। আমাদের ভাষা ঝরঝরে, প্রাণবন্ত। আমাদের ভাষা সজীব। কী বলো মল্লারী?'

'হ্যাঁ, ঠিক। যখন তোমার গীত গাই প্রাণ জুড়িয়ে যায়। তখন আমার চোখ দিয়ে জল ঝরে।'

'মাঝে মাঝে তাই ভাবি মল্লারী যে দরকার নেই ওই রাজসভার। তোমার মতো হাজার জনের কণ্ঠই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তো আমাদের সব, কিন্তু পারি না, যখন ওরা অবজ্ঞা করে তখন ওদের ঘাড়ে পা রেখে আমার ভাষার শক্তি দেখাতে ইচ্ছে করে। ইচ্ছে করে নিজের ভাষাটা ওদের সামনে মুকুটের মতো মাথায় পরি। এ ভাষায় যে নদীর স্রোত আছে তা ওদের জানা দরকার। এটা আমাকে করতেই হবে মল্লারী।'

একটানা কথা বলার আবেগে, উচ্ছ্বাসে কাহ্নুপাদের বুক হালকা হয়ে যায়। যতক্ষণ এসব ভাবে ততক্ষণ বুকের মধ্যে ভারী বোঝা জমে থাকে। ও নদীর পানিতে পা ডুবিয়ে দেয়।

'তোমার হাতে জাদু আছে কানু, মুখের ভাষা তুমি বুকের ভাষা করে দাও। কেমন করে পারো?'

ও মৃদু হাসে, 'কী জানি, জানি না তো।'

আনমনে দূরের বনে তাকিয়ে থাকে। মনে হাজার ভাবনা।

'রাজা তোমার কথায় রাজি হল কেন কানু? নেশার ঘোরে বলেনি তো?'

'না গো না। রাজা খুব ভালো।'

আনন্দের আতিশয্যে কাহ্নুপাদ বিচারবুদ্ধিহীন সরল শিশু হয়ে যায়। কোনো কিছু তলিয়ে বিচার করতে গিয়ে নিজের সৃষ্টির উৎস রুদ্ধ করতে চায় না। ওর মগজে এখন অনেক পংক্তি তীক্ষ্ণ হয়ে উঠছে।

ডোম্বি কিছুটা দ্বিধা নিয়ে বলে, 'কী জানি আমার ভয় করে।'

'ও কিছু না।' কাহ্নুপাদ হেসে উড়িয়ে দেয়। এক কোষ জল তুলে ডোম্বির দিকে ছুঁড়ে মেরে বলে, 'ভয় কেন বলো তো?'

'আমরা যে ছোটো জাত। আমাদের তো সবটাতে অপরাধ।'

ডোম্বির কণ্ঠে ঈষৎ ব্যঙ্গ। কাহ্নুপাদ কথা বলতে পারে না, এর উত্তর ওর নিজেরও জানা নেই। এ নিয়ে ভাবলে ওর মাথা গরম হয়, কিন্তু উপায় খুঁজে পায় না। এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে নিজের লোকজনদেরও জোরেসোরে কিছু বলতে পারে না। ওদের বিশ্বাস এটাই সত্য, যেমন সত্য চাঁদ-সূর্য, তেমন ছোটোলোক হওয়াটা ওদের নিয়তি। নিয়তির বিরুদ্ধে কথা বলতে নেই। কিছু বললে সব চারদিক থেকে হা-হা করে ছুটে আসে, বলে, ছোটো মুখে বড়ো কথা মানায় না। বলে, বড়ো কথা বললে ভগবান সইবে না। কাহ্নুপাদ ওদের বোঝাতে পারে না, ওদের যে নির্যাতন সইতে হয় এটা ভগবান সয় কী করে? ওরাই কি কেবল ভগবানের পুত্র, এরা কি কেউ নয়? তা না হলে ওদের জন্ম কেন? তাই ওকে চুপ করে থাকতে হয়, অপেক্ষা করে সময়ের, সময় হয়তো এদের চোখ খুলে দেবে। নৌকা কূলে ভিড়লে কাহ্নুপাদ লাফ দিয়ে নেমে যায়, ঘরে ছোটে, আজ ওর ভেতরে প্রবল উত্তেজনা। সন্ধ্যার অনেক বাকি, শবরীর প্রসাধন প্রায় শেষ, ও ময়ূরের মতো পেখম ধরেছে কেবল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাহ্নুপাদ হুড়মুড়িয়ে ঢোকে, 'আহ্ এই মুহূর্তে তোমাকে এমন সাজেই চাইছিলাম সই!'

শবরী অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে, এমন সময়ে কাহ্নুপাদকে আশা করেনি; কানুকে একদম অন্যরকমও লাগছে, যেন ও ঘোড়া ছুটিয়ে অনেক দূরের পথ পাড়ি দিয়ে এসেছে, এলোমেলো চুল কপালে লুটিয়ে আছে, উদ্দীপ্ত চেহারা, গরম নিশ্বাস আসছে নাকের রন্ধ্রপথে।

কাহ্নুপাদ ওর সামনে হাঁটু গেড়ে বসে, 'দেখছ কী সই?'

'তুমি যেন তুমি নও', শবরীর কণ্ঠে বিস্ময়।

'আমি এখন তোমার অন্য কানু।'

'হ্যাঁ, তা তো দেখছি। অন্যসময় হলে এতক্ষণে রেহাই দিতে না আমাকে।'

'আজ তোমাকে ছোঁব না সই। এই মুহূর্তে তুমি আমার মুখের ভাষা। আজ তোমায় আমি পুজো দেব।

'কী বলছ কানু?'

'কাল রাজসভায় আমার গীত পড়ব।'

'সত্যি?'

'হ্যাঁ সই। আজ আমার সাধনার রাত।'

শবরী হেসে মাথা নাড়ে, 'তাই হবে। আমিও তোমার সঙ্গে রাত জাগব।'

মধ্য যামিনী পেরিয়ে যায়, ঘুমুতে পারে না কাহ্নুপাদ, দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে বসে আছে শবরী, কাহ্নুপাদ ওকে ঘুমুতে বলেছে, কিন্তু ও রাজি হয়নি। হরিণের চামড়া বিছিয়ে তার ওপর উপুড় হয়ে লিখছে কাহ্নুপাদ, পছন্দ হয় না। ছিঁড়ে ফেলে, আবার লেখে। শেষরাতের দিকে হরিণের চামড়ার ওপর ঘুমিয়ে পড়ে।

দু-জনেরই ঘুম ভাঙে বেশ বেলায়, জানালা দিয়ে আলো এসে ভরে আছে ঘর। শবরী নিজের কাজে ব্যস্ত হয়ে যায়। ঘুম ভাঙতেই ওর মনে হয়েছিল যে ওর চাঁচর বেড়ার বাড়িতে আজ উৎসব, কানুকে সারাদিন বাড়িতে পাবে, শবরীর খুশির সীমা নেই। কাহ্নুপাদ নদী থেকে স্নান সেরে এসে লিখতে বসেছে, ওর চুলের মাথায় জল, চেহারায় রাত জাগার ক্লান্তি নেই। শবরী রান্নার জোগাড় করছে। কানুর প্রিয় কচ্ছপের মাংস রাঁধবে, প্রচুর মশলা, দই, রাই সরিষায় সে ব্যঞ্জনের গন্ধ টিলার গায়ে ম-ম করবে। ভাত, গম, গুড়, মধু, ইক্ষু, তালরস গাঁজিয়ে মদ তৈরি করা ছিল, আজ তা কানুর সামনে দেবে। নালিতা শাকের ঝোল করবে, সঙ্গে মুসুরির ডালের বড়া। ওর মনে হয় প্রিয়জনকে কেন্দ্র করে এ উৎসবকে আপন মনে ভরিয়ে রাখা যায়, এখানে লোকের আগমন চলে না, একাকী খুশির এই ভীষণ আবেগে শবরী মগ্ন হয়ে থাকে। কাহ্নুপাদের মনের সঙ্গে যার বিন্দুমাত্র যোগ নেই। রান্নাবান্না শেষ করে বেড়ার গায়ে মেঝেতে আলপনা আঁকে শবরী। তারপর হাতে পায়ে কাঁচা হলুদ মাখে, একটু পরে দিঘল চুল ছেড়ে দিয়ে নাইতে যায়। পায়ে মল নেই, তবু মনে হয় ওর প্রতি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পদক্ষেপে ঝুমঝুম শব্দ হচ্ছে।

এদিকে কাহ্নুপাদ তখন ক্রমাগত নিজের ওপর বিরক্ত হচ্ছে। কোনো পংক্তিই পছন্দ হয় না, পুরোটা তো পরের ব্যাপার। কখনো মনে হয় নিজের জ্বালার কথা উচ্চস্বরে বলে, পরক্ষণে চুপসে যায়, তাহলে ওরা ওকে মেরে ফেলবে। মৃত্যুকে ওর ভয় নেই, কিন্তু এখন যে কত কিছু করার আছে বলে মনে হয়? ও দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরে। কুক্কুরীপাদ এজন্য বলে, 'রুখের তেন্তুলি কুম্ভীরে খাঅ।' সরাসরি বলতে পারে না বলে কুক্কুরীপাদ এমন আবরণ দিয়ে বলে। চমৎকার কথা বলে কুক্কুরী। ওদের জীবনের গাছের তেঁতুল ওই দেবল ভদ্রের মতো হোঁতকামুখো কুমিরে খায় বলেই তো ওদের এত যন্ত্রণা। সমাজে ঠাঁই নেই, মুখের ভাষার দাম নেই, ঘরে নিত্য অভাব। নইলে এত ধান, এত কার্পাস, নদীতে পুকুরে মাছ—কীসের অভাব ওদের? সব ওই রাজার গোলায় যায়, ছোটোলোকদের জন্য কেবল নেড়াকুটা। আর কী? এতেই তো ওদের বর্তে যাওয়া উচিত। প্রচণ্ড ক্রোধে ও একবার লিখে ফেলে ডোম্বির কথা—

নগর বাহিরেঁ ডোম্বি তোহোরী কুড়িআ

ছই ছোই যাইসি ব্রাহ্ম নাড়িয়া

দু-পংক্তি লিখে পরক্ষণে তা কেটে দেয়। দরবারে বসে এই কথা বললে ওরা ওখানেই ওকে টুঁটি ছিঁড়ে মেরে ফেলবে। যত অনাচার সব ওদের জন্য শুদ্ধ, ছোটোলোকেরা তা বলতে পারবে না। সেজন্য কুক্কুরীপাদের মতো ভাষার আবরণ খোঁজে কাহ্নুপাদ।

তিনি ভুঅন মই বাহিঅ হেঁলে

হাঁউ সুতেলি মহাসুহ লীডেঁ!

না, হচ্ছে না। একথা লিখে কী হবে? তিনি ভুবন আমার দ্বারা অবহেলায় বাহিত হল, মহাসুখ লীলায় আমি লিপ্ত রয়েছি। যন্ত্রণাটা তত তীব্রভাবে প্রকাশিত নয়, আরও তীব্র করা চাই। আবার কাটাকাটি শুরু হয়। শবরীর ভেজা চুল থেকে জল ঝরছে, পরিপাটি আঁচড়িয়েছে চুল। তোরঙ্গ থেকে ধোয়া শাড়ি বের করেছে, পায়ে আলতা। বেলা বয়ে যায় তবু কাহ্নুপাদের লেখা শেষ হয় না। শবরী ময়ূরটাকে খেতে দেয়। তখন মাথা ঝাঁকুনি দিয়ে কাহ্নুপাদ একটু স্থির হয়, আর অস্থির হবে না বলে ঠিক করে। আগের একটা লেখা ভীষণ পছন্দ হয়, ওটাকেই ঠিকঠাক করে নেয়।

আলিএঁ কালিএঁ বাট রুন্ধেলা।

তা দেখি কাহ্নু বিমনা ভইলা।।

কাহ্নু কাঁহ গই করিব নিবাস।

জো মন গোঅর সো উআস।।

হ্যাঁ, এটাই হবে। ভীষণ অন্ধকারে পথ রুদ্ধ, তা দেখে কাহ্নু বিমনা হল। কাহ্নু কোথায় গিয়ে নিবাস করবে, যারা মনোচোর তারাই উদাস। এর সঙ্গে আরও ছয় পংক্তি দিব্যি এসে যায়, ও চটপট লিখে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফেলে, কয়েকবার পড়ে, তারপর খুশি হয়ে যায়। কিন্তু খুশি বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না, ভাবে ভাষার আবরণ না রাখতে হলে ওর রচনা আরও তীব্র হত, বুকের জ্বালা উজাড় করে কথা বলতে পারত। ও বিষণ্ণ হয়ে থাকে।

খাবার নিয়ে অপেক্ষা করে শবরী। বাতাসে ব্যঞ্জনের গন্ধ ভাসে। মনটা ক্রমাগত দমে যেতে থাকে। এত আয়োজন, এত যত্ন যার জন্য সে একবারও ফিরে তাকালো না। মন খারাপ করা নিরুৎসাহ শবরীকে আচ্ছন্ন করে রাখে। এ পর্যন্ত তিনবার ডেকেছে কানুকে, হুঁ-হাঁ করা ছাড়া কোনো কথা বলেনি কানু, যেন কোনো খিদে নেই, খাবার কথা একদম ভুলে গেছে। বাইরে বৈশাখের বাতাসের দাপট, অনেক দূর থেকে এসে ঝাপটা দিয়ে যায়, কার্পাসের শুকনো পাতা এসে ঘরে পড়ে। পায়ের নীচে চেপে সেটা গুঁড়িয়ে ফেলে শবরী। ছোটো জানালার কাছে দাঁড়িয়ে আছে ও, দূরে নদীর ধারে মানুষ নেই, নদী নিস্তেজ পড়ে আছে, যেটুকু স্রোত সেটুকু প্রাণের স্পন্দনমাত্র। খাঁ-খাঁ দুপুর, শবরীর কিছু ভালো লাগে না, সাদা কার্পাস ঘূর্ণিতে পড়ে পাক খায়। কাল সারা রাতই প্রায় জেগেছিল, ঘুমুলো আর কতক্ষণই-বা! এখন ঘুম পাচ্ছে, বিরক্ত লাগছে, ইচ্ছে করে শুয়ে থাকতে, দুপুর দেখতে ভালো লাগে না, দুপুর তাতানো, ঝাঁঝ এসে চোখে জল ঝরায়, চোখ জ্বালা করে। শরীর এবং মেজাজ খারাপ হয়ে থাকে। এ আয়োজন যার জন্য সে আজ শবরীর কথা ভুলে গেছে।

দুপুর গড়িয়ে যাবার পর ওঠে কাহ্নুপাদ, মন বিক্ষিপ্ত হয়ে থাকে। যদিও ওই গীতটা লেখার পর বেশ একটা বিশ্বাস হয়েছে নিজের ওপর, অন্তত একটা ভালো লেখা দাঁড় করাতে পেরেছে, কিন্তু দ্বিধামুক্ত হতে পারে না। পণ্ডিতের দল বাঘের মতো বসে থাকে, সুযোগ পেলেই হালুম করে ঝাঁপিয়ে পড়া কেবল। এমনিতেই ওরা কেউ ওর ওপর খুশি নয়, জোর করে নিজের দাবি জানাতে হয়, কাহ্নুপাদের স্নায়ু উত্তেজিত হয়ে থাকে। শবরীর দিকে চাইবার ফুসরত নেই। ওর পায়ের আলতা, ঘরের আলপনা কোনো কিছুই তেমন করে নজরে আসে না। মৌজ করার মতো দুপুরটা আজ শীতল।

খেতে বসেও ঠিকমতো খেতে পারে না কাহ্নুপাদ। যত্ন করে রাঁধা প্রিয় খাবারগুলো সব বিস্বাদ মনে হয়। বুকের ভেতর কী একটা আটকে আছে। ভয়, শঙ্কা ইত্যাদি নানা বোধ ওকে পিছু টেনে রাখে। মনে হয় ভীষণ একটা আগুনের পরিখা ওর পায়ের কাছে। এদিকে থালার ওপর কানুর ভাতের নাড়াচাড়ায় শবরীর চোখ ফেটে কান্না আসে, রাগও হয় নিজের ওপর। যাকে সে ভেবেছিল শ্রেষ্ঠ উপাচার কানু তাকে অবহেলা করে যাচ্ছে। ঝিমধরা অনুভূতি ঝাঁকিয়ে নিয়ে বলে, 'কিছুই খাচ্ছ না কেন তুমি?'

'ধুত, ভালো লাগছে না। আজ তুমি একটুও মনোযোগ দিয়ে রাঁধোনি।'

থালাটা ঠেলে দিয়ে উঠে যায় কাহ্নুপাদ। হাঁড়িকুঁড়ি বাসনকোসনের মধ্যে চুপচাপ বসে থাকে শবরী। সারাদিন দু-জনে দুটো ভিন্ন জগতে কাটিয়ে এখন কী করে একে অপরের মনের কথা বুঝবে? কারও চিন্তার সঙ্গে কাজের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ ছিল না, দু-জনে নিজেদের মধ্যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোনো সেতু তৈরি করেনি, ফলে দু-জনে দুই ভূখণ্ড থেকে বেরিয়ে আসে অপরিচিত মানব-মানবী হয়ে। কাহ্নুপাদ নীচ থেকে ফিরে এসে শবরীকে দেখে অবাক।

'ও কী, তুমি অমন করে বসে আছ কেন? কী হয়েছে তোমার সই?'

শবরীর চোখে জল টলমল করে।

'কাঁদছ?'

বিস্মিত হয় কাহ্নুপাদ। সারা দিনের ঘটনা তলিয়ে দেখার চেষ্টা করে। কই না কিছুই তো হয়নি, কথা কাটাকাটি না, মনোমালিন্য ঝগড়াঝাটি না। তবুও কাঁদছে কেন শবরী? হঠাৎ মনে হয় সকাল থেকে শবরীর সঙ্গে কোনো যোগাযোগ ছিল না। ও একবারও ওর কথা ভাবেনি, ওকে বুঝবার চেষ্টা করেনি, হয়তো ওকে কেন্দ্র করে ভীষণ কোনো আকাঙ্ক্ষা ছিল, সেটা ও পূরণ করেনি। সামান্যতম বিচ্ছিন্নতার সুযোগে জীবনযাপনের কত মূল্যবান মুহূর্ত ওলটপালট হয়ে যায়। সম্পর্কটাই এমন, অহরহ একে অপরকে বুঝতে হয়। এই মুহূর্তে কাহ্নুপাদ কবিতা লেখার মতো নিজেকে আবিষ্কার করে, এতদিন সম্পর্কের এ দিকটা ও কখনো ভেবে দেখেনি, আজ শবরীর চোখের জল নিমেষে ওর বয়স বাড়িয়ে দেয়। মনে হয় মাঝে মাঝে একে অপরের কাজ থেকে এভাবে উধাও হয়ে যাওয়াও এক চমৎকার খেলা, একঘেয়েমির সুতোটা গলায় ফাঁস হয় না। শবরীর পাশে হাঁটু গেঁড়ে বসে কাহ্নুপাদ, গালের ওপর গড়িয়ে পড়া পানির রেখা মুছিয়ে দেয়, শীতল ঠোঁটে চুমু খায়।

'কী হয়েছে তোমার সই? আমার অপরাধ নিয়ো না।'

'আমার কিছু হয়নি।'

'এতটা বেলা পর্যন্ত তোমার থেকে অনেক দূরে ছিলাম সই। তাই এখন বুঝতে পারছি না যে কী দোষ করেছি?'

'বুঝবার মতো মন নেই তোমার।'

'মন?'

হো-হো করে হাসে কাহ্নুপাদ।

'মন নেই বলেই তো গীত রচনা করি, নইলে কী করতাম সই? ঠিকই বলেছ মন নেই আমার।'

কথাটা ভীষণভাবে আলোড়িত করে ওকে। মন না থাকাই ভালো, এর যন্ত্রণা অনেক, এ যে কী যন্ত্রণা তা কাউকে বোঝানো যায় না, যন্ত্রণার দায়ভার নিয়ে কাহ্নুপাদের রাতদিন হরিণ-পোড়া আগুন। শবরীর দিকে তাকায় ও। ওর সাদা মুখে জলের দাগ, খোঁপায় ময়ূর-পালক নেই, গলায় গুঞ্জার মালা নেই, হাতে কেয়ূর এবং পায়ে মলও না, নিরাভরণ শবরীর দিকে আজ ভিন্ন দৃষ্টিতে তাকায় কাহ্নুপাদ। সাদা মুখটা ঘিয়ের প্রদীপের নিভু নিভু আলোর মতো উজ্জ্বল হলুদ, কাহ্নুপাদের বুক দুলে ওঠে। উৎসবের বিবর্ণ আলো যখন রহস্যময় হয়ে এক নিষিদ্ধ স্বর্গে হাতছানি দেয় ঠিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তেমনই মনে হচ্ছে শবরীকে, ও এখন উৎসবের শেষ আলোর মতো লোভনীয়। বৈশাখী বাতাস চাঁচর বেড়ার গায়ে দুপদাপ আছড়ে পড়ে, একগুঁয়ে ষাঁড় যেন, রাখালের হাতছাড়া হয়ে গেছে, কারও কথা শুনতে চায় না। তখন কাহ্নুপাদের চোখের সামনে ঘরগেরস্থালির দুপুর তার চালচিত্র হারায়, বদলে যায় হাঁড়িকুঁড়ির ঘেরাটোপ, এই মুহূর্তে শবরী তাই কাহ্নুপাদের সমস্ত আকাঙ্ক্ষার শেষ ঠিকানা। চোখের জল মুছে যায়, সাদা ঠোঁট রক্তাভ, শবরীর বুকের ভেতর সুখের হরিণ কাঁপে।

আঁধার ঘন হবার আগেই রাজসভা জমে ওঠে, ঝলমল করছে চারদিকে, চন্দনের সুবাস স্নিগ্ধ করে তোলে পরিবেশ। কাহ্নুপাদের বুক কাঁপে, বারবার সেমিজের ভেতর হাত রাখে। হ্যাঁ, কাগজটা ঠিক আছে, হারায়নি। সারা দিন ওই দশটা পংক্তির জন্য জীবনযাপন ভুলতে বসেছিল, এখন ওই একখণ্ড কাগজই ওর মতো শত শত লোকের মানসম্মান, বেঁচে থাকা। কাহ্নুপাদ একপাশে চুপচাপ বসে থাকে, আস্তে আস্তে বুকটা বিশাল হতে থাকে। কীসের ভয়? কাকে ভয়? ভয় করলে ভয় বাড়ে, না করলে সেটা বিনষ্ট হয়। ও নিজেকে শক্ত করে। দেবল ভদ্র কেমন বীরদর্পে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বুদ্ধমিত্র সিংহাসনে অটল, গম্ভীর। ওরা কেউ ওর আপনজন নয়। এই রাজসভায় ও একা লড়াই করতে এসেছে, দাবি জানাতে এসেছে। এইসব ভেবে ও নিজের অবস্থান দৃঢ় করে। পরক্ষণে রাজমহিষী এসে ঢোকেন, কী অপূর্ব। কাহ্নুপাদের চোখে পলক পড়ে না। রূপের ছটার সঙ্গে পাল্লা দিয়েছে মণিমাণিক্যের চাকচিক্য, পরনে মেঘডুম্বুর শাড়ি। দরবারের চেহারা বদলে যায়, সবাই উঠে রজমহিষী চন্দ্রলেখাকে প্রণাম করে। মাপা হাসি রানির ঠোঁটের কোণে। চন্দ্রলেখার জন্য কোনো জুতসই উপমা খুঁজে পায় না কাহ্নুপাদ। হঠাৎ করেই ওর সব ভালোলাগা চুপসে যায়। উৎসবের শুধু প্রথম পর্বের জন্য চন্দ্রলেখা, দ্বিতীয় পর্বে তার কোনো অধিকার নেই। যখন নর্তকীর নূপুরনিক্বণে চঞ্চল হয়ে উঠবে বুদ্ধমিত্রের সমস্ত শরীর তখন চন্দ্রলেখার জন্য দরবারের দরজা বন্ধ, তার স্থান অন্দরমহলে। সে অবস্থান সবসময় প্রতিবাদহীন, চন্দ্রলেখা নিজেও তা জানে এবং জেনেও তা সহ্য করে। এটাই আইন, কোনো কাগুজে আইন নয়, অলিখিত, উত্তরাধিকার সূত্রেই এ আইন এক রাজা থেকে আরেক রাজায় গিয়ে বর্তায়। সব রাজমহিষী অলংকারের মতো এ শর্ত মাথায় নিয়ে অন্তঃপুরে ঢোকে, নির্বিবাদে তা চলে যায় পুত্রবধূদের মাঝে। চন্দ্রলেখা মৃদু হাসছে, দেবল ভদ্রের সঙ্গে দু-একটা কথা বলছে। তার মাথার ওপর দুলছে ময়ূর-পালকের ওপর হিরেমোতির টুকরো বসানো কারুকার্যময় পাখা। ভারী শাড়ি, ভারী অলংকার এবং প্রসাধন কি চন্দ্রলেখাকে ঘর্মাক্ত করেছে? কাহ্নুপাদের ইচ্ছে করে চন্দ্রলেখার উন্মুক্ত হৃদয় দেখতে। নর্তকীর নূপুরনিক্বণের কোন অভিঘাত সেখানে তরঙ্গ তোলে? এক মুহূর্ত শবরীকে না বুঝলে ওর সব কেমন ওলটপালট হয়ে যায়, অথচ ওরা কেমন করে জীবনযাপন এক তারে বেঁধে রাখে? একটুও কি নড়ে না? হয়তো নড়ে, যার খবর ওদের মতো সাধারণ মানুষ কাছে আসে না।

উৎসবের প্রথম অংশ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের জন্যে। জমে উঠবে শাস্ত্রালোচনা, তত্ত্বকথা, স্বরচিত গীত। উৎসব শুরু হয়, কাহ্নুপাদ উৎসুক হয়ে শোনে। সংস্কৃত ভাষার প্রবল স্রোত বয়ে যায় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের ঠোঁটে ঠোঁটে। সেই রাশভারী শব্দগুলো যেন কাহ্নুপাদের ঘাড়ের ওপর প্রহরীর হাতের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লাঠির প্রচণ্ড আঘাত, ঘাড় নড়াবার উপায় নেই, কান পেতে শুনতে হয়, রস উদ্ধার করার সামর্থ্য ওর নেই, আগ্রহও নেই বুঝবার, বরং বিজাতীয় ক্রোধ হয়। জীবনের সঙ্গে যার কোনো যোগ নেই তাকে নিয়ে বাড়াবাড়ি কাহ্নুপাদের অসহ্য, বিরক্ত লাগে ওর, মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। রাত যত বাড়ে পণ্ডিতরা তত মেতে ওঠে, প্রচণ্ড তর্ক শুরু হয়, কেউ কারও কথা শুনতে রাজি নয়। চঞ্চল হয়ে ওঠে দেবল ভদ্র, স্বয়ং বুদ্ধমিত্রও। চন্দ্রলেখা চলে গেছে দরবার ছেড়ে। কাহ্নুপাদ বসে বসে হাই তোলে। বুদ্ধমিত্র দেবল ভদ্রকে কী যেন ইশারা করে উঠে চলে যায়। দেবল ভদ্রের মেজাজ অসহিষ্ণু হয়ে গেছে, উৎসবের পরবর্তী অংশের জন্যই সে এখন উন্মুখ। রাগ এসে পড়ে কাহ্নুপাদের ওপর। রুক্ষ মেজাজে খেঁকিয়ে ওঠে, 'এত রাত পর্যন্ত বসে আছিস কেন?'

'গীত পড়ব।'

'গীত?'

দেবল ভদ্রের চোখ কপালে ওঠে, ভীষণ বিস্ময়।

'কার লেখা গীত?'

'আমার।'

'তোর? তুই কী গীত লিখিস? তুই সংস্কৃতের কী জানিস?'

'সংস্কৃত জানব কেন? আমার ভাষায় লিখেছি।'

কাহ্নুপাদ চওড়া বুক টান করে দাঁড়ায়, কালো মিশমিশে পাথুরে গড়নের শরীরটা দ্বিধাহীন এবং ঋজু। ওর মনে হয় ওর কোনো ভয় নেই।

'ও ছুঁচোর কেত্তন?'

দেবল ভদ্রের কণ্ঠে ব্যঙ্গ।

'বেরো এখান থেকে, বেরো বলছি।'

দেবল ভদ্রের চোখে আগুন ছোটে।

কাহ্নুপাদ মরিয়া হয়ে বলে, 'রাজা আমাকে পড়বার অনুমতি দিয়েছেন।'

'রাজা কে? এই দেবল ভদ্র সব। এখানে রাজার অনুমতিতেও কোনো কাজ হয় না। ভাগ, যতসব ছোটোলোকের কারবার। লাই দিলে মাথায় ওঠে। আবার মুখে মুখে কথা বলা হচ্ছে। শুয়োরের বাচ্চা।'

দেবল ভদ্র কাহ্নুপাদের ঘাড় ধরে ধাক্কা দিয়ে বের করে দেয়। দ্বাররক্ষীরা বল্লম উঁচিয়ে তেড়ে আসে। কোনো কিছু বলার আগেই ও দেখতে পায় দ্বাররক্ষীর ধাক্কায় ও দরজার বাইরে এসে পড়েছে, রক্ষী দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। কাহ্নুপাদের মনে হয় আজ রাতের আঁধার খুব গাঢ়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সামনে কিছুই দেখা যায় না। ও হতভম্বের মতো একপাশে দাঁড়িয়ে থাকে। চলে যেতে হবে এটাও যেন বুঝতে পারছে না। ওর মনে হয় ওর পায়ের নিচে শিকড় গজিয়ে সেটা মাটিতে প্রোথিত হয়ে গেছে।

একটু পরে আবার দরজা খুলে যায়। পণ্ডিতরা একে একে বেরিয়ে আসছে। এখনও তারা ভীষণ উত্তেজিত, তর্কের শেষ নেই, চলতে চলতে কথা বলে। কাহ্নুপাদ একজন কবি, তার গাঁয়ের রং অন্ধকারে মিশে যায়, কেউই তাকে দেখতে পায় না। ও বোঝে উৎসবের প্রথম পর্ব শেষ। তখুনি তবলার বোলের সঙ্গে ঝংকৃত হয় নূপুরধ্বনি। নিভু নিভু ঘিয়ের প্রদীপে আবার নতুন সলতে পড়েছে, আলো উজ্জ্বল হচ্ছে। বুদ্ধমিত্র দরবারে আসে। কাহ্নুপাদ ধীর পায়ে বেরিয়ে আসে। চারদিক অন্ধকার। চাঁদের ক্ষীণ আলোতে পথঘাট চেনা যায় না। ওর কোথাও কোনো জ্বালা নেই, নিজেকে বেশ নির্ভার মনে হয়। কাহ্নুপাদ বুকভরে খোলা মাঠের টাটকা বাতাস গ্রহণ করে। হাঁটতে হাঁটতে নদীর ঘাটে আসে ও। ওর গলা ছেড়ে গান গাইতে ইচ্ছা করে। অনেকদিন আগে মা-র কণ্ঠে শোনা একটি গান বেসুরো গলায় গাইতে থাকে। ওর মনে হয় ওর কণ্ঠ পৌঁছে যাচ্ছে পাহাড়ে, নদীতে, লোকালয়ে। ওর দুঃখ ওর আর একার নয়। বরুয়া মাঝি নৌকার পাটাতনে চিতপাত শুয়ে আছে। কাহ্নুপাদকে দেখে লাফ দিয়ে উঠে কাছি খুলে দেয়। কাহ্নুপাদ সটান শুয়ে পড়ে। মনে হয় শরীরের প্রতিটি জোড়ায় অসহ্য ব্যথা, প্রতিটি অঙ্গ আলাদা হয়ে যেতে চায়। এতক্ষণে বুকটা কেমন ভার মনে হয়। সেমিজের ভেতর সারা দিনের পরিশ্রম, হাত দিতেই সমস্ত শরীর চনচনিয়ে ওঠে। তীক্ষ্ণ জ্বালা ছনের শূলার মতো মুখ উঁচিয়ে থাকে। নৌকা থেকে নামার সময় টের পায় বুনো রাগ ভেতরটা তাতিয়ে রেখেছে। নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হয়ে যাচ্ছে। মনে হয় পা যেন মাটি স্পর্শ করছে না, স্পর্শ করছে আগুন। সোজা রামক্রী আর দেবকীর দোকানের দিকে রওনা করে। শবরীর কথা ও ভোলে না, শুধু মনে করে শবরী নয়, অন্য কাউকে চাই, অন্য কিছু চাই। যেখানে কবিতা লেখার যন্ত্রণা নেই, যারা কবিতা লেখার জন্য হরিণের চামড়া বিছিয়ে দিয়ে খাগের কলম এগিয়ে দেয় না। দোকান বন্ধ হয়ে যেতে পারে এই ভাবনায় আক্রান্ত হয়ে ও প্রায় একরকম ছুটতে ছুটতে আসে। না, দোকান বন্ধ হয়নি। দরজার ওপরে সাংকেতিক চিহ্নটা এখনও টাঙানো আছে। কাহ্নুপাদ দরজা ঠেলে হুড়মুড়িয়ে ঘরে ঢোকে। দেবকী ঘড়ার মধ্যে মদ ঢালছিল, কাহ্নুপাদকে দেখে কাছে এসে দাঁড়ায়।

'কী ব্যাপার, এমন হুড়মুড়িয়ে ঢুকছ যে? মনে হচ্ছে খাওয়ার আগেই বেহুঁশ হয়ে এসেছ?'

'এখনও হইনি, হব বলে এসেছি।' কাহ্নুপাদ দেবকীর কাঁধে হাত রাখে। পাশের ঘরে রামক্রীর গলা শোনা যাচ্ছে, হয়তো ছেলের সঙ্গে কথা বলছে, হয়তো ছুটকির হাজারটা প্রশ্নের জবাব দিতে হচ্ছে। ও দেবকীর মুখের কাছে মুখ নিয়ে বলে, 'এখানে এলে বেহুঁশ না হয়ে কী উপায় আছে? তোমার মুখের দিকে চাইলে নেশা অর্ধেক হয়। আর হাতের মাল যে খায়—'

'বোসো, বোসো। কেবল আদিখ্যেতা, অত সয় না বাপু।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাহ্নুপাদ হো-হো করে হাসে। বলে, 'খুশি হওনি বলো তো? আসলে সবই সয় কেবল মুখে স্বীকার করতে চাও না। যাকগে, দ্যাখো ঘড়া আর নল দেবে কিন্তু, তোমার ওই বেলের খোলে আজ আর চলবে না।'

'আচ্ছা গো আচ্ছা, বুঝতে পারছি জিভ পর্যন্ত শুকনো করে এসেছ। তা কোথায় মরতে গিয়েছিলে? ডুবে আসতে পারোনি।'

দেবকীর মধুর বাক্যবাণে কাহ্নুপাদের বিছুটির জ্বালা কমে যায়। ও মিটিমিটি হাসে, হাসে দেবকীও। তারপর ঘরের কোণ থেকে নতুন ঘড়া আনে, নতুন নলও।

'সব যে নতুন দেখছি?'

'তোমাকে কি পুরোনো দেওয়া চলে? নাও গিলতে শুরু করো।'

কাহ্নুপাদ ওর হাত ধরে মৃদু আকর্ষণ করে।

'বোসো না একটু কাছে।'

'ধুত! তুমি একটা ইয়ে—'

দেবকী ঝট করে হাত ছাড়িয়ে নেয়। ওপাশের ঘর থেকে রামক্রী সাড়া দেয়।

'কে এসেছে দেবী? কানুদার গলা যেন?'

'হ্যাঁ গো সেই। বেলের খোলে হচ্ছে না তার, ঘড়া নিয়ে বসেছে।'

'ও বাবা, তা দাও, ভালো করে দাও, যেন আর উঠতে না পারে।'

'থাকবার জায়গা দিলে উঠব না কিন্তু রামক্রী। জানোই তো মানুষের স্বভাব, বসতে পেলে শুতে চায়।'

'ওদিকে বউদির কী হবে?'

'চুলোয় যাক।'

দেবকী তর্জনী তুলে শাসন করে, 'বলতে পারলে?'

'ও কিন্তু কানুদার মনের কথা নয় দেবী।'

দেবকী মুখ ঝামটা দেয়, 'মনের কথা না হলেও বলতে পারবে না।'

'এই নাকে খত দিলাম, আর বলব না।'

'কানুদাকে ভালো করে দিও দেবী। ওকে তো আর মাতাল করতে পারবে না তুমি।'

কাহ্নুপাদ উচ্চহাসিতে ঘর ভরিয়ে বলে, 'ঠিক বলেছ দাদা, গলা পর্যন্ত ভরলেও পা টলে না কিন্তু।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

‘সে কি আর আমি জানিনে। খাও, খাও, বেশি করে খাও।’

কাহ্নুপাদ রামক্রীর সঙ্গে আর কথা বলে না। কাঠের গুঁড়ির ওপর বসে হাতে তাল ঠোকে। চোখের ইশারায় দেবকীকে ডাকে, দেবকী মুখ ঘুরিয়ে নেয়। ওর পিঠের ওপর ঘন কালো চুল ছড়িয়ে আছে। লাল পেড়ে সাদা শাড়ি পরনে। এক পেঁচে শাড়িতে ওকে দারুণ লাগছে। ওর গলার জুঁই ফুলের মালা থেকে মৃদু গন্ধ আসছে। কাহ্নুপাদ চোখ বুঁজে গান গাইবার চেষ্টা করে।

এক জাতীয় গাছের সরু বাকল শুকিয়ে গুঁড়ো করে তা দিয়ে মদ চোলাই করে রামক্রী আর দেবকী। নারকেল, ভাত, তাল ও কাজঙ্গ গেঁজিয়েও মদ তৈরি করে এরা। এক একটার এক-একরকমের স্বাদ, এক-একরকম দাম। খদ্দের পছন্দমতো মদ খায়। সারি সারি চৌষট্টি ঘড়া সাজিয়ে রাখে ওরা। বড়ো বড়ো ঘড়া। চৌষট্টির বেশিও রাখে না, কমও না। ওদের বিশ্বাস চৌষট্টির কম-বেশি হলে ব্যাবসা ভালো চলে না। মদ বিতরণের দুটো পন্থা আছে ওদের। এক, ছোটো ছোটো ঘড়া আর নল। দুই, সমান আকারের বেলের খোল। এর বাইরে অন্যকিছুতে ওরা খদ্দেরকে মদ দেয় না। প্রকাশ্যে মদ বিক্রি করে, এর বিরুদ্ধে দেশের কোনো আইন নেই। রাতের বেলা সব ঘড়া ভরে রাখে দেবকী। দিনের বেলা কোনোদিন একদম সময় পায় না। কোনোদিন আবার ফাঁকাই যায় দোকান। দোকানের পেছনে ওদের ঘর, সেখানে রান্নার অবসরে খদ্দেরের পদশব্দের জন্য উন্মুখ থাকে দেবকী। খদ্দের লক্ষ্মী, ফিরে গেলে অকল্যাণ হয়, ব্যাবসায় ক্ষতি। ঘড়াগুলো আবার ভরতি করে ঠিকঠাক মতো সাজিয়ে আঁচলে হাত মুছতে মুছতে কাহ্নুপাদের সামনে এসে দাঁড়ায় দেবকী।

‘কী গো আর পারবে?’

‘পারব তো অনেক কিছু, কিন্তু চাইলে তো দেবে না তুমি।’

‘বেশি ঢং দেখিয়ো না। হেঁয়ালি রাখো।’

‘আর এক ঘড়া দাও বউদি। এই অমৃত রেখে ওঠার কোনো ইচ্ছে নেই।’

কাহ্নুপাদের মাথার মধ্যে দরবারের উৎসব শুরু হয়, অসংখ্য নূপুরের ধ্বনি শুনতে পাচ্ছে ও। প্রদীপের মৃদু আলোয় পুরো ঘরে আলো-আঁধারি। দেবকীকে চন্দ্রলেখার মতো মনে হয়, ও যেন পেখম মেলে বসে আছে। ওর সাদা শাড়ি থেকে ঠিকরে বেরুচ্ছে ঘিয়ের প্রদীপের দ্যুতি, শাড়ির লাল পাড় হিরের অলংকার হয়ে বেষ্টন করে আছে দেবকীর অঙ্গ। একটু পর দেবকী পাশের ঘরে চলে গেলে নেমে আসে অন্ধকার। মদ খাওয়ার পরও জ্বালা জুড়োয় না কাহ্নুপাদের। ও ক্ষিপ্ত হয়, ভাবে, এই দহন ওর প্রয়োজন, হয়তো এই দহন থেকেই বড়ো কিছু রচনা হবে। এ অপমান ওকে শক্তি দেবে, উদ্বুদ্ধ করবে। আর এক ঘড়া মদ খাওয়ার পরও ওর পা টলে না, মাথায় একটা চাপ কেবল। ধুত, নেশা হয় না কেন? জমজমাট নেশা। মদটা ওর বোধহয় ঠিকমতো বানাতে পারেনি। তবু যাহোক রামক্রী আর দেবকী আছে বলেই রক্ষা, নইলে গোটা পল্লি খরার মাঠঘাটের মতো বুক উদোম করে রাখত, সেই ফুটোয় সেঁধিয়ে যেত কাহ্নুপাদের মতো অনেকের সাধ-আহ্লাদ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাহ্নুপাদের মনে হয় দেবকী নিজেই চিকন-বাকলের চোলাই করা মদ। ওর ছিপছিপে শরীরের বাঁকে বাঁকে নেশা জমে থাকে, দেখলে তৃষ্ণা কণ্ঠে এসে আটকে যায়।

ওকে হাঁ-করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে হেসে ওঠে দেবকী, 'অমন ঝিম মেরে দাঁড়িয়ে আছ যে?'

'তোমার মদে নেশা হয় না কেন দেবকী?'

'শুধু তোমার হয় না, আর সবার হয়।'

'আমার জন্য একটু আলাদা বানাও না? পারবে?'

'না বাপু ক্ষমা করো। আলাদা মদ আমি বানাতে জানি না।'

'জানো কেবল ইয়ে—'

কাহ্নুপাদ মুখ-খিস্তি করে, পকেট হাতড়ে কড়ি খোঁজে, কড়ি নেই। তারপর ঈষৎ হেসে বলে, 'বাকির খাতায় লিখে রাখো, সুদে আসলে একসঙ্গে দেব।'

'তোমার বেলায় সব সই।'

'তাই নাকি?'

কাহ্নুপাদের চোখের পাতা নেচে ওঠে। দেবকি খিলখিলিয়ে হাসে। হাসি শুনে পাশের ঘর থেকে আসে রামক্রী, 'কী হল কানুদা?'

'তোমার কানুদাকে বাকির খাতায় রাখছি।'

'ভয় নেই তোমার, সব আমি একসঙ্গে শোধ দেব রামক্রী।'

'ভুলো না আবার।'

'ভুলতে চাইলে কি তোমরা ভুলতে দেবে!'

রামক্রীও খোঁচা দেয়, 'কড়ির কথা ভোলা কি সহজ? না কি ভুললে ব্যাবসা চলে?'

কাহ্নুপাদ নিঃশব্দে বেরিয়ে আসে। দরজার উপর থেকে সাংকেতিক চিহ্ন সরিয়ে নেয় দেবকী। কাহ্নুপাদ শেষ খদ্দের। রাত অনেক হয়েছে, আর কাউকে ঢুকতে দেওয়া হবে না। কাহ্নুপাদ ঘাড় ফেরাতেই দেবকী দরজা বন্ধ করে দেয়।

ফুরফুরে বাতাস গায়ে এসে সুড়সুড়ি দেয়, যেন এতক্ষণ কাহ্নুপাদের অপেক্ষায় ছিল, দেখতে পেয়ে দৌড়ে এসেছে। এ আরামটুকু উপভোগ করে হাঁটতে মন্দ লাগে না ওর। এতক্ষণে নিজেকে কিছুটা নির্ভার মনে হচ্ছে। দেশাখের বাড়ির পেছনের ছোটো টিলাটার বাঁক ঘুরতেই চাপা হাসি কানে আসে কাহ্নুপাদের। ও কান খাড়া করে, কে হতে পারে? ও দু-পা এগোয়, দেখে গাছগাছালির ফাঁক দিয়ে চাঁদের আলোর একটুখানি অংশ পড়েছে ওদের ওপর, ঘাসের ওপর কাত হয়ে শুয়ে কথা বলছে, চিনতে পারে কাহ্নুপাদ। এত বড়ো ঘন কালো চুল এ তল্লাটে আর কারও নেই, এলো খোঁপা ভেঙে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লুটিয়ে আছে পিঠের ওপর, চাঁদের আলোয় চিকচিক করছে। কাহ্নুপাদ দেখেই চিনতে পারে, সুলেখা আর সুদাম। ও পিছিয়ে আসে। মনে পড়ে অনেকদিন আগে ভুসুকু বাণিজ্যে গিয়ে আর ফেরেনি, কোনো খোঁজও নেই। কেউ জানে না বেঁচে আছে কি না, কোনোদিন ফিরবে কি না। এমন করে মাঝে মাঝে কেউ পল্লি থেকে উধাও হয়ে যায়, সারাজীবনে আর ফিরে আসে না। হয়তো জলদস্যুদের হাতে পড়ে, ওদের সঙ্গে বাড়াবাড়ি করলে ওরা মাঝনদীতে ছুঁড়ে মারে। নয়তো কোনো বিপদে নিহত হয়, কিংবা রাজার লোক বিনা কারণে বন্দি করে নিয়ে যায়, গুদাম ঘরে আটকে থেকে শুকিয়ে মরে যায়, একদিন সকালে কেউ হয়তো কঙ্কালটা বের করে ফেলে দেয়। কাহ্নুপাদের বুক ভেঙে শ্বাস পড়ে, ভুসুকুর কি তেমন কিছু হল? সেজন্যই সুলেখা জুড়ি বেছে নিয়েছে। সুদাম নিরীহ লোক, চমৎকার ধান রোপণ করতে পারে, তাই মৌসুমে ওর দারুণ কদর। কাহ্নুপাদ আবার হাঁটতে থাকে, গুনগুনিয়ে গান গায়, শিস বাজায়। চারদিক নীরব নিঝুম, নদী থেকে শব্দ আসছে। চাঁচর বেড়ার বাড়িগুলোতে আলো নেই, ভুতুড়ে অন্ধকারে ওগুলো টুকরো টুকরো, অথচ সব মিলিয়ে একটা চমৎকার ধারাবাহিকতা আছে, যা জীবনের উত্থান-পতন, চলাচল, বয়ে যাওয়া। আজ কিছুতেই নিজের বাড়ির পথ চিনতে পারে না কাহ্নুপাদ, বেমালুম ভুলে যায়। এই ভুলে যাওয়া ইচ্ছাকৃত, একটুক্ষণের জন্য গৎবাঁধা জীবনের বাইরে খোলা হাওয়ায় যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা।

আপনমনে চলতে চলতে এক সময় চমক ভাঙে ওর। ডোম্বির বাড়ির কাছাকাছি এসে গেছে, আর তিনটে বাড়ি পেরুলেই হল, এরপর আর কোনো বাড়ি নেই। বিস্তির্ণ পতিত জমি, বাবলা কাঁটা বুকে নিয়ে শুয়ে আছে। যখন-তখন ছেলেমেয়েরা দল বেঁধে বৈঁচি কুড়োতে আসে। রাখাল ছেলে গোরু ছেড়ে দিয়ে সামান্য উঁচু গাছের নীচে ঘুমোয়। অনেকদিন বিকেলবেলা কাহ্নুপাদ এই মাঠে দাঁড়িয়ে সুর্যাস্ত দেখেছে। লাল হয়ে ওঠা আকাশটায় ডিমের কুসুমের মতো গোল হয়ে ওঠে সূর্য, তার পর টুপ করে চলে যায় আড়ালে। ও বুকের কাছে হাত জোড়া করে দাঁড়িয়ে থাকে, এই দৃশ্য দেখার আনন্দ একদম ওর নিজস্ব। এই মুহূর্তে পিপুল গাছের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়ায় ও। নিজেকে প্রশ্ন করে, আজ আমি ঘরে ফিরছি না কেন? উত্তর আসে, সবসময় ঘর ভালো লাগে না। জীবনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ঘরে নয়, বাইরে নিতে হয়, হাজার মানুষকে সাথি করে নিতে হয়। তাহলে কী করবে? রাজসভা থেকে যে যন্ত্রণা নিয়ে ফিরেছি তার দায়ভার এই লোকালয়েরও। আমি উপলক্ষ্য মাত্র, কিন্তু বহন করতে হবে সবাইকে। আমার মুখের ভাষার অবমাননা আমাদের সবার। আমার উচিত সবাইকে ডেকে ডেকে এ কথা বলা। এই পিপুল গাছ তুই সাক্ষী, বল তুই আমার পক্ষে। মল্লারী তুমি সাক্ষী, নিশিন্দা তুমিও। ওই নদীটাও, ধনাদার গোরুও, দেশাখ তোর তিরধনুকও। কাহ্নুপাদ শব্দ করে হাসে, যেন শবরী বলছে—খুব হয়েছে, এবার থামো, আমরা সবাই তোমার সঙ্গে আছি। পিপুল গাছের ওপর একটা শামকুকড়া ডাকে। কাহ্নুপাদ জানে মল্লারী একা থাকে। রামলালের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে বছর দুই আগে। রামলাল দক্ষিণপাড়ায় ঘর বেঁধেছে নতুন করে, বউর নাম মঙ্গলি, শ্যামলা কিশোরী, রামলালের সঙ্গে বয়সের অনেক তফাত। মুখে রা-টি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নেই, কেবল ডাগর চোখ মেলে তাকিয়ে থাকে। মল্লারী আর ঘর বাঁধেনি, বলে একা থাকতেই সুখ। সারাক্ষণ ভালোবাসাহীন পুরুষমানুষের মন জোগানো ওর ধাতে সয় না। নৌকা বেয়ে রোজগার করে, নাচে, গান করে। রাতের অন্ধকারে লোক আসে ওর ঘরে, কড়ি দিয়ে কিনে নিয়ে যায় এক রাত্রির সুখ, তাতে মল্লারীর মুখে হাসি ফোটে না কিন্তু পেটে ফোটে জুঁই ফুলের মতো সাদা ভাত-ফুল। ও খুব পষ্টাপষ্টি কথার মেয়ে, বোঝে পেটে না সইলে কোথাও সয় না, তুড়ি দিয়ে উড়িয়ে দেয় মনকেমন-করা যন্ত্রণা। গোটা পল্লিতে ওর মতো প্রাণবন্ত মেয়ে আর একটিও নেই, উপরন্তু সুন্দরী, সুগঠিত, কালো পাথরে আলো ছিটকে পড়ে। এমন চমৎকার দেহের বাঁধুনি কমই দেখা যায়। ও কারও পরোয়া করে না, কাউকে ভয় পায় না, একটা নিষেধ-ভাঙা সাহস আছে ওর মধ্যে। অথচ যখন ভালোবাসে, প্রাণের সমস্ত আবেগ দিয়ে ভালোবাসে, বেঁচে থাকার জন্য নিজেই মনের মধ্যে সাহস জমিয়ে রেখেছে। চাঁচর বেড়ার বাড়ি তুলেছে, কার্পাস লাগিয়েছে, ময়ূর পোষে, হরিণের মাংস খায়, চোত-বোশেখে পোলো দিয়ে মাছ ধরে, উঠোনে লাউ-কুমড়োর মাচা আছে। রামলাল ওকে আঘাত দিয়েছে, অপমান করেছে, কিন্তু সেটাকেই জীবনের শেষ বলে মেনে নেয়নি ও। রামলালকে ছাড়াও জীবনকে ভাবতে পারে। এখন রামলালকে ও উপেক্ষা করে। কাহ্নুপাদের সঙ্গে মাঝে মাঝে তর্ক হয় রামলাল প্রসঙ্গে। কাহ্নুপাদ যখন বলে, 'রামলাল তোমার সব কেড়েকুড়ে নিয়ে গেছে' তখন ও প্রবল প্রতিবাদে মাথা ঝাঁকায়, 'মিথ্যে কথা। চোর আর কতটুকু নিতে পারে বলো যদি আমি নিজ থেকে সব দান না করি।'

কাহ্নুপাদ অবাক হয়ে তাকায়, ভারি শক্ত মেয়ে, পরাজয়কে কখনো স্বীকার করবে না। কাহ্নুপাদ হেসে বলে, 'ভাঙবে তবু মচকাবে না।'

ও জোর প্রতিবাদ করে, 'মোটেই তা নয়, আমি মচকাইও না। যে মনটা তুমি দেখতে পাও না সেটা যে কীসের আমিও জানি না। কোনো কিছুতেই গলে না, আগুনেও না।'

বড়ো সাহসের কথা।

মল্লারী তরঙ্গ তুলে হাসে। ওর আত্মবিশ্বাস কাহ্নুপাদকে অভিভূত করে। আর এসব গুণের জন্যই আকৃষ্ট হয়। বোঝে যে এ প্রাণশক্তির অপচয় হতে দেয়া যায় না। এক সময় মল্লারীর খুব কাছে গিয়ে নীচু স্বরে বলে, 'তোমার মন কি ভালোবাসায়ও গলে না?'

'গলে কি না পরীক্ষা করে দেখিনি।'

কাহ্নুপাদ মুহূর্তে হাঁটু গেঁড়ে সামনে বসে যায়, 'ঠিক আছে পরীক্ষা প্রার্থনীয়।'

'হয়েছে, হয়েছে, ওঠো।'

মল্লারীর শরীরের বাঁকে বাঁকে হাসি তরঙ্গ তোলে। কাহ্নুপাদের চোখের সামনে মাঠ-নদী-আকাশ একাকার হয়ে যায়।

মল্লারীর কথা যখন ভাবে তখন তার মধ্যে আত্মস্থ হয়ে যায় কাহ্নুপাদ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেবকীর মদে যে নেশা জন্মাতে পারে না, মল্লারীর চিন্তা তা পারে, একদম অন্য ভুবনে নিয়ে যায়। এমন মানুষই তো চায় যার সৌন্দর্যের সঙ্গে মেশে মানসিক শক্তি। নয়তো সৌন্দর্য না থাক, যদি থাকে মনের গভীরতা, যদি বুঝতে পারে এবং বোঝাতে পারে। রাখিবন্ধন না হোক যদি সে পাশে থাকে এইটুকুও তো লাভ। পিপুল গাছের ডালে বাতাসের সরসর। আর দুটো ঘর পেরুবে কি না তা ভাবতে থাকে কাহ্নুপাদ। তখনই নিঃশব্দে এগিয়ে আসে ও, শব্দ করে হাসে।

'এখানে এসে দাঁড়িয়ে আছ যে?'

'মল্লারী?'

'না, অন্ধকারের পেতনি নই, মল্লারীই। ঘরের বাইরে বসেছিলাম, দেখলাম গাছের গোড়ায় দাঁড়িয়ে আছ। প্রথমে ভেবেছিলাম অন্য কেউ, কিন্তু খুব ঠাহর করে দেখার পর বুঝলাম তুমিই।'

'ঘরের বাইরে বসে রয়েছ কেন? ভয় নেই?'

আবার খিলখিল হাসি দিগবিদিগ ছুটে যায়। চাঁচর বেড়ার বাড়ি তা আটকাতে পারে না।

'আমার কী আছে যে ভয় পাব?'

'আর কিছু না হোক, অন্ধকারে সবাই তো ভূতের ভয় পায়।'

উত্তরের বদলে হাসি, হাসি আর থামতে চায় না।

'তা এখানে দাঁড়িয়ে থাকবে না ঘরে যাবে?'

'এই তো বেশ, কার্পাস গাছগুলো হাওয়ায় কেমন দুলছে দ্যাখো?'

'ও তুমি দ্যাখো। ওসব তোমার জন্য। আমি কি গীত লিখি?'

'মল্লারী?' কাহ্নুপাদের কণ্ঠে চাপা আর্তনাদ!

'কী হয়েছে কানু?'

'মল্লারী, দেবল ভদ্র আজ আমাকে ভীষণ অপমান করেছে।'

'কেন? গীত পড়োনি?' মল্লারীর দু-চোখের পাতায় ঝিলিক।

'আমি ছোটোলোক, মুখের ভাষায় গীত লিখি, সব ছুঁচোর কেত্তন। দেবল ভদ্র আমাকে দরবার থেকে বের করে দিয়েছে।'

'তুমি কী করলে?' মল্লারীর কণ্ঠে চাপা ক্রোধ।

'কিছু করিনি।'

মল্লারী তেড়ে ওঠে, 'কিছু করলে না? মাথা ফাটিয়ে দিতে পারলে না?'

'তাহলে কি আমাকে আস্ত রাখত?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

‘না রাখলে মরতে, আমরা সবাই জানতাম তুমি মুখের ভাষার জন্য মরেছ। কুকুরের মতো লেজ গুটিয়ে পালিয়ে যদি আসবে তবে গেলে কেন ওখানে?’

‘মল্লারী?’

মল্লারী সমান তোড়ে বলে, ‘পারো কেবল অবাক হতে, আমি যা বলি মনের কথা বলি, একটুও ফাঁকি নেই। মরলে কী হয় কানু? যাকে তুমি প্রাণের চেয়ে বেশি ভালোবাসো তার জন্য মরতে পারো না?’

কাহ্নুপাদের বুকের গভীর থেকে শব্দটা উঠে আসে প্রতিজ্ঞার মতো। বলে, ‘পারি, আমি পারি মল্লারী।’

‘জানি তুমি পারো, তোমার জীবনের বিনিময়ে হলেও তোমাকে পারতে হবে।’

‘এই তোমার মাথা ছুঁয়ে শক্তি নিলাম।’ মল্লারী কাহ্নুপাদের ঘাড়ে হাত রেখে বলে, ‘তোমাকে যে অপমান করেছে তার প্রতিশোধ আমি নেব। কিছুতেই ছেড়ে দেব না।’

‘আহ্ মল্লারী’, কাহ্নুপাদ ওকে বুকের মধ্যে টেনে নেয়। পিপুল গাছের হাজার পাতা নড়ে ওঠে। বাতাস মল্লারীর প্রতিজ্ঞা নিয়ে ছুটে যায়, ছড়িয়ে যায় লোকালয়ে, সব মানুষের ঘুমন্ত চেতনায় প্রোথিত হয় প্রতিশোধের প্রতিজ্ঞা।

কাহ্নুপাদ ওর ঘাড়ে মুখ রেখে বলে, ‘মাঝে মাঝে তোমাকে আমার ভয় লাগে মল্লারী।’

‘কেন?’

‘তোমার শক্তি আছে, সাহস আছে, ভয় নেই। তাই মনে হয় কখনো তুমি বুঝি ভীষণ—’

‘বলো না? থামলে কেন?’

‘না, থাক। সব কথা বলা ঠিক নয়।’

খিলখিল করে হেসে ওঠে ও। বলে, ‘অর্ধেক কথা পেটে, অর্ধেক কথা মুখে। এ না হলে কি কেউ আর গীত লিখতে পারে?’

‘বেশ বলেছ।’

দু-জনেই হাসে। কার্পাস ফুলগুলো মুখ উঁচিয়ে আছে আকাশের দিকে। মাঝে মাঝে দূরের বন থেকে বাঘের গর্জন ভেসে আসে। দু-জনের সঘন নিশ্বাসের মতো মহুয়ার গন্ধ তীব্র হয়ে ওঠে।

‘মল্লারী।’

‘কী?’

‘ঘুমুবে না?’

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

‘তুমি না এলে ঘুমুতাম, এখন ঘুমুব না।’

‘চলো তাহলে নৌকা করে নদীতে বেড়াই।’

‘এখন?’

‘রাত আর বেশি নেই, সময়টা ভালো। এই সময়টা আমার খুবই প্রিয়। কতদিন এই সময়ে নদীর পাড় ধরে হেঁটে গেছি অনেকদূর।’

কাহ্নুপাদ মল্লারীর হাত নিজের মুঠিতে নেয়। দু-জনে হাঁটতে হাঁটতে নদীর ঘাটে আসে। নদীর বুকে ঝিরঝিরে বাতাস। লাফিয়ে নৌকায় ওঠে ওরা, কাছি খুলে দেয় মল্লারী। নিস্তব্ধ নদী হালকা অন্ধকারে মিশে একাকার হয়ে আছে, যেন নদীটা দিগন্ত পর্যন্ত পৌঁছে গেছে, কোনো কূল নেই। আজ নৌকা বাইতে একদম নতুন লাগে মল্লারীর, প্রথম দিনের বইঠা হাতে নেওয়ার মতো নিষিদ্ধ আনন্দ। আজ শুধু বেড়ানো, পারাপার করা নয়, কড়ি চাওয়া নয়। পাটাতনে চিতপাত শুয়ে থাকে কাহ্নুপাদ। মল্লারীর সুডৌল হাতের সঙ্গে কথা বলে বইঠা, সে উচ্ছ্বাস নদীর জলের ছপছপ শব্দ। ওই শব্দ কাহ্নুপাদকে বিষণ্ণ করে দেয়। ও ভাবে দু-পাশে নদীর তীরে, আবাদ জমি, বনবনানী, সব কিছুর মধ্যে পৃথিবীটা যেন একটা নদী। নদীর ঢেউয়ের মতো দিনরাত এখানে সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, জীবন-মৃত্যু উঠছে আর মিলিয়ে যাচ্ছে, তাই পৃথিবীরূপী এই নদী গহন, গম্ভীর এবং ভয়ংকর। নিজের ঠাঁই টিকিয়ে রাখার জন্য সারাক্ষণ ব্যস্ত থাকতে হয়। এই নদী পার হওয়া কঠিন। এই দার্শনিক ভাবনা মাথায় করে একটা কবিতার পংক্তি কাহ্নুপাদের মগজে আসি আসি করেও আসে না, বারবার ছুটে যায়। তখন ও মল্লারীকে দেখে, মনে হয় নদীর মেয়ে মল্লারী, নদীতে ওর জন্ম। ওর মা নৌকা করে বাপের বাড়ি যাবার সময় মাঝনদীর বুকে ও হয়ে যায়। কে জানে মরণও হয়তো এখানে আছে, মল্লারী তাই চায়ও। বলে, ‘ডুবে মরলে বেশ হয়। ভেসে যেন না উঠি, শেষ ঘুমটা এক্কেবারে নদীর তলে গিয়ে ঘুমুব, মাছেরা খেলা করবে চারপাশে, শ্যাওলা জমবে পায়ের পাতায়, হাতের মুঠোয় থাকবে রুপোলি বালি, কপালে কাদামাটির টিপ, চোখে জলের কাজল।’

কাহ্নুপাদ অবাক হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে বলেছিল, ‘তুমিও কবি মল্লারী। এমন সুন্দর ছবি আঁকতে পারো।’

ও হেসে বলেছিল, ‘মরলে পুড়িয়ো না, দেহটা নদীতে ভাসিয়ে দিয়ো।’

বর্তমানে নদীর মতো জীবন ওর, তবে সে নদীতে চড়া পড়েনি। সুখ-দুঃখের স্রোতের প্রবাহে ও সে নদীকে উত্তালমুখর করে রেখেছে, গভীর খাদে বয় তার জীবনের প্রবল স্রোত, চড়া পড়ার সম্ভবনা নেই। নিজেকে জিইয়ে রাখার শক্তি ওর আছে।

কাহ্নুপাদ মল্লারীর কাছে গিয়ে বসে, ও হাসে। বলে, ‘ডুবে গেলে আমার দোষ নেই।’

‘যাক ডুবে, এসো দু-জনে সহমরণে যাই। তোমার সঙ্গে মরার খুব সাধ আমার।’

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

‘ঠিক বলছ কানু?’

‘একটুও মিথ্যে নয়।’

খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে মল্লারী। মাঝে মাঝে ওর এই হাসি কেমন তীব্র তীক্ষ্ণ হয়ে যায়। অন্ধকার নদীর গম্ভীর রূপ ওই হাসির সঙ্গে বেমানান।

নৌকা অনেকদূর এসে গেছে, প্রতিদিনের পরিচিত লোকালয় অনেক পেছনে। গাঢ় অন্ধকার ফিকে হয়ে আসছে, মাঠে শস্য নেই, উদোম মাঠে গভীর শূন্যতা। কাহ্নুপাদ আরামে চোখ বোজে।

‘একটা গান গাও মল্লারী।’

‘গান? কোনটা?’

‘যে গানটা প্রথম শিখেছিলে।’

মল্লারী গুনগুনিয়ে শুরু করে,

এবংকার দৃঢ় বাখোড় মোড়িঅ
বিবিহ বিঅপক বান্ধণ তোড়িঅ
কাহ্নু বিলসই আসবমাতা
সহজ নলিনীবন পসি নিবিতা।

কাহ্নুপাদ একমনে গান শোনে, নিজের লেখা পংক্তিগুলো মল্লারীর কণ্ঠে আশ্চর্য বদলে যায়। ও যেন আর এক স্রষ্টা, নতুন করে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেছে। কয়েকটা পংক্তি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অনেকক্ষণ ধরে গায় ও, যেন ছাড়তে ইচ্ছে করে না, যেভাবে হোক প্রাণের কাছে কেবল ধরে রাখা। কাহ্নুপাদের মনে হয় মাত্র কয়েকটা পংক্তি অথচ কী তার ক্ষমতা, সমস্ত পরিবেশ বদলে দিয়েছে। দু-কূলের আছড়ে পড়া নদীর জল সে সুরের রেশে যেন মাথা কুটে মরছে। বড়ো একটা মাছ নৌকার কাছাকাছি ঘাঁই মেরে গেল। অনেকদূরে কালো পিঠ উঁচিয়ে ভাসছে শুশুক। মল্লারী গাইতে গাইতে তন্ময় হয়ে গেছে, চোখে জল। কাহ্নুপাদের মন উদাস হয়ে যায়, বুক হাঁ-হাঁ করে। চারদিকে সবাই আছে অথচ কেউ নেই, সঙ্গীর অভাব ওকে এক ভয়াবহ নিঃসঙ্গতায় বন্দি করে রাখে, ও নিজের হাতে তৈরি বেড়িতে আটকা পড়েছে। পালিয়ে আসার জন্য ছটফট করে, হঠাৎ করে ওর মনে হয় এখানে আর ভালো লাগছে না, অন্য কোথাও যাবার সাধ এখন। এই নদী ওকে আর সঙ্গ দিতে পারে না। এই নৌকা, দাঁড়, এর চালক কেউ আর ওর জন্য যথেষ্ট নয়। কাহ্নুপাদের মন অন্যকিছু পাওয়ার জন্য খাঁ-খাঁ করে। ঠিক সেই মুহূর্তে নৌকা দুলে ওঠে, গান থেমে যায় মল্লারীর, নিজেকে সামলে নেয়, চোখের জল মোছে।

‘এজন্য আমি নৌকায় গাইতে চাই না।’

কাহ্নুপাদ কথা বলে না, দূরের দিকে তাকিয়ে থাকে। ও জানে দূরটাই ও কাছে আপন, যত কাছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যাবে ততই সে জায়গা অপ্রিয় হয়ে উঠবে। তারপর আবার একসময়ে ফিরে আসবে নিজের বলয়ে, সে বৃত্ত তখন অত্যন্ত প্রিয় হয়ে উঠবে। এই দলছুট মনোভাব ওকে স্বস্তি দেয় না।

'অনেক দূরে এসে পড়েছি কানু?'

কাহ্নুপাদ ওর দিকে না তাকিয়ে বলে, 'চলো ফিরে যাই।'

'ফিরতে আমার মন চায় না।'

'এখন আমার অন্য কিছু ভালো লাগছে না মল্লারী।'

'কেন?'

'জানি না, আমার মাঝে মাঝে এমন হয়।'

'ও।'

মল্লারী নৌকা ঘোরায়। এতক্ষণের সমস্ত আনন্দ কর্পূরের মতো উবে যায়। ম্লান ছায়া ভাসে দৃষ্টিতে। কাহ্নুপাদ সেটা লক্ষ করে না। মল্লারীর হাত ধরে বলে, 'বইঠা আমাকে দাও, আমি বাইব।'

'তা হলেই হয়েছে, ঘরে আর ফিরতে হবে না।'

'দিয়েই দ্যাখো না।'

'না থাক তুমি বসো। বাইতে আমার কষ্ট নেই।'

'পারব, দাও।'

'এত সহজে সব কিছু হলে তো সবাই সব কাজ পারত। তাহলে এক-একজনে এক-একটা করে কেন?'

'বড়ো শক্ত কথা, ঠিক আছে হার মানলাম।'

মল্লারীর গম্ভীর মুখের দিকে তাকিয়ে কাহ্নুপাদ আর বেশি কথা বলতে সাহস পায় না। আসলে সুরটা ও নিজেই কেটে দিয়েছে, সেটাকে আর কিছুতেই ফিরিয়ে আনা যায় না, যতক্ষণ না যন্ত্রটা আপনাআপনি বাজে। তবে ভরসা এই যে, মল্লারী বেশিক্ষণ চুপচাপ থাকে না, অল্প সময়ে আবার নিজের মধ্যে টুং করে ঘা দেয়, তারপর চমৎকার বেজে ওঠে। কাহ্নুপাদ নৌকার অপর দিকে গিয়ে বসে। আঁধার কেটে গেছে, নরম আলো ছড়িয়ে আছে উদোম মাঠে, দূরের টিলা পুরো দেখা যায় না, বনমোরগের ডাক ভেসে আসছে। কর্দমাক্ত দু-তীরে আছড়ে পড়ে জল, কেঁপে যায় তীরভূমি, যেন অনাদিকালের স্পর্শ শিহরণ তোলে। কাহ্নুপাদ হাঁটুতে মুখ গুঁজে বসে আছে, কখনো মল্লারীর দিকে তাকায়, চোখাচোখি হয়, আবার দৃষ্টি ঘুরে যায়, যেন অনেক আগে দু-জনের গভীর জানাশুনো ছিল, এখন কেউ আর কাউকে চিনতে পারছে না, প্রাণপণে চেনার চেষ্টা করছে, চিনতে গিয়ে বুকের বোঁটা ছিঁড়ে রক্ত ঝরছে টুপটাপ। কাহ্নুপাদ নিশ্বাস ফেলে ভাবল, এটাই হয়তো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জগতের নিয়ম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খেয়াঘাট, অরণ্য, হাঁট প্রভৃতি স্থান থেকে কর আদায় করে রাজার লোকেরা। এ সব কিছুর ওপর রাজার একচেটিয়ে অধিকার এবং এটা রাজকোষের একটা নিয়মিত আয়ের উৎস। প্রতি বৎসর বিভিন্ন স্থানের কর বাবদ একটা মোটা অংশ রাজকোষে জমা হয়। সুতরাং যে উপায়েই হোক কর আদায় করতেই হয়। মাঝে মাঝে রাজার লোকেরা অন্ত্যজ শ্রেণির লোকের সঙ্গে নির্মম আচরণ করে। দু-তিন বছর কর বাকি ফেললে অথবা অন্য কোনো সামান্য অপরাধেও দশরকমের শাস্তির একটি ভোগ করতে হয়। আর এই দশরকমের শাস্তি আইন করে শুধুমাত্র ওদের জন্য তৈরি করা হয়েছে। কখন যে কার ভাগ্যে পড়বে কেউ জানে না। অনেক সময় বুঝতেও পারে না কী অপরাধে কী শাস্তি হল, দেখা গেল একদিন রাজার লোক এসে ধরে নিয়ে গেল, প্রাপ্য হয়েছে নয় নম্বর শাস্তি, অর্থাৎ তিন দিন উপোস দিয়ে ঘরের মধ্যে বন্দি করে রাখা হল, কারণ জানার উপায় নেই। অনেকদিন পরে হয়তো কোনো ব্রাহ্মণের সঙ্গে দেখা হলে বলল, 'কী রে কেমন ঠুকে দিয়েছিলাম সেবার। বেটা আমার পাশ দিয়ে হাঁটিস? তোর ছায়া আমার গায়ে পড়লে পাপ হয় না?' তখন হাঁ-করে তাকিয়ে থাকা ছাড়া আর কিছু করণীয় থাকে না। এই ভেবে মনে মনে আশ্বস্ত হয় যে তবু তো নয় নম্বর শাস্তি, এক দুই তিন হলে রক্ষা ছিল না। একবার উৎপন্ন ধানের ষষ্ঠ ভাগ রাজার গোলায় দিতে চায়নি বলে সুদামকে দু-নম্বর শাস্তি অর্থাৎ চর্ম-পাদুকার প্রহার করা হয়েছিল। তিনদিন কোনো হুঁশ ছিল না ওর, গাছ-গাছড়ার ওষুধে দীর্ঘকাল পর সুস্থ হয়েছিল সুদাম। সেই থেকে বেচারার স্বাস্থ্য যে ভেঙে গেল আর ঠিক হল না। গাঁয়ের লোককে প্রায়ই আশঙ্কায় থাকতে হয়, কোন অপরাধে কখন শাস্তি হবে কেউ টের করতে পারবে না।

যারা সারাক্ষণ বিভিন্ন কর আদায়ের জন্যে আনাগোনা করে দেশাখ বেশ রসিয়ে এক একজনের এক একটা নামকরণ করেছে। খেয়াঘাটের কর যে আদায় করে তাকে ডাকে তারক, হাটবাজারের কর্মচারীর নাম হট্টপতি, অরণ্যের কর যে আদায় করে তাকে ডাকে অরণী। আস্তে আস্তে গাঁয়ের লোক তাদের আসল নাম ভুলে যায়। দেশাখের দেয়া নামগুলো চালু হয়ে গেছে, লোকমুখে তার বাধাহীন প্রতিষ্ঠাও রয়েছে। যাদের ওপর এসব নাম আরোপিত হয়েছে তারা প্রথমদিকে রাগারাগি করলেও এখন সে নাম মেনে নিয়েছে। শুধু মেনে নেয়া নয়, এ নামে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। খেয়াঘাটের কর আদায়কারী বলাই শর্মাকে ডোম্বি ডাকে তরপতি। ক-দিন থেকে তরপতি ওর পিছনে লেগেছে করের জন্য। ডোম্বি জানে ওর চটুল হাসির মোহিনী ভঙ্গির জন্য যথেষ্ট দুর্বলতা আছে বলাই শর্মার। এ সুযোগ ছাড়ে না ও। আজ নয় কাল, কাল নয় পরশু এমনি করে ঘোরাতে আমোদ লাগে। কখনো চোখ নাচিয়ে বলে, 'আপনার কড়ি আমার কাছে এলেই এ কর শোধ হবে, নইলে শোধ দেব কী দিয়ে?' ডোম্বির চোখের নাচুনিতে বিগলিত গদগদ বলাই শর্মাকে কেমন নির্বোধ মনে হয় ডোম্বির। রাজার লোক বলে গর্ববোধ আছে, দাপটও দেখায় যত্রতত্র। দাবা খেলতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভালোবাসে। রাস্তার ধারে ডোম্বির নাচ দেখতে পেলে উৎফুল্ল হয়। দিনেরবেলা লোকজনের সামনে দশ হাত দূরে দাঁড়িয়ে দেখে, রাতের অন্ধকারে চুপিচুপি ওর দরজায় দাঁড়িয়ে টুকটুক শব্দ করে। কেননা দেবল ভদ্র ব্রাহ্মণদের জন্য দুটো আইন তৈরি করেছে। এক, ব্রাহ্মণ নিম্নবর্ণের স্ত্রীলোকের সঙ্গে যে-কোনো ধরনের মেলামেশা করতে পারবে, সে যদি তার বিবাহিত স্ত্রী না-ও হয় তবে তাতে কোনো ক্ষতি নেই। এমনকি তার গর্ভে সন্তান উৎপাদন করলে সংসর্গ দোষ ছাড়া অন্য কোনো নৈতিক অপরাধ হবে না। দুই, অন্যের সঙ্গে বিবাহিত নিম্নবর্ণের স্ত্রীলোকের সঙ্গে ব্যভিচার করা কম দোষের হবে। তবে নিম্নবর্ণের স্ত্রীলোককে বিবাহ করা হবে অমার্জনীয় অপরাধ।

এ আইনের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করেছিল পণ্ডিত সুধাকর, কিন্তু তাতে কোনো ফল হয়নি। তার আপত্তি ছিল এজন্য যে এভাবে ব্যভিচারকে আইনের আশ্রয়ে প্রশ্রয় দেয়া হচ্ছে, ব্যভিচারকে নিয়মের আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে, এতে লোক উচ্ছৃঙ্খল হবে। এর দ্বারা সমাজের কোনো মঙ্গল নেই, বরং ক্ষতির সম্ভাবনাই বেশি। অট্টহাসিতে হেসে পড়ে দেবল ভদ্র বলেছিল, 'সমাজ? সমাজ তো আমরাই। যাদের হাতে আইন তৈরি করবার ক্ষমতা আছে তারাই এ সমাজ। আমরা ভোগ করব, ওড়াব, তছনছ করব, যা খুশি তা করব, নাকি সব কীটাণুকীট।'

সমর্থন জুগিয়েছিল সাঙ্গপাঙ্গরা, 'হ্যাঁ ঠিকই বলেছে মন্ত্রী। আমাদের যাতে মঙ্গল হয় সে কাজই উনি করেছেন। আমাদের কল্যাণ দেখা তাঁর কর্তব্য।'

রেগে গিয়েছিল সুধাকর, টকটকে গৌরবর্ণের চেহারায় ভাটার মতো দু-চোখ থেকে যেন আগুন ঠিকরে পড়েছিল। কিছুক্ষণের জন্য হলেও সবাই সম্মোহিত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু দেবল ভদ্রের বুকের পাটা অন্য ধাতুতে তৈরি, কোনো কিছু তাকে বড়ো একটা স্পর্শ করে না।

রাশভারী বয়স্ক বৃদ্ধ চেঁচিয়ে বলেছিল, 'তুমি ওই অগণিত লোককে মানুষ বলে মনে করো না দেবল ভদ্র?'

দেবল ভদ্র চিবিয়ে চিবিয়ে বলেছিল, 'করি, নিশ্চয়ই করি। তবে ব্যবহার্য দ্রব্যের মতো, যখন ব্যবহারে লাগবে কাছে রাখব, যখন লাগবে না দূরে ছুঁড়ে ফেলে দেব।'

বাঁকা হাসিতে চকমকিয়ে উঠেছিল দেবল ভদ্রের ধূর্ত চেহারা। স্বভাবে তিনি ইন্দ্রিয় শাসিত, এর বাইরে শুকনো হাঁটাহাঁটি ভালো লাগে না। অকারণে বিনয়ের ভক্তির উচ্ছ্বাসে মদত জুগিয়েছিল পারিষদ দল। দেবল ভদ্রের প্রতিটি শব্দে মাথা নাড়ার জন্য তারা আছে, আর কোনো কাজ নেই।

রাজা বুদ্ধমিত্রের কাছে আবেদন করেছিল পণ্ডিত সুধাকর। অশীতিপর বৃদ্ধের দৃপ্ত চেহারা তাকে অভিভূত করেছিল ঠিকই, কিন্তু বুকে তেমন জোর ছিল না, কপালে চিন্তার ছায়া ফুটে উঠেছিল, কিন্তু প্রতিবাদ করেনি দেবল ভদ্রের তৈরি আইনের বিরুদ্ধে। সুধাকর জানে আপত্তি করার মতো সাহস বুদ্ধমিত্রের নেই। ব্রাহ্মণ মন্ত্রী দেবল ভদ্র বৌদ্ধ রাজা বুদ্ধমিত্রকে পরিচালিত করে। রাজকাজের সব ব্যাপারে তার দোর্দণ্ডপ্রতাপ। এককথায় সমুদয় শাসনযন্ত্র দেবল ভদ্রের হাতের মুঠোয়, কারও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোনো কথা সেখানে চলে না। বুদ্ধমিত্র মাথা হেলিয়ে বলেছিল, 'আইন তৈরির সব ক্ষমতা দেবল ভদ্রের, আপনি তো জানেন পণ্ডিত সুধাকর।'

সুধাকর সমান রোষে বলেছিল, 'তা তো জানি, তবু ভেবেছিলাম আপনারও কিছু করার ক্ষমতা আছে, আপনি দেশের রাজা।'

রাজা শব্দটা ভীষণ বিদ্রূপে বুদ্ধমিত্রের দিকে ছুঁড়ে মেরেছিল পণ্ডিত সুধাকর। সঙ্গে সঙ্গে উপায়হীন একটি অক্ষম লোকের সামনে থেকে রাগে গরগরিয়ে বেরিয়ে এসেছিল, কিছু করতে না পারার গ্লানি তাকে মরমে মারছিল। মনে হয়েছিল এই অদ্ভুত একতরফা আইন তৈরির সব লজ্জা ও অপমান তার একার। কিন্তু কিছুই করতে পারল না, অন্তত রদ করতে পারলে কিছুটা সান্ত্বনা পেত। তবু ও অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছে, নিজের বিবেককে প্রতারিত করেনি। রাজদরবার থেকে বেরিয়ে উদ্ভ্রান্তের মতো শকটে ওঠে সুধাকর। নগরীর পথে ধুলো উড়িয়ে শকট ছোটে, সরে যায় বাড়িঘর, গাছ, মানুষ, দিঘি এবং দেবালয় কিন্তু সুধাকরের বুক থেকে সরে না যন্ত্রণা। নিজেকে ক্ষুদ্র কীটের মতো মনে হয়, ও যে একা। দু-একজন গোপনে ওকে সমর্থন দিলেও প্রকাশ্যে কিছু বলার সাহস নেই। ওরা বলে, 'আপনি যুবক হয়ে এই প্রতিবাদ করলে দেবল ভদ্র আপনাকে গুম করে ফেলত। সমাজে আপনার প্রতিষ্ঠা ও পাণ্ডিত্য এবং বয়সের জন্য ওরা আপনাকে ঘাঁটায় না।' দেবল ভদ্রের মতো একজন লম্পট লোকের কাছে ওর পাণ্ডিত্যের পরাজয় ওকে মরমে মারে। আসলেই সমাজ এখন দেবল চন্দ্রের পায়ের নীচে, থেঁতলে যাচ্ছে পাণ্ডিত্য, সাধারণ মানুষ, মানসম্মান এবং বিবেক। নইলে এত বড়ো একটা অন্যায়ের বিরুদ্ধে ঝড় ওঠা উচিত ছিল, কিন্তু কিছুই হচ্ছে না। মানুষগুলোর সাহস দেবল ভদ্রের পায়ের নীচে। হা-হা করে হেসে ওঠে সুধাকর। এই আকস্মিক হাসিতে চমকে পেছনে তাকায় কোচোয়ান। সুধাকর ওকে ইশারা দিয়ে জানায়, তুমি যাও।

বাড়ি ফিরে এক গ্লাস জলও খেতে পারে না সুধাকর। গুম হয়ে বসে থাকে। বার বার নিজেকে ধিক্কার দেয়, বেঁচে থেকে কী লাভ? এতদিন যা শিখেছি তা কি মিথ্যা? কেন অন্যায়ের প্রতিবাদে কাজে লাগতে পারলাম না। প্রচণ্ড ব্যথায় মাথা ছিঁড়ে যেতে চায়।

সুধাকরের শঙ্কা সত্যি প্রমাণিত হল অনেকের ক্ষেত্রেই। যাদের এতদিন ইচ্ছে ছিল কিন্তু সাহস ছিল না তারা সুযোগের সদ্ব্যবহারে তৎপর হল। বলাই শর্মা তেমন একজন। একদিন রাতের অন্ধকারে ডোম্বির ঘরে এসে ঢুকল। ও অবাক হয়নি। আকারে ইঙ্গিতে বলাই শর্মা ক-দিন ধরে এ ইচ্ছেই প্রকাশ করছিল। ডোম্বি তেমন আমল দেয়নি, হেসে উড়িয়ে দিয়েছে, আজকে বলাই শর্মাকে দেখে চটুল হাসিতে আমন্ত্রণ জানায়, 'বাবা কী ভাগ্য আমার, তরপতি আজ আমার ঘরে। আজকাল কি রাতেরবেলায়ও কর আদায় শুরু করলেন?'

ডোম্বির আক্রমণে অপ্রতিভের হাসি হাসে বলাই শর্মা, এর জন্য ওর কোনো প্রস্তুতি ছিল না। তির্যক ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকা ডোম্বির দিকে তাকালে ছলকে-ওঠা রক্ত হিম হয়ে যায়। টেনে টেনে বলে, 'তোমার কাছে আবার কর কী? এই এলাম বেড়াতে বেড়াতে। ভাবলাম দেখি তুমি কী করছ? তা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছাড়া আমাদের সবার উচিতও সবার খোঁজখবর করা।'

বলাই শর্মার নির্বোধ হাসিতে ডোম্বি রেগে গিয়ে বলে, 'তাই নাকি? দিনের বেলায় আমাদের ছায়া মাড়াতে ভয় পান। তা তরপতি রাতারাতি আমাদের ছায়াগুলো এমন পবিত্র হয়ে গেল কী করে?'

বলাই শর্মা মহা উৎসাহে বলে, 'জানো না মন্ত্রী আইন করে দিয়েছেন যে তোমাদের সংসর্গ এখন আর দোষের নয়।'

'ওমা, কী বলেন? কই শুনিনি তো? তা ভালো, আইন করে সব বেশ শুদ্ধ করে নিচ্ছেন আপনারা। আপনারা ভালোই আছেন। যা খুশি করার জন্য আপনাদের হাতে আইন তৈরির ক্ষমতা আছে।'

'আহা তুমি চটছ কেন? এতে তো তোমাদের পুণ্যি হচ্ছে। তোমরা বামুনের ছোঁয়া পাচ্ছ, তোমাদের খুশি হওয়া উচিত।'

'খুশি? খুশি হব কেন? আমর তো মনে হয় আমাদের ছোটোলোকদের পাপও নেই পুণ্যও নেই।'

বিদ্রূপের হাসিতে তিরিক্ষে হয়ে ওঠে ডোম্বি। বলাই শর্মার বুক আচমকা কেঁপে যায়। এ নারীর যেমন আকর্ষণ তেমন ভীতি, না এসে পারা যায় না, এলে ভয় করে। বলাই শর্মা আঙুল কামড়ায়। ডোম্বির হাসি থামতে চায় না। বলাই শর্মা কথা বলতে পারে না। ভয়ে চুপ করে থাকে, কী বলবে বুঝতেও পারে না, বেশি কথা বললে আজকের রাতটা মাটি হয়ে যেতে পারে এই আশঙ্কাও মনে কাজ করে। ডোম্বির ঘরে মাটির প্রদীপ জ্বলে, সলতে প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। চুলোয় হাঁড়ি নেই, কয়লার আগুন গনগনে, হয়তো একটু আগে রান্না শেষ হয়েছে। আধো-অন্ধকারে ডোম্বির দীঘল দেহের মোহন ভঙ্গি বলাই শর্মার চোখের তারায় আটকে থাকে, দৃষ্টি ফেরানো কঠিন। বলাই শর্মার কণ্ঠতালু শুকিয়ে যায়। বিড়বিড়িয়ে বলে, 'কীসের পাপ? এমন শরীরের ছায়াতেই সব পুণ্য। ওহ্ মরণেও এখন সুখ!' বলাই শর্মা কণ্ঠে আবেগ ঢেলে বলে, 'এবার তোমার সব কর মাফ করে দেব ডোম্বি।'

'তা তো দেবেনই। বিনে কড়িতে তো আর রাতের শয্যা বানাইনি।'

ডোম্বির সুরেলা কণ্ঠ রুক্ষ ও কর্কশ।

বলাই শর্মা আমতা আমতা করে বলে, 'ঠোঁটের যা ধার তোমার, তাতে বলাই শর্মা কেন দেবল ভদ্রই খুন হয়ে যাবে।'

আবার সেই আচমকা হাসি, শানানো ছুরির মতো ঝিলিক দেয়, সাদা দাঁত ঝকমকিয়ে ওঠে। বলে, 'যা করি বাপু সোজাসুজি, বাঁকা পথের কাজকারবার আমার কাছে নেই। ফেলো কড়ি মাখো তেল।'

এক সময় চুলোর গনগনে কয়লা একদম ছাই হয়ে যায়। এলোপাতাড়ি বাতাসে গাছের মাথায় শনশন শব্দ। বলাই শর্মা বিদায় নেয়। নদীর কাছে যেতে ভীষণ ইচ্ছে করে ডোম্বির। নদী ওকে যেমন জন্মের পর বুকে নিয়েছে, যেমন লালন করেছে, তেমন আবার পরিশুদ্ধ করে। একটা ডুব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিয়ে উঠলে মনে হয় কোথাও কোনো গ্লানি নেই, ময়লা নেই, কাদামাটি নেই, দারুণ ঝরঝরে আর পবিত্র লাগছে। একা বিছানায় শুয়ে ডোম্বি বিড়বিড় করে, 'নদী তুই আমার সব—মা, বাবা, বন্ধু, কেবল তুই আমার কানু হতে পারিস না।' মুহূর্তে ও ডোম্বি থেকে মল্লারী হয়ে যায়, কানুর লেখা গান ওর কণ্ঠে উঠে আসে। অনেকক্ষণ গুনগুনিয়েও ওর আশ মেটে না। এই লোকটা ওকে পাগলের মতো টানে। পেছনের সমস্ত নাড়ির বাঁধন উপড়ে ফেলে ছুটে যেতে ইচ্ছে করে।

দেবল ভদ্রের প্রবর্তিত আইন যখন ঢেঁড়া পিটিয়ে সর্বত্র ঘোষণা করা হল তখন গাঁয়ের লোক কথা বলতে পারেনি। হতভম্ব ভাবটা কাটিয়ে উঠতে সময় লেগেছিল অনেক। কেবল ডোম্বি গায়ে বিছুটির জ্বালা নিয়ে নৌকায় বসে চিৎকার করেছিল, 'বেশ হল, খদ্দের বাড়ল আমার, রোজগারও বাড়বে। দেশের রাজা আমাদের ভারি দয়ালু, গরিবের দিকে দৃষ্টি আছে।' পারাপারের লোকেরা হাঁ-করে ওকে দেখছিল। চিৎকার করছিল দেশাখও, 'বেশ করেছে, কাজের মতো কাজ করেছে। কতকাল আর লুকিয়ে-ছাপিয়ে রাখা যায়। প্রকাশ্যে প্রতিষ্ঠিত করাই ভালো। এখন আর বাধা রইল না।'

জটলা করছিল অনেকেই। দেশাখের বিদ্রূপাত্মক কণ্ঠস্বর সকলের মন ছুঁয়ে যায়। সবার মধ্যেই কম-বেশি অসন্তোষের গুঞ্জন।

'এতদিন আচার-আচরণে আমরা ছোটোলোক ছিলাম। এবার আইন করে ঘোষণা করা হল আমরা নেড়ি কুকুরের চাইতেও অধম।'

সবার চোখমুখে বেদনার ছায়া, কেউ প্রতিকারের ভাষা জানে না। মাথা পেতে নিতেও গ্লানি। দুঃসহ যন্ত্রণার বিশাল কাঁটা বুকের মধ্যে গেঁথে থাকে।

দেশাখ চেঁচিয়ে ওঠে, 'ইচ্ছে করছে ওই লুচ্চাটার মাথা ফাটিয়ে—'

'ওরে দেশাখ চুপ কর। দেবল ভদ্রের বিরুদ্ধে কথা বললে কারও ঘাড়ে মাথা থাকবে না। কচুকাটা করবে। ঘরদোর পুড়িয়ে ছাই করে দেবে।'

বুড়ো নিমাইয়ের আতঙ্কিত কণ্ঠে দেশাখ চুপ করে যায়। ওরা সবাই জানে দেবল ভদ্র এক মুহূর্তে একটা বিরাট অনর্থ ঘটাতে পারে, সে কারও পরোয়া করে না।

'বেশি বাড় ভালো না রে। ছোটোলোকের মতোই থাক, জন্মের পাপ তো আমাদের বইতে হবে।'

ভিড়ের মধ্য থেকে দীপক চেঁচিয়ে বলে, 'না কাকা সবসময় একটা কথা বলবেন না।'

'তবে তোরা কী করবি?'

'সেটা আমাদের ভাবতে হবে।'

'বুকের পাটা বেড়েছে দেখছি।'

বুড়ো নিমাই দুপদাপ পা ফেলে জটলা থেকে সরে পড়ে। ছেলেদের এ ধরনের আচরণ ওর একদম পছন্দ হয় না, ওরা আগে-পিছে বুঝতে চায় না। নিমাইর পেছনে আর অনেকেই যায় যারা মনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করে ছোটোলোক হওয়াটা জন্মগত অধিকার, এটা নিয়ে বাড়াবাড়ি করলে মঙ্গল তো নেইই, উলটো পাপের পঙ্কে ডুবে মরতে হবে।

তরুণরা অসন্তোষের হুল ফোটানো জ্বালা বুকে নিয়ে একে একে সবাই নিজ নিজ কাজে যায়। এ অপমান কারও পক্ষেই ভোলা সম্ভব নয়। প্রতিবাদের উপায় চাই। এ কথা ক-টি প্রার্থনার সংগীতের মতো সবার মুখে। ভিড় কমে গেলে দেশাখ কাহ্নুপাদের কাছে এসে দাঁড়ায়, 'কানুদা তুমি তো লেখো, চিন্তাভাবনা করো। আমার একটা প্রশ্নের জবাব দাও।'

'কী?'

'আমরা কেন ছোটোলোক? কী আমাদের অপরাধ? আমাদের কী নেই?'

কাহ্নুপদ দেখতে পায় দেশাখের উত্তেজিত চেহারায় চোয়ালটা মাটির টিলার মতো উঁচু হয়ে উঠেছে, ঠোঁট জোড়া নদীর মতো বেঁকে যায়, ওর ভুরুর ওপর বাঘের থাবা, চোখে লোহার শিক পোড়া আভা। এসব নিয়েই তো একটা কিছু রদবদল হয়ে যায়।

দেশাখ অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলে, 'কথা বলছ না কেন?'

'আমারও তো দেবল ভদ্রের শরীর টুকরো করে দেখতে ইচ্ছে করে যে তার রক্তের রং কী? আমাদের রক্তের রং যদি লাল হয় তবে সে একই রং নিয়ে ওদের বেঁচে থাকা উচিত নয়, হয় মরুক নয় রক্তের রং পালটাক। সব জায়গায় উচ্চ-নীচের ভেদটা তফাত করে দিক।'

'ঠিক বলেছ। চলো একদিন সবাই মিলে রাজার কাছে গিয়ে এ আবেদন জানাই।'

'তাতে লাভ? রাজা তো ওদের লোক, আমাদের কেউ না। আমাদের জন্য তার কোনো দরদ নেই।'

'শুধু তাই নয়, তার কোনো বিবেকও নেই। থাকলে ন্যায় এবং অন্যায়ের ভেদ বুঝত।'

'তুই তো বলিস আমি ভাবি কি না। ভেবে ভেবে আমি দিশেহারা হয়ে যাই রে। আমি ঠিক করেছি, চল আমরা ছোটোলোকরা আলাদা হয়ে যাই। আমাদের ভেতর থেকে একজনকে রাজা বানাই, একজনকে মন্ত্রী। তারাই আমাদের কথা ভাববে। আমাদের উপকার করবে।'

দেশাখ ওকে জড়িয়ে ধরে, 'তুমি একটা সাংঘাতিক কথা বলেছ কানুদা। তাহলে আমরা রাজাকে কর দেব না।'

'হ্যাঁ ঠিক।'

'আমাদের এই এলাকার সব জমির মালিক হব আমরা।'

'হ্যাঁ ঠিক।'

'আমাদের মুখের ভাষাই হবে রাজদরবারের ভাষা।'

'তা তো হতেই হবে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

‘উফ কানুদা, আমরা নিজেদের একটা রাজ্য গড়ব।’

‘কিন্তু দেশাখ ওরা তা মানবে না।’

‘না মানলে লড়াই করব।’

‘কেমন করে? আমাদের তো কিছু নেই।’

‘তিরধনুক আছে।’

‘সে আর ক-টা? কিন্তু ওদের বাহিনী আছে, অস্ত্রশস্ত্র আছে। ওদের সঙ্গে আমরা পারব না।’

‘সেজন্য নিজেদের তৈরি করতে হবে কানুদা।’

কাহ্নুপাদ ওকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলে, ‘তোর কাছে আমি এমন উত্তরই চাইছিলাম দেশাখ। আমাদের ছেলেরা তোর মতো হলেই আমরা লড়তে পারব। আমার খুব আনন্দ হচ্ছে রে। চল রামক্রীর ওখানে যাই। আজ ওদের নতুন মদ চোলাই হবে।’

দু-জনে হাঁটতে হাঁটতে নিমগ্ন হয়ে যায়। দেশাখ মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে শিকারের নামে তিরধনুকের একটা দল গড়ে তুলবে ও। আস্তে আস্তে সে দল এক বিরাট বাহিনী হয়ে যাবে। কাহ্নুপাদ ভাবে স্বপ্ন যত সুখকর হোক ব্যাপারটা খুব সহজ নয়। ওরা ছাড়া রাজকোষে অর্থ যোগাবে কে? ধানের গোলা ভরবে কে? দেশের সব জমির মালিক রাজা। এত সহজে সব কিছু ওদের ছেড়ে দেবে না। তার জন্য প্রচুর রক্তপাত চাই, প্রচুর রক্ত! কাহ্নুপাদের মাথা ঝিম ধরে যায়। শূন্য দৃষ্টিতে সাদা মেঘ ভাসে।

তখন পটহ মাদল বাজিয়ে কুক্কুরীপাদ নেচে নেচে পথ চলে। উলঙ্গ শরীরে ছাই মাখানো, গলায় হাড়ের মালা, জটা-ধরা চুল মাথার ওপর চুড়ো করে বাঁধা, চোখ জবা ফুলের মতো লাল। পটহ মাদলের শব্দের সঙ্গে গলার হাড়ের ঠকঠক শব্দ মিলে বিচিত্র ধ্বনি হয়। কুক্কুরীপাদের কোনো দিকে খেয়াল নেই, যোগীর ধ্যানে মগ্ন। ও দূরের পাহাড়ের দিকে যাচ্ছে। ওখানেই থাকে। সংসার পছন্দ করে না। উদ্দাম, মুক্ত ও প্রেমময় জীবন ওর কাম্য। ওকে ভালোবেসে ওর সঙ্গে বেরিয়ে গেছে সন্ধ্যা। দু-জনে পাহাড়ে থাকে, ফলমূল খায়, কখনো গাঁয়ে এসে ভিখ চায়। চিন্তাভাবনাহীন এই মুক্ত জীবনে ওরা ভীষণ সুখী। কিন্তু লোকালয়ের মানুষ ছেড়ে এই একা একা বসবাস একটুও ভালো লাগে না কাহ্নুপাদের। ও সবার মাঝে, সবার সুখে-দুঃখে থাকতে চায়। কুক্কুরীপাদ ওদের দেখে গান থামিয়ে দাঁড়ায়।

‘কোথায় যাচ্ছ কানুদা?’

‘রামক্রীর ওখানে যাব। এক ঢোক গলায় ঢালব।’

কুক্কুরীপাদ হা-হা করে হাসে, ‘রাজার আইনে মাথা ঘুরে গেছে তো? বুঝি, সব বুঝি কানুদা।’ আবার পটহ মাদল বেজে ওঠে, কুক্কুরীপাদ গায়,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুলি দুহি পিটা ধরণ ন জাই

রুখের তেন্তলি কুম্ভীরে খাঅ

আঙ্গন ঘরপণ সুন ভো বিআতী।।

কুক্কুরী গাইতে গাইতে অনেকদূরে চলে যায়। অস্পষ্ট হয়ে আসে গানের কথা, সুর। কেবল বাজনার শব্দ আসে মৃদু। কাহ্নুপাদ থমকে দাঁড়িয়েছিল। গান শুনে ওর ভুল ভাঙে। কুক্কুরী যতই দূর পাহাড়ে থাকুক, যোগী হয়ে হাড়ের মালা পরুক, আসলে দেশের অবস্থা বোঝে। নইলে এমন সুন্দর পংক্তি কেউ রচনা করতে পারে না। কাছিম দুইয়ে পাত্রে রাখা যায় না। গাছের তেঁতুল কুমিরে খায়। কুক্কুরীপাদের গানের প্রথম পংক্তি কাহ্নুপাদকে ভাবায়। কী সুন্দর করে বলা। আসলে ও যোগীর জীবনযাপন করলেও মানুষের কথা ভাবে, মানুষকে ভালোবাসে। ভালোবাসার এই সুগভীর বোধ থেকেই হৃদয়ের ভাষার এমন বাঙ্ময় প্রকাশ। ওর তখুনি মনে হল আসলে সবার বুকের গভীরে লুকিয়ে আছে লড়াইয়ের প্রস্তুতি, ডাকলেই হয়, পাহাড়, বন এবং লোকালয় থেকে ছুটে আসবে মানুষ, যোগীর ধ্যান উড়িয়ে দিয়ে, সব কাজ ফেলে। হঠাৎ করে দেশাখ দাঁড়িয়ে পড়ে, 'আমি চলি কানুদা। তুমি একা যাও।'

'কোথায় যাবি?'

'অন্য কোথাও যাব। কিছু ভালোও লাগছে না।'

'ঠিক আছে, যা।'

ওর মন বিক্ষিপ্ত হয়েছে, ও আর কোথাও যাবে, ঘুরে ফিরে আবার নিজের মুখোমুখি হবে, আর দু-পাঁচটা ছেলেকে মনের কথা বলবে, একত্র করতে চাইবে। করুক, কাজটা ওকেই সাজে, ওর সে গুণও আছে। কাহ্নুপাদ হাঁটতে হাঁটতে খেয়াঘাটের কাছে আসে। রামক্রীর ওখানে যেতে ওরও ভালো লাগে না, বরং সবার সঙ্গে কথা বলে পরিস্থিতি কতটা অনুকূল তা বুঝতে পারবে। খেয়াঘাটে জটলা বেঁধেছে, সবার কণ্ঠই আজ সোচ্চার হতে চায়, কিন্তু গলা ফাটিয়ে চেঁচাতে পারে না। কোথায় যেন ভয়, নিমাই বুড়োর তর্জনী দেখতে পায়, ছোটোলোকরা ছোটোলোকের মতো থাক। তাই বেশি ভাবতে চায় না অনেকে, আবার নিজেদের শামুকের মতো গুটিয়ে নেয়। আর কিছুক্ষণের মধ্যে অরণ্যের কর আদায়কারী রাজার লোক দেখে সবাই সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। কাহ্নুপাদ কথা বলে, 'কী ব্যাপার অরণীবাবু?'

'ব্যাপার আর কী? এই এলাম ঘুরতে ঘুরতে। সারাদিনই তো ঘুরতে হয় এখানে নয় ওখানে। কাজটাই তো ঘোরার।'

বেশি কথা বলা অরণীবাবুর স্বভাব। কথায় একবার পেয়ে বসলে আর থামতে চায় না। নিজেও বোঝে নিজের এ অভ্যাসের ব্যাপার। তখন দাঁতে জিভ কেটে বলে, 'আমি বড্ড বাচাল। একবার শুরু করলে আর থামতে পারি না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পান খেয়ে রাঙিয়ে রাখা দাঁতগুলো বের করে হা-হা করে হাসে, যেন প্রবল রসিকতা করেছে। পরমুহূর্তে কারও কারও দিকে চোখ পড়তে ফুঁসে ওঠে, 'কী হে বাপু আর কতদিন ঘোরাবে? ঘুরতে ঘুরতে তো পা দুটো হারাতে বসেছি। কলুর বলদের ঘোরা এর কাছে কিছুই না। আর কিন্তু ঘুরতে পারব না বাপু, এবার না দিলে দরবারে নালিশ দেব। তখন মজাটা টের পাবে।'

যারা অরণ্যে শিকার করে ওরা দু-তিনজন জোড় হাতে বলে ওঠে, 'দেব, অরণীবাবু দেব। আপনাকে আর ঘুরতে হবে না, বাড়ি বয়ে দিয়ে আসব। বড়ো খারাপ সময় যাচ্ছে, শিকারই জোটে না। শিকার করে আর দিন চালানো যায় না।'

'অতশত আমি বুঝি না বাপু। আমার কাজ আমি করব, নইলে আবার আমাকে শাস্তি পেতে হবে।'

কাহ্নুপাদ পাশ থেকে বলে, 'চাইলেই তো হয় না। ওদের দিকটাও তো দেখতে হবে।'

অরণী চোখ গরম করে। 'অত দেখতে গেলে আমার চলে না। রাজার আইন এতকিছু বোঝে না। পিঠে দু-ঘা পড়লে তবে তোমাদের আক্কেল হবে। বুঝলে?'

কাহ্নুপাদ প্রচণ্ড ক্রোধের পরও নিজেকে শান্ত রাখে। মনে মনে বলে, 'আক্কেল আমাদের ঠিকই হচ্ছে। টের পাইয়ে ছাড়ব।' কিন্তু পরিবেশ সহজ করার জন্য লঘু কণ্ঠে বলে, 'আপনার শরীর খারাপ নাকি অরণীবাবু? চোখমুখ শুকানো দেখাচ্ছে?'

'তা দেখাবে না কেন বলো? এ দেশটায় কি বাস করার উপায় আছে? যতসব জঞ্জাল আমার মাথার ওপর এসে পড়েছে। গতকাল আমি আমার প্রিয়তম স্ত্রীকে ত্যাগ করেছি।'

'কেন? কেন?'

'আর কেন? আমার শালার ভাস্তের কন্যার নামে কলঙ্ক রটেছে। পরে শুনেছি সে কলঙ্ক মিথ্যে, কিন্তু মিথ্যে হলেও কলঙ্ক তো! সে পাপে আমার স্ত্রীও কলুষিত হয়েছে। এখন সেই কুলটা স্ত্রীকে নিয়ে কী করে ঘর করি বলো? তাই ওকে ত্যাগ করেছি। গতকাল বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছি। বড়ো প্রিয়তম স্ত্রী ছিল আমার। যাবার আগে আমার দু-পা জড়িয়ে ধরে সে কী কান্না! দেখলে পাষাণও গলে যায়, আমি তো মানুষ। কত যত্ন করত আমাকে, সংসারের সব কিছুতে সজাগ দৃষ্টি ছিল, ছেলেমেয়েগুলোর এখন যে কী হাল হয়েছে! আমার সোনার সংসার শ্মশান হয়ে গেল।'

অরণী নিজেকে আর ধরে রাখতে পারে না, কেঁদে ফেলে। তার আসল নাম একটি ছিল, এখন আর চালু নেই, সবাই ভুলে গেছে। কোঁচার খোঁট দিয়ে বার বার চোখ মোছে, নাক ঝাড়ে, নাকের ডগা লাল হয়ে ওঠে। সবাই হতভম্ব, কেউ কথা বলতে পারে না, অনেকের চোখের কোণ চিকচিক করে। পেছন থেকে কেউ ফিসফিসিয়ে বলে, 'আহা রে কী কষ্ট অরণীর।' চোখের জল ওকে সবার কাছাকাছি নিয়ে এসেছে। ওদের ব্যবধান ঘুচে গেছে। একটু আগের রুক্ষ, নিষ্ঠুর লোক ও এখন আর নয়। শুধু কাহ্নুপাদ একবার মনে মনে আউড়ে নেয়, 'শালার ভাস্তের কন্যা তার দোষ...।' নাহ্ আর ভাবা যায় না। কিছুক্ষণের মধ্যে আত্মস্থ হয় অরণী। নিজের দুর্বলতা কাটিয়ে উঠে সচেতন হয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যায়। কিছুটা দম্ভের স্বরে বলে, 'তোমরা হয়তো জানো না, আমার মা তেমন সৎকুলের মেয়ে ছিল না। আমার বাবা তার বাবার মতের বিরুদ্ধে নিয়ে করেছিল। আমার গিন্নি কিন্তু সৎ ক্ষত্রিয় বংশের মেয়ে ছিল। সেই দিক থেকে আমি আমার বাবার ওপর টেক্কা দিয়েছিলাম। আহা, তার ওপর আমার এমন প্রেয়সী!'

অরণী আবার চোখের জল মোছে। শোক যেন কিছুতেই ঠেকিয়ে রাখতে পারছে না, অথচ সংস্কার আষ্টেপৃষ্ঠে, সেটাও মানতে হয়। অরণীর এমন গভীর শোক দেখে হাসি পায় কাহ্নুপাদের। পেছন থেকে নিমাই বুড়ো দরদি গলায় সহানুভূতি দেখায়, 'আহা বড়ো সৎ বামুন আমাদের অরণীবাবু। এমন নিষ্ঠাবান লোকের জন্যই তো সমাজটা টিকে আছে, নইলে সব ছারখার হয়ে যেত।'

'বটেই তো, কতবড়ো পুণ্যের কাজ করেছেন ও।'

পেছন থেকে কে যেন সমর্থন জানায়। কাহ্নুপাদ খেয়াল করে অনেকেরই মুখেচোখে একটা ভক্তিভাব, যেন এমন মহৎ পুণ্য আর কিছুতেই হয় না। একই সঙ্গে সকলেই যেন একটা শোকের অংশীদার হয়ে বাক্যহারা হয়েছে। এদের নিয়ে কেমন করে আলাদা রাজ্য হবে? ওরা কি এদের বিরুদ্ধে লড়বে? হতাশা বোধ করে কাহ্নুপাদ, বুক মোচড়ায়। কিছুই ভালো লাগে না। দেশাখকে খোঁজে। না, ও এ জটলায় নেই। কেউ কথা বলছে না কেন? ভাবটা যেন কথা বলে পুণ্যের পবিত্রতা এবং স্তব্ধতা ক্ষুণ্ণ করবার সাহস কারও নেই। এক সময় অরণী নিজেই উঠে দাঁড়ায়।

'যাই, ছেলেমেয়েগুলো ঘরে রয়েছে। বড্ড জ্বালাতন করে, ঘরে ফিরলে মাথা খারাপ হয়ে যায়।'

কিছুদূর গিয়ে আবার ফিরে আসে অরণী। এদিক-ওদিক তাকিয়ে বলে, 'দেশাখ কই? দেখছি না তো, ওর চুল পর্যন্ত দেখা যায় না আজকাল। আমাকে কেবলই ঘোরায়। দশদিন চোরা কুঠুরি থেকে ঘুরে এলেই মজাটা টের পাবে।'

কেউ কোনো কথা বলে না। অরণী লম্বা লম্বা পা ফেলে ঘাটে এসে দাঁড়ায়। একদল লোক নিয়ে ডোম্বির নৌকা কেবল ঘাটে এসে লেগেছে। অরণী এক কোণে সরে দাঁড়ায়। সবার নামা হয়ে গেলে লাফ দিয়ে নৌকায় ওঠে। ডোম্বির উলটো দিকে নৌকার মাথায় গিয়ে বসে। যদি কোনোক্রমে বইঠার জল এসে গায়ে লাগে অথবা ডোম্বির ছায়া পড়ে তাহলে তো বাড়ি গিয়ে আবার স্নান করতে হবে। এমনিতেই এ পাড়ায় এলে স্নান না করে উপায় থাকে না। সেজন্যই তার সবসময় এক কথা, 'ছোটোলোকগুলোর জ্বালায় রাস্তায় হাঁটা দায়।' ডোম্বি আবার নৌকার কাছি খুলে দেয়। অরণীবাবু উঠলে আর কাউকে নৌকায় ওঠানো যাবে না, সবসময় একলা পারাপার চায়। মনে মনে বিরক্ত হলেও ডোম্বির উপায় নেই। নইলে দরবারে ঠুকে দিলে খামোখা শাস্তি। ডোম্বি কাছিটা একপাশে গুছিয়ে রাখে।

'দেখিস, সাবধানে রাখ। জল ছিটাসনে।'

ডোম্বি খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে। বামুনদের এসব কিছুতে ও মজা পায়। আসল চরিত্র যে কী তা তো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওর চেয়ে ভালো আর কেউ জানে না। এরা রাতে ইঁদুর, দিনে বেড়াল। ভাবলে ঘেন্না হয়।

'আ মোলো হাসির কী ঘটা!'

'ভয় নেই। আমার কাছি আপনাকে ছুঁয়ে দেবে না। ও লোক চেনে, আচারবিচার বোঝে।'

'হয়েছে ঢং রাখ।'

ডোম্বি হাসতে থাকে। রেগে যায় অরণী। ধমক দিয়ে বলে, 'তুই থামবি কি না বল?'

'এটুকু নিয়েই তো বেঁচে আছি। তাও বন্ধ করে দেবেন?'

'যতসব ছিনালিপনা। দেখলে গা জ্বলে।'

অরণী দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে গাল দেয়। তারপর নদীর দিকে তাকিয়ে থাকে। গজগজিয়ে বলে, 'যা হাসির ছিরি, নৌকাটা না ডুবলেই বাঁচি।'

অরণীর মেজাজ খারাপ হয়ে থাকে। দোম্বির বইঠায় ছপছপ শব্দ হয়। আড়চোখে অরণী বার বার সেদিকে তাকায়। মেয়েলোকটা ইচ্ছে করে জল না ছিটোলেই হয়। এদেরকে বিশ্বাস নেই। ডোম্বি অবশ্য আজ আর কোনো বদমায়েশি করে না। নইলে অনেক সময় এমন কায়দা করে জল ছিটোয় যেন ওর কোনো দোষ নেই, নৌকা বাওয়াটাই এমন। ঘাটে এসে নৌকা ভিড়তেই অরণী লাফ দিয়ে নেমে যায়। দূর থেকে একটা কড়ি ছুঁড়ে দেয় ডোম্বির দিকে। নৌকার পাটাতনে সেটা ঠক করে পড়ে। ডোম্বি কুড়িয়ে নিয়ে কোমরে গুঁজে রাখে।

ঘাটের পানিতে পা ডুবিয়ে বসে থাকা ছুটকির ব্যাপারটা ভালো লাগে না। অমন করে কড়ি দিতে ও আগে দেখেনি। তাই ডোম্বিকে জিজ্ঞেস করে, 'অমন করে কড়ি দুটো ছুঁড়ে দিল কেন মাসি?'

'আমরা যে ছোটোলোক তাই। যদি হাতে হাত লেগে যায়।'

'আমরা কেমন করে ছোটোলোক হলাম মাসি?'

'কী জানি, জানি না।'

'আমাকে কেউ অমন করে কড়ি দিলে আমি ঘুষি মেরে তার নাক ফাটিয়ে দেব।'

ডোম্বি খুব আগ্রহ নিয়ে বলে, 'পারবি ছুটকি?'

'খুব পারব।'

'তাই যেন পারিস ছুটকি, তাই যেন পারিস।'

ডোম্বি ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়। ছুটকির বড়ো বড়ো চোখের পাতায় সর্বনাশা ঝড় আবিষ্কার করতে চায়। ওদের গড়তে হবে। খেয়া পারাপারের জন্য দুজন বুড়োবুড়ি এসেছে। ডোম্বিকে আবার কাছি খুলতে হয়। ছুটকিও উঠে বসে নৌকায়। এপারে এসে কাকুতিমিনতি শুরু করে বুড়োবুড়ি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

‘পারের কড়ি দিতে পারব না বাপু। একটাও কড়ি নেই।’

‘তা হবে না।’

ডোম্বি বুড়ির হাতের পুঁটলি কেড়ে নিয়ে খুলে ফেলে। গোটা কয়েক তিলের নাড়ু, পাঁচ সাতটা মোয়া। কয়েক টুকরো নোনা ইলিশ, পানসুপারি, এমনি হাবিজাবি কতকিছু। কিন্তু কড়ি নেই। ডোম্বি পুঁটলিটা রেখে দিয়ে বুড়ির কোমর হাতড়ায়, না নেই। ও অবলীলায় বুড়োর কোমরও খোঁজে, কিন্তু খালি। দু-জনের পা ধূলিধূসরিত, কাপড় হাঁটু পর্যন্ত ওঠানো এবং ময়লা, কারও গায়ে জামা নেই। চেহারায় ক্লান্তি, চোখে পিঁচুটি, ডোম্বির মনে হয় ওদের চামড়ার ভাঁজে বুঝি ধুলো জমে আছে। অথচ বুড়ির কপালে জ্বলজ্বলে সিঁদুর। এতকিছুর মধ্যে ওই লাল রঙের জন্য বেশ দেখাচ্ছে বুড়িকে।

বুড়ি কাকুতিমিনতি করে, ‘পায়ে পড়ি ছেড়ে দে মা। একটাও কড়ি নেই। তিন কোশ পথ হেঁটে এসেছি। জামাইর বাড়ি যাচ্ছি, মেয়েটার অসুখ।’

‘তা যে চুলোয় খুশি সে চুলোয় যাও। কড়ি দিয়ে যেতে হবে। নইলে রেহাই নেই। জামাইর বাড়ি গিয়ে তো ঢেঁকিশাক দিয়ে নোনা ইলিশ রেঁধে খাবে। আমি কী করব? ওইসব হবে না বাপু। সারা দিন গায়ে খেটে দুটো কড়ি না পেলে কি দিন চলে?’

বুড়োবুড়ি চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে, কথা বলতে পারে না। আগে কখনো এমন হয়নি। ভেবেছিল হাতে-পায়ে ধরলে পাটনি পার করে দেবে। কিন্তু এ যে বড়ো কঠিন তা কেমন করে জানবে! একটু পর বুড়ি বলে, ‘ঠিক আছে মা তুই দু-খান মাছ আর এক আঁটি শাক রেখে দে।’

‘ঠিক আছে দাও। দুটো নাড়ুও দিও।’

বুড়ি তাড়াতাড়ি পুঁটলি খুলে জিনিসগুলো ডোম্বির হাতে দিয়ে নেমে যায়। ওদিকে তাকিয়ে ছুটকি বলে, ‘আচ্ছা মাসি তুমি ওদের ছেড়ে দিলেই তো পারতে?’

‘না রে বিনে কড়িতে পার করলে লক্ষ্মী থাকে না।’

‘কেন, কানু কাকা তো প্রায়ই কড়ি না দিয়ে নেমে যায়।’

‘তোর কানু কাকা আর ওরা বুঝি সমান হল?’

‘তা তো না, তবে পারাপার আর কড়ি তো সবার জন্য সমান। কানু কাকা না দিলে তোমার লক্ষ্মী থাকে?’

‘তোর কানু কাকা তো দিতেই চায়। আমিই নেই না।’

‘কেন নাও না?’

ডোম্বির বুকে মৃদু কাঁপন জাগে। লাল হয়ে ওঠে গাল। বলে, ‘এমনি নেই না। ইচ্ছে হয় না।’

‘আমারও কানু কাকার জন্য কিছু করতে ভালো লাগে। ওদিন গাছের পাকা ডালিমটা দিয়ে এসেছি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মা-কে লুকিয়ে। আমি বড়ো হয়ে দূরদেশে গিয়ে কানু কাকার জন্য লেখার কাগজ নিয়ে আনব।'

ডোম্বি অবাক হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে থাকে। ছুটকি একটুক্ষণ চুপ থেকে বলে, 'আচ্ছা মাসি এই নদীটা কোথায় গিয়ে বাঁক নিয়েছে?'

'জানি না।'

'আমার বড্ড জানতে ইচ্ছে করে। জানো মাসি মনে হয় মাছ হয়ে ভাসতে ভাসতে চলে যাই অনেকদূরে। দেখি কোথায় কোথায় নদী বাঁক নেয়। দেখতে ইচ্ছে করে নদীর তীরে কত মানুষ ঘর বেঁধেছে। ঘরের চালগুলোই বা কেমন? আচ্ছা মাসি?'

'বল।'

'নদীর পানি ঘোলা কেন?'

'জানি না।'

'তুমি কিচ্ছু জানো না। জানো কেবল নৌকা বাইতে।'

ছুটকি রেগে যায়। ওর কত কী যে জানতে ইচ্ছে করে। যেখানে আকাশটা মাটির সঙ্গে মিশে গেছে সেখানে যেতে ইচ্ছে করে। বসে বসে গাছগাছালির বেড়ে ওঠা দেখতে ইচ্ছে করে। এখন আর একটি জিনিস জানার জন্য মন ব্যাকুল হয়েছে। রাজদরবারে গিয়ে রাজাকে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করে, 'আমরা কেমন করে ছোটোলোক হলাম।'

'মাসি?'

'তুই বাড়ি যা ছুটকি। তোর মা খুঁজবে।'

'তুমি আমার সঙ্গে কথা বলবে না, তাই তো?'

'তোর সঙ্গে কথা বলব কী রে? তুই তো আমার চাইতে অনেক বেশি জানিস।'

'বুঝেছি বুঝেছি, আমাকে আর বোঝাতে হবে না।'

ছুটকি জোরে জোরে নদীর পানিতে পা নাচায়। বইঠা ধরে নাড়িয়ে দেয়, তারপর চুপচাপ উঠে চলে যায়। ও হাঁটতে হাঁটতে দূরের পাহাড়ের দিকে যায়। ডোম্বি অবাক হয়, ভীষণ চালাক ছেলে তো। কেমন অবলীলায় বাড়তি কথাটুকু বুঝে যায়। পারাপারের লোক নিয়ে জলের বুকে পরম অবহেলায় নৌকা বায় ডোম্বি, যেন কোথাও কোনো দায়ভার নেই। দাঁড়ে হালে কাছিতে সর্বত্র এক সাবলীল নিরুদ্বেগ পরম সুখে খেলা করে। কেবল বিনে কড়িতে পারাপারে যত কড়াকড়ি, হাজার মিনতিতে মন গলে না। কিন্তু ছুটকি ঠিকই বলেছে, কানুকে ছেড়ে দেয় কেন? শুধু ছাড়া নয়, দিতে চাইলেও নেয় না। এর উত্তর কি কাউকে বলা যায়? আপন মনে হাসে ডোম্বি। শুধু একটি মানুষ ওকে নদীর মতো উদার করে দেয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অপণা মাঁংসে হরিণা বৈরী

ভাঙা বৌদ্ধ মন্দিরের চত্বরে সময় আর কাটতে চায় না বিশাখার। কাল সন্ধ্যায় দেশাখ ওকে এখানে আসতে বলেছিল। সেই কখন এসেছে ও। সব কাজ ফেলে রেখে মা-কে ফাঁকি দিয়ে চলে এসেছে, ভাই-বোনেরাও কেউ টের পায়নি।

অথচ দেশাখের পাত্তা নেই, যা রাগ হচ্ছে, ভাবছে চলে যাবে এখুনি। পরক্ষণে মন নরম হয়ে যায়। দেখা না করে যাওয়া ওর নিজের পক্ষেই সম্ভব নয়। দেশাখ ছাড়া আর কোনো আনন্দই নেই ওর জীবনে। চারদিকে শুধু অভাব, এক বেলা খেলে আরেক বেলা জোটে না। সারা বছরে একটা কাপড় কেনা হয় না। মনটা সবসময় বিষণ্ণ থাকে, শুধু দেশাখের সান্নিধ্য ওকে মাতিয়ে রাখে। মাঝে মাজেই বিশাখার মনে হয় বিষণ্ণ হতে হতে ও যখন কুঁকড়ে যায় তখন দেশাখ আবার ওকে উজ্জীবিত করে। দেশাখই ওকে বাঁচিয়ে রেখেছে, নইলে ও হয়তো মরে যেত। ইদানীং বাবার অসুখ ওকে আরও হতাশ করে দেয়।

আস্তে আস্তে কেমন ভয় করতে থাকে বিশাখার। কতকাল আগের বৌদ্ধ মন্দির কে জানে, এখন ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। লোকজন ইচ্ছেমতো ইট-কাঠ খুলে নিয়ে কাজে লাগাচ্ছে। রাজা কোনো গরজ করে না। ব্রাহ্মণ মন্ত্রীর হাতে দেশের শাসন ছেড়ে দিয়ে নিজে বিলাসে মেতেছে। এসবের দিকে নজর দেবার সময় কই? এ ধরনের তিনটে মন্দির আছে, সব ভাঙা। পুবদিকের দেয়াল ঘেঁষে বিরাট বকুলগাছ গজিয়েছে। চত্বরের সিমেন্ট ফেটে গিয়ে ঘাসে ছেয়ে গেছে। বুনোফুলের গন্ধ ভুরভুর করছে। সামনের ভাঙা দেওয়ালটার পাশে চমৎকার একটা সাদা ফুলগাছ আছে। বেশ বড়ো গাছটা, ফুলের নাম জানে না ও, অথচ ওর খুব প্রিয়। দেশাখ ছোটো ছোটো গুচ্ছ ফুলের এক থোকা পেড়ে ওর খোঁপায় গুঁজে দেয়। ফুলের মৃদু গন্ধ বিশাখাকে দুঃখের কথা ভুলিয়ে দেয়। ও ম্রিয়মাণ হতে থাকে। সব কিছুর আকর্ষণ আস্তে আস্তে কেমন নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। আজ বোধহয় আর দেশাখ আসবে না। ফিরেই যেতে হবে। হঠাৎ করে বিশাখার চোখ ছলছল করে। ও হাঁটুর ওপর মুখ গোঁজে এবং ঘাসের মাথা ছিঁড়ে দূরে ছুঁড়ে মারে। বেশ খানিকটা দূরে গাছের মাথায় তিনটে চিল উড়ে উড়ে কর্কশ শব্দে ডাকে। বিশাখার চিবুক বেয়ে জল গড়ায়।

তখন চত্বরের পেছনের ভাঙা দেয়াল টপকে দেশাখ ঢোকে। কাঁধের ওপর দু-জোড়া ঘুঘু, ফাঁদ পেতে ধরেছে। আসার পথে এক সজারুর পেছনে অনেকক্ষণ তাড়া করেছিল, কিন্তু মারতে পারেনি। সেজন্য আসতে দেরি হয়ে গেল। ও নিঃশব্দে বিশাখার পেছনে এসে দাঁড়ায়। আচমকা ঘুঘুর পাখা ঝাপটানির শব্দে ভয় পেয়ে পেছন ঘুরে দেশাখকে দেখেই জড়িয়ে ধরে। ঘুঘুর পায়ের আঁচড় লাগে ওর কপালে। পরমুহূর্তে নিজেকে সরিয়ে নেয় বিশাখা। ঘাড় থেকে ঘুঘু জোড়া নামাতে নামাতে দেশাখ বলে, 'দেখলেই ঝাঁপিয়ে পড়তে হয় বুঝি? একটুও তর সয় না?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

‘বুনো, জংলি।’

দেশাখ হো-হো করে হাসে। বিশাখা একটু দূরে দাঁড়িয়ে দাঁত কিড়মিড় করে।

‘ইস্, দেখি দেখি কপালে রক্ত বেরিয়েছে।’

‘না, দেখতে হবে না।’

বিশাখা দেয়ালের কাছে সরে যায়।

‘রাগ করলে তোমাকে খুব সুন্দর দেখায় কিন্তু।’

‘থাক, আর তোষামোদ করতে হবে না।’

‘ঠিক আছে এই আমি গম্ভীর হলাম, একটি কথাও বলব না।’

দেশাখ পিঠের ওপর থেকে তিরধনুকের বোঝা নামায়। অন্যসময় হলে এ কাজ বিশাখা করত। আজ ও চত্বরের আর এক পাশে বসে আঙুল কামড়াচ্ছে এবং আড়চোখে দেশাখকে দেখছে। দেশাখ গভীর মনোযোগে ঘুঘু দেখে, যেন আগে কোনোদিন এ পাখিটি দেখেনি। ওর মুখে কোনো ভাবান্তর নেই, ধরে নিয়েছে যে এখানে বিশাখা নেই। ফলে ভালোবাসা নেই এবং চুমু খাওয়াও নেই। আরও রাগ হয় বিশাখার। এখানে আর কিছুতেই থাকবে না, চলে যাবে। ভাঙা দেয়ালটা টপকে পেরুতে যাবে তখন দেশাখ এসে হাত ধরে।

‘ছাড়ো আমি চলে যাব।’

‘কিছুতেই না।’

‘তুমি একটা—’

‘কী বলো? থামলে কেন?’

‘তোমার সঙ্গে কথা বলব না।’

‘বলবে, বলবে। একশো বার বলবে। ওই সাদা ফুল সাক্ষী।’

দেশাখের বুকের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে বিশাখা ওর বুকের ধুকপুকানি শোনে। মুহূর্তে ওলটপালট হয়ে যায় সব অনুভূতি। দেশাখ ওর কড়ে আঙুল নিজের আঙুলে ঠেকিয়ে বলে, ‘ভাব?’

‘ভাব।’

‘দুজনে শব্দ করে হেসে ওঠে।’

‘এই বুকের খাঁচায় তুমি আমার ঘুঘু।’

‘না কক্ষনো না। আমি ঘুঘু হতে পারব না।’

‘তাহলে কী?’

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

‘তোমার তিরধনুক।’

‘ও বাবা একদম গোড়ায় হাত। ঠিক বলেছ তুমি। একদিকে আমার খাওয়া-পরা, অন্যদিকে প্রেম। দুটোই জরুরি। এমন সুন্দর কথা তুমি কী করে বললে বিশাখা? এখন তোমাকে কী উপহার দেই বলো তো?’

‘হুঁ চালাকি। সব বুঝি।’

‘কথা ওই একটাই। তোমাকে উপহার দিলে তা আমার ভাগেও আসে।’

দুজনে ঘাসের ওপর বসে পড়ে। দেশাখের মনে হয় ইদানীং বিশাখা বেশ একটু ভারী হয়েছে, চেহারায় লাবণ্য এসেছে, চোখে গভীর কালো স্নিগ্ধতা। বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকলে দৃষ্টি ছায়াচ্ছন্ন হয়ে আসে, ফিরে যেতে মন চায় না। বিশাখা ওই সাদা কেতু ফুলের মতো সুগন্ধীময় এবং পবিত্র, ও যেন সব মলিনতার ঊর্ধ্বে। দেশাখ ওর হাত নিজের মুঠিতে তুলে নেয়। পাতলা লম্বা আঙ্গুলগুলো চকচকে পাখির পালকের মতো পিচ্ছিল। আঙ্গুলগুলো মুখে পুরে মৃদু কামড় দেয় ও। বিশাখা চোখে চোখ রেখে হাসে। দেশাখের মনে হয় সাজে না কেন বিশাখা। সাজলে হয়তো ওকে অন্যরকম দেখাত। কানে কুণ্ডল, গলায় গুঞ্জারমালা, হাতে কেয়ূর ও শঙ্খবলয়, কটিদেশে মেখলা, পায়ে মল। কাঁচা হলুদে উজ্জ্বল হয়ে উঠবে গাত্রবর্ণ, চন্দনের গন্ধ আসবে মৃদু। আহ্ একদম নতুন মেয়ে হয়ে যাবে বিশাখা। তখন দেশাখ চিনতে ভুল করত, সংকোচে কথা বলত না। বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে থাকত ও। তখন বিশাখা নিজেই হেসে এগিয়ে আসত। গলা জড়িয়ে ধরে বলত, ‘আমি তোমার বিশাখা। আমায় চিনতে পারছ না?’

‘ও মা তুমি নিজে নিজে হাসছ কেন?’

দেশাখ জোরে হেসে বলে, ‘ভূতে পেয়েছে।’

‘যাহ্ সত্যি কথা বলো। কার কথা ভাবছ?’

‘বলব না।’

‘থাকগে বোলো না। আমিও শুনব না।’

‘বাবা আচ্ছা শক্ত মেয়ে তো! আমি ভেবেছিলাম গাল ফুলাবে, কাঁদবে, আমি বসে বসে মান ভাঙাব। দিলে তো সব মাটি করে।’

দেশাখ টান টান হয়ে ঘাসের ওপর শুয়ে পড়ে। কেতু গাছের ছায়া ওর সারা শরীরে। দুজনেই এই ফুলগাছটা ভালোবাসে। গন্ধ ওদের পাগল করে দেয়। বিশাখা দেশাখের চুলের গভীরে হাত ডোবায়।

‘এই গাছটার ফুল সাদা কেন দেশাখ?’

‘খারাপ কী?’

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

‘লাল হলে ভালো হত।’

‘আমি অত ভাবি না, যা আছে তাই আমার ভালো লাগে। যারা গীত লেখে তারা এইসব নিয়ে মাথা ঘামায়। ধরো এই কেতু ফুল গাছটা যদি গাছ না হয়ে বায হত তাহলে কি আমরা এখানে আসতাম?’

বিশাখা সে প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে কেবলই বলতে থাকে, ‘তুমি যাই বলো, ফুলগুলো লাল হলে আমার বেশি ভালো লাগত।’

‘ঠিক আছে বাপু, ঠিক আছে। পরজন্মে আমি লাল ফুল হয়ে তোমার জন্য এই গাছে ফুটব।’

‘তাহলে আমি কাকে ভালোবাসব?’

‘তাই তো? তুমি আর কারও হও এটা আমি চাই না। দরকার নেই ফুল হবার, জনম জনম তুমি আমার।’

দেশাখ বিশাখার ভালোবাসার পবিত্র ফুল হয়ে ওর সমস্ত শরীর ঢেকে দেয়। সে আবরণে বিশাখা এক অহংকারী মরালী, সরোবরে অনবরত ডানা ঝাপটায়, সে প্রকাশ অনাবিল আনন্দের বিহ্বলতা। কড়া রোদ কেতু ফুলের সমস্ত ডালপাতা ভেদ করে ওদের উত্তপ্ত করে দেয়। সময়ের কোনো হিসেব দু-জনের কেউই রাখে না। ওরা যখন একান্তে নিজেদের পায় তখন এমন করে ধরে রাখে সময়। ভুলে যায় অরণ্য, শিকার, ধানখেতে শামুক কুড়োনো। ভুলে যায় অভাব আর দারিদ্রের দাঁত খিঁচুনি। তখন ওদের আকাঙ্ক্ষা বনবন ছোটে, ছুটতে ছুটতে বন পেরোয়, নদী পেরোয়, পাহাড় পেরোয়। তখন বিশাখার কণ্ঠ বিজনে ঘুঘুর ডাকের মতো মাদকতায় ভরা। দেশাখ সে কণ্ঠস্বরের মায়াবী আকর্ষণে পথ ভোলে। তারপর জোড়া ঘুঘুর অস্থির পাখা ঝাপটানিতে দু-জনে ভাঙা বৌদ্ধ মন্দিরের চত্বরে ফিরে আসে।

‘দেখছ পাখিগুলো কেমন রেগে গেছে?’

‘বন্দি বলে আমাদের সুখ সইছে না।’

‘পাখি মারতে তোমার খারাপ লাগে না?’

‘একটুও না।’

বিশাখা ওর হাত দুটো ঠেলে দিয়ে সরে বসে। চেঁচিয়ে বলে, ‘একটুও না? কেমন নিষ্ঠুরের মতো কথা বলছ।’

‘নিষ্ঠুর কেন? ওকে না মারলে তো আমাকে মরতে হবে। ওকে মারি বলেই তো আমি বেঁচে আছি।’

বিশাখার মনটা হঠাৎ বিষণ্ণ হয়ে যায়। দেশাখের কথাগুলো ওর ভালো লাগে না। এতটা ক্রূরভাবে না বললেও পারত। ওর চেহারায় অন্যকিছু আঁচ করে দেশাখ আবার বলে, ‘পাখি আমি ভালোবাসি বিশাখা। জানো অনেকদিন গেছে যখন চমৎকার কোনো পাখি আমি মারতে পারিনি। কথা বলছ না

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যে?' দেশাখ ওকে কাছে টেনে নেয়। যেন ও এখুনি ওকে না জানিয়ে অন্য কোথাও উধাও হবে, খুঁজে পেতে দেশাখের কষ্টের শেষ থাকবে না। আর সে আশঙ্কায় ওর অনুভূতি শিউরে ওঠে। আদরে আদরে ভরিয়ে দেয় ওকে। কেতু ফুলের মাথা থেকে রোদ অনেক সরে গেছে। পুরো চত্বরে আশ্চর্য স্নিগ্ধতা।

'তোমার বাবা কেমন আছে বিশাখা?'

'বাবার অসুখ ভালো হচ্ছে না। বাবা বোধহয় বাঁচবে না।'

'মিছে ভাবছ, সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'মিছে নয়, সত্যি। মা রোজ কাঁদে। কবরেজের কাছে গেলে মুখটা যেন কেমন করে। মাঝে মাঝে আমার বাড়িতে থাকতে ভয় করে।'

'ভয় কেন? তোমার জন্য আমি তো আছি।'

'তুমি কত দিক সামলাবে? আচ্ছা দেশাখ আমরা এত গরিব কেন?'

দেশাখ তিক্ত কণ্ঠে বলে, 'আমরা গরিব বলেই তো রাজার গোলায় ধান। রাজদরবারে উৎসব। পথে জুড়িগাড়ির চটক।'

'আমরা কি কোনোদিন ধনী হতে পারব না? হাত ছড়িয়ে খেয়ে-পরে আমোদ করতে পারব না?'

'নিশ্চয় কোনোদিন পারব। তার জন্য চেষ্টা করতে হবে। তোমাকে আমি তিরধনুক চালাতে শেখাব বিশাখা।'

'সত্যি? তাহলে বেশ হবে, আমিও তোমার সঙ্গে শিকারে যাব।' বিশাখা উৎসাহে সোজা হয়ে বসে। 'কবে থেকে আমাকে শেখাবে? এসো আজ থেকে।'

ভাঙা বৌদ্ধ মন্দিরের চত্বর আজ অন্যরকম হয়ে যায়। ভালোবাসা শক্তিতে রূপান্তরিত হয়, শক্তি গৌরবে। দেশাখ বিশাখার হাতে হাত রেখে স্বপ্ন দেখে বিরাট এক ধনুক-বাহিনীর নেতৃত্ব দিচ্ছে ও।

শান্ত সন্ধ্যা, মন্দিরে আরতির ঘণ্টা বাজে। সুলেখা বারান্দায় বসে চুল আঁচড়ায়। ঘন চুলের রাশিতে চিরুনি ঢুকতে চায় না। গতকাল খড়িমাটি দিয়ে মাথা ধুয়েছিল, তাই চপচপে তেল দিয়ে চুল একদম ভিজিয়ে রাখে। আঁধার হয়ে গেছে সেদিকে খেয়াল নেই সুলেখার। যখন যে কাজে মন দেয় তখন অন্য সব কিছু ভুলে যেতে পারে ও। দেশাখ কুয়োতলায়, মনের আনন্দে গায়ে জল ঢালছ। একজোড়া ঘুঘু খাঁচায় পুরে রেখেছে ও। একটার চামড়া খুলে সুলেখাকে দিয়েছে রাতের রান্নার জন্য। রাতে রাঁধতে ইচ্ছা করে না ওর। কুপির আলোয় রান্নাঘরে কাজ করতে ভয় লাগে। সেজন্য ঝামেলা না থাকলে সব সময় বিকেলে রান্নাবান্না সেরে রাখে। যেহেতু দেশাখ বলেছে সেজন্য ঘুঘুটা এখনই রাঁধতে হবে। কাপড়ের পাড় ছেঁড়া সুতো দিয়ে টান টান করে চুলগুলো বাঁধে এবং খোঁপায় একটা কাঁঠালিচাপা গুঁজে দেয়। ফুলের গন্ধ নাকে নিয়ে ও রান্নাঘরে আসে। দেশাখ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কুয়োতলা থেকে চিৎকার করে, 'মুখ পোড়ানো ঝাল দিয়ে রেঁধো কিন্তু বউদি। তোমার ওই সাদা তরকারি হলে কিন্তু খাব না।'

সুলেখা রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে হাসতে হাসতে জবাব দেয়, 'শুধু মুখ পোড়াবে? বুক পোড়াবে না?'

'পোড়াইনি আবার? সে কম্ম কবে শেষ করেছি।'

'তাই নাকি? খবরটা দিও ভাই।'

রান্নাঘরের পেছনের আমগাছে বসে ভীষণ কর্কশ শব্দে কাক ডাকে একটা। সে শব্দে গা ছমছম করে ওর। ও ভয় কাটানোর জন্য আগুনের ওপর হাত রেখে গরম করে। দেশাখ ভিজে শরীরে ঘরে যায়। শোবার ঘর থেকে শ্বশুর সুলেখাকে ডাকে, 'ও বউমা কাকটা তাড়াও না। অলুক্ষণে কাকটা এই ভর-সাঁঝে কেন যে চেঁচায়।'

'আমার ভয় করছে বাবা। আমি পারব না।'

'ভয় করছে? কীসের ভয়?'

'কাকটা যেন কেমন করে তাকিয়ে আছে আমার দিকে।'

'কী যে বলো—'

'সত্যি বাবা, আমার ভীষণ ভয় করছে।'

বুড়ো আর কথা বলতে পারে না, প্রবল বেগে কাশে। দেশাখ বেরিয়ে আসে ঘর থেকে। মনে মনে বলে, 'বউদির যত আদিখ্যেতা। ঘরে থাকলে ভয় করে, লোক-দেখানো ভয়, কিন্তু বাইরে গেলে ভয় করে না, তখন অন্ধকারই বউদির ভয়ের বর্ম হয়।' তবু সুলেখাকে সামনাসামনি কিছু বলতে পারে না। জিজ্ঞেস করে, 'কীসে তোমার ভয় করছে বউদি?'

'ওই কাকটা কেমন বিশ্রি দ্যাখো না দেশাখ। যেন হাঁ-করে আমাকে দেখছে।'

দেশাখ হো-হো করে হাসে। হুসহুস শব্দ করতেই কাকটা উড়ে চলে যায়।

সুলেখা কথা না বলে রান্নাঘরে ঢোকে।

'ও কী বউদি চল যাচ্ছ যে? দেখলে না তোমার কাকটা কত বীর?'

'নাহ্ তোমার সঙ্গে কথা বলা যাবে না।'

'মা কোথায় বউদি?'

'ছুটকিদের বাড়ি বেড়াতে গেছে।'

'মা সারাদিন ঘুরতে পারে। কোথাও না গিয়ে দিন কাটে না তার।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

‘তা সারাদিন ঘরে বসে করবে কী?’

‘হ্যাঁ, তোমার মতো বউ যার, তার ঘরে না থাকলেও চলে। বাবা বোধহয় ঘুমোলেন আবার। তার তো আর কোনো কাজ নেই।’

‘ঘুমুবে না? কাশির জ্বালায় এমনিতেই ঘুম আসে না। এখন তো বাসক পাতার রসেও কাজ হচ্ছে না।’

‘আর কত কাজ হবে!’

‘তুমি সবার পেছনে লেগেছ কেন বলো তো?’

‘মোটেই লাগিনি। খোঁজখবর নিচ্ছি মাত্র।’

‘একদম উপযুক্ত ছেলে। শোনো, চাঙারিগুলো বানিয়ে রেখেছি। কালকে বিক্রি করতে নিয়ে যেও।’

‘আচ্ছা, এখন একটু ঘুরে আসি।’

‘কোথায় যাচ্ছ?’

‘ধনাদার দাবার আড্ডায়। কাল একবার ভানুমতীদের বাড়ি যাব। শুনেছ তো নাপিত ভানুমতির নখ কাটতে পারছে না।’

‘হ্যাঁ, শুনেছি। কী যে সব কাণ্ড!’

দেশাখ বেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে সুলেখার কেমন নিঃসঙ্গ লাগে। সারা বাড়িতে কেউ নেই, কেবল ঘরে রুগ্ন শ্বশুর। বাইরে সন্ধ্যা। মনের মধ্যে যন্ত্রণা। শুধু সুদাম একগুচ্ছ কার্পাস, ওর সঙ্গে থাকলে আনন্দের মুহূর্ত অন্ধকারে আকাশকুসুম হয়। আজ রাতে ওর সঙ্গে মিলন হবে। অভিসারে বেরুতে একটুও ভয় লাগে না, শুধু কাক দেখে ভয়। মনের মধ্যে যাবতীয় সংস্কার আনাগোনা করে। তাই সুদাম কেবল ক্ষণিকের আনন্দ, স্বস্তি নয়। যদি সুদাম ওর জীবনে চিরকালের হত? কাছে থাকত, পিঁড়ি পেতে খেতে বসত, আঁচল দিয়ে মুখ মুছত, যখন তখন আদর করত। কানে কানে কথা হত, কুয়োতলায় একসঙ্গে যেত, এখন কিছুই ভালো লাগে না সুলেখার। ভুসুকু ক্রমাগত নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে, স্মৃতি আর কতকাল থাকে?

যাবার পর পর যেমন একটা তীব্র ব্যাকুলতা ছিল, এখন আর সেটা নেই। এখন অবসরে মনে পড়ে, বুক ভার হয়, আবার তা কেটে যায়। সুলেখা একচক্কর উঠোনে হাঁটে, অবশেষে দেশাখের ঘুঘু নিয়ে রাঁধতে বসে। লোকী আর গুণী এসে ঢোকে। ওরা দুজনে শামুক কুড়োতে গিয়েছিল দেবল ভদ্রের ধানিজমিতে। ওই জমি পাহারা দেয় নিখিল। জোয়ান ছেলে, কালো কুচকুচে গায়ের রং, যখন তখন ঝকঝকে দাঁত বের করে হাসে। ধানখেতের আশেপাশে ছেলেমেয়েদের দেখলে লাঠি উঁচিয়ে তেড়ে আসে। ওরা দূরে দাঁড়িয়ে ভেংচি কাটলে ও রেগে যায়। লোকী আর গুনী দুজনে আজ ভারি খুশি। মনের সুখে শামুক কুড়িয়েছে। নিখিল ওদের তো কিছু বলেইনি উপরন্তু নিজেও ওদের আঁচল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভরে দিয়েছে। দু-জনেই শামুকগুলো ঢেলে দেয় রান্নাঘরের মেঝেতে।

'ইস্, অনেক পেয়েছিস তো?'

সুলেখার চোখ চকচক করে ওঠে। ভালো খাবার দেখলে দারুণ লোভ হয়। বহুদিন ওরা একসঙ্গে এত শামুক আনেনি।

'আজ ভীষণ মজা হয়েছে বউদি।'

ওরা দুজন হেসে গড়িয়ে পড়ে। হাসি আর থামতে চায় না। ওদের সর্ব অঙ্গে খুশির ঝিলিক। সুলেখা ওদের ধমকে ওঠে, 'ও মা কী হল? ভূতে পেল নাকি? হাসি থামা বলছি।'

'জানো বউদি নিখিল আজ আমাদের তাড়া করেনি। উঃ যা ভালো ভালো কথা বলছিল। নিখিল যে এত ভালো বুঝতেই পারিনি।'

সুলেখে ভুরু কুঁচকে তাকায়, 'কী কথা বলছিল রে? নিখিলের তো ভালো কথা বলার কথা নয়।'

'কী জানি কেমন কেমন যেন কথা। আর কেউ কোনোদিন এমন কথা বলেনি বউদি। শুনতে ভীষণ মজা লাগছিল।'

'তাই নাকি? বড়ো ডেঁপো হয়েছিস তো তোরা।'

'আমরা কিছু বলিনি। সব নিখিল বলছিল।'

'দাঁড়া দেশাখ এলে বলব।'

'কী বলবে? দোহাই বউদি দাদাকে কিছু বোলো না। আমরা নিখিলের সঙ্গে মোটেই কথা বলতে চাইনি। ও নিজেই যেচে কথা বলেছে। আমাদের কোনো দোষ নেই বউদি।'

লোকী গুণীর মুখ ভয়ে পাংশু হয়ে যায়।

'ঠিক তো?'

সুলেখা গম্ভীর হবার চেষ্টা করে।

'এই তোমাকে ছুঁয়ে বলছি।'

দুজনে একসঙ্গে সুলেখার গায়ে হাত দেয়।

'ঠিক আছে, যা হাত-মুখ ধো গিয়ে।'

দুজনে পালিয়ে বাঁচে। সুলেখা হেসে ফেলে। যত গম্ভীর হয়ে কথা বলুক আসলে ওর হাসি পাচ্ছিল। গিয়েছে সেই ভরদুপুরে, ফিরল সাঁঝে, নিশ্চয় কোথাও কিছু একটা করছিল। ও ওদের বয়স হিসেব করল মনে মনে। একজনের চোদ্দো আরেকজনের তেরো, দেখায় আরও কম। রোগা শরীরে বাড়বাড়ন্ত তেজ নেই। তবে চেহারা ফুলের মতো, তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছা করে। কে জানে কার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাগ্যে ওরা গিয়ে জুটবে, তবে ওর মতো ভাগ্য যেন ওদের না হয়। ও এসব চিন্তা ঝেড়ে ফেলে শামুক গোছাতে ব্যস্ত হয়ে যায়। ক-দিন ভালোই চলবে। কাল সকালে নদীর ধারে গিয়ে দু-একটা মাছ বা কাঁকড়া পেলে মন্দ হবে না। কাগনি ধানের ভাতের সঙ্গে দারুণ লাগে।

এদিকে কুয়োতলায় দু-বোনে ফিসফিস করে।

'নিখিল খুব মজার লোক না রে?'

'খুব।' গুণী চটপট জবাব দেয়। 'যা হাসাচ্ছিল আমদের, হাসতে হাসতে পেট ব্যথা হয়ে গেছে। মা গো ভাবলে কেমন জানি লাগে।'

'এই গুণী, নিখিল কিন্তু তোকে বেশি কাতুকুতু দিচ্ছিল।'

গুণী সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করে, 'যাহ্ আমাকে না তোকে। তুই যে বড়ো।'

'মোটেই না।'

'ঠিক আছে সমান সমান।'

'নিখিল আজ আমাদের সঙ্গে অমন ব্যবহার করল কেন রে?'

'কী জানি।'

'আমাদেরকে বোধহয় ভালো লেগেছে।'

'হবে হয়তো।'

'লোকী, আমরা আবার নিখিলের কাছে যাব।'

'হ্যাঁ যাব। শামুক না দিলেও যাব। শোন গুণী, এরপর গেলে বউদির কাছে বলব না কিন্তু, বউদি আবার দাদাকে বলে দেবে।'

'ঠিক, এবার থেকে আমরা লুকিয়ে যাব।'

'তুই কিন্তু বড্ড হাসিস গুণী। এত হাসি ভালো না।'

'আমি তোর মতো গম্ভীর হয়ে থাকতে পারি না।'

'কখনো থাকতে হয়। নইলে লোক পেয়ে বসে।'

'নিখিল তোকে বেশি আদর করছিল লোকী।'

'যাহ্ কী যে বলিস।'

দুজনে কুয়োর ঠান্ডা পানিতে ঝপঝপ হাত-মুখ ধোয়। দু-জনের মধ্যে একটা নতুন বোধ, সুখ সুখ ইচ্ছে। এর আগে কেউ কোনোদিন কাউকে ছেড়ে কোথাও যায়নি, সবসময় একসঙ্গে ঘোরে। আজ লোকী ভাবল, 'গুণীকে ফাঁকি দিয়ে একদিন একলা একলা নিখিলের কাছে যাব।' গুণী ভাবল,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'লোকীটার একদিন খুব অসুখ করুক, একা একা নিখিলের কাছে যাব।'

ভানুমতীর বাড়িতে পড়ার লোক জড়ো হয়ে গেছে। ভিন-গাঁ থেকে এসেছে অন্যান্য আত্মীয়স্বজন। একদিকে মেয়েকে নিয়ে এই যন্ত্রনা, অন্যদিকে এত অতিথিদের খাওয়াবে কী? মনে মনে ভগবানের কাছে মরণ চায় ভানুমতির মা হরিদাসী। গত দু-দিন ধরে ভানুমতী অসুস্থ, যতবারই নাপিত ওর হাত এবং পায়ের নখ কাটতে যায় ততবারই ও প্রচণ্ড যন্ত্রণায় চিৎকার করে মাটিতে গড়াগড়ি যায়। জন্মের পর থেকে কেউ ওর হাত-পায়ের নখ কাটতে পারেনি। এখন ওর বয়স আট, নখ বেড়ে এত বড়ো হয়েছে যে, চলাফেরা করাই মুশকিল হয়ে গেছে। শরীরেও ব্যথাবেদনা লেগে থাকে। ভানুমতির জন্মের আগে ওর মা-র তিনটি সন্তান জন্মের পর পরই মারা যায়। চতুর্থবার হরিদাসীর প্রসববেদনা ওঠার আগেই ওর শাশুড়ি অনেক কষ্টে কুকুরের দুধ জোগাড় করে রাখে। একজন কবরেজ তাকে বলেছিল নবজাতকের মুখে একফোঁটা কুকুরের দুধ দিলে শিশু মরবে না। ঠাকুরমার দেয়া কুকুরের দুধ খাবার পর থেকেই ভানুমতীর নখগুলো কালো হয়ে যায় এবং অস্বাভাবিকভাবে বাড়তে থাকে। ওঝা-বৈদ্যি কম দেখানো হয়নি, কিন্তু কিছুই হচ্ছে না।

শেষে হরিদাসী ঠিক করে যে যত কষ্টই হোক মেয়ের, নাপিত দিয়ে নখগুলো কেটে ফেলা হবে। কিন্তু ওর চিৎকারে সবার চোখ ভিজে ওঠে। নাপিত হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকে। কী করবে কেউ কিছু বুঝতে পারে না।

মাধব বলে, 'ওর হাতটা একটা কাঠের ওপর রেখে কুড়োল দিয়ে এক কোপে নখগুলো কেটে ফেলা হোক।' সুরেশ মাথা নাড়ে, 'না এটা ঠিক হবে না। তার চেয়ে ও ঘুমিয়ে থাকলে—'

'সে চেষ্টাও হয়েছে। কিন্তু ধরলেই ও চিৎকার করে জেগে যায়।'

ঠিক সেসময় ভানুমতী উঠে দাঁড়ায় এবং হিংস্র চোখে সবার দিকে তাকিয়ে থাকে। সে দৃষ্টি দেখে উপস্থিত লোকেরা ভয় পায়। হরিদাসী এসে মেয়ের সামনে দাঁড়ায়, 'চল ঘরে যাবি? খিদে পেয়েছে?' মায়ের কথা শুনে ওর চোখ থেকে টপটপিয়ে জল পড়ে। তা দেখে কুসুম চেঁচিয়ে বলে, 'দরকার নেই নখ কাটার। ও যেমন আছে তেমনই থাকুক।' উপস্থিত সবাই সে-কথা মানতে পারে না। তাদের ধারণা এমন অশুভ নখ নিয়ে ওকে আর থাকতে দেয়া উচিত নয়, গাঁয়ের অমঙ্গল হতে পারে। আশঙ্কায় বুক কাঁপে হরিদাসীর। মেয়ের বাবা সেই যে রোজগারের আশায় বেরিয়ে গেল, আর ফিরল না, তাও তো বছর তিনেক হয়েছে। সামনের বৈশাখে চার বছর হবে। হরিদাসীর দিন আর কাটতে চায় না। ভানুমতী পা ঝুলিয়ে বারান্দায় বসে থাকে। নাপিত বলে, 'আমি আজ চলে যাই।'

'তাই যাও বাবা। কাল আবার এসো। দেখি যদি কিছু করা যায়।'

একে একে চলে যায় অন্যরাও। হরিদাসী অতিথিদের রান্নার জন্য চাল চাইতে যায় পাশের ঘরে। ওর বড়ো বোন এককাঁদি কাঁচা কলা এনেছিল, তার কিছু আছে। কাঁচা কলার ভর্তা আর নটে শাক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভেজে ভাত দেবে অতিথিদের।

মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছে ভৈরবী, ঘরে একমুঠো চাল নেই। বিকেলে দুধ বেচতে গেছে ধনশ্রী, এখনও ফেরেনি। এদিকে বাড়ি অতিথি এসেছে, কী যে করবে কিছুই বুঝতে পারছেন না ভৈরবী। নিজের শরীরটা ভালো নেই, পেটের ভেতর বাচ্চাটা অনবরত নড়ে, বেশি নড়লে ভৈরবী কেমন অসুস্থ বোধ করে, তখন কেবল শুয়ে থাকতে ইচ্ছে হয়। বড়ো ছেলে পলাকে পাঠিয়েছে ধনশ্রীর খোঁজে। ও এখনও ফেরেনি। ঘরে সজারুর মাংস আছে। ধনশ্রী খুব শখ করে ভৈরবীর জন্য এনেছে, ও খায়নি। পেটে বাচ্চা নিয়ে সজারুর মাংস খেলে বাচ্চা সজারুর মতো ভিতু হয়। বড়ো হলে সাহসী হয় না, শিকার করতে পারে না, যুদ্ধে যেতে চায় না। ভৈরবী মনে মনে ভাবল, এমন ছেলে জন্ম দেয়ার চাইতে না দেয়াই ভালো। ছোটো ছেলে লালা ঘরের মেঝেয় শুয়ে ঘুমুচ্ছে, বুকের হাড় ক-খানা স্পষ্ট দেখা যায় শুধু, নিশ্বাসে তা উঠছে আর নামছে। ভৈরবীর ইচ্ছা করে ছেলেটাকে বুকে জড়িয়ে শুয়ে থাকতে, তখনই পলা আসে।

'মা, বাবা না দাবার আসরে বসেছে।'

'দাবার আসর? দুধ কী হল?'

'দুধ অমনি পড়ে আছে। বাবাকে কত ডাকলাম, উলটো আমাকে বকা দিল।'

'বললি না তোর সনকা কাকু এসেছে।'

'বললাম তো, বাবা কিছু বলল না। কেবলই দাবার চাল গুনছে।'

'যা তুই খেল গে।'

এই এক অভ্যেস ধনশ্রীর, দাবার আসরে বসলে বিশ্বসংসার ভুলে যায়। বিভূতির বাড়ির সামনে বিরাট আম গাছের নীচে মাচার ওপর রোজ দাবা খেলা বসে, বুড়োরাই বেশি খেলে। কারও কোনো কাজ নেই, কেউ কিছু করতে পারে না, শুধু দাবার চাল গুনে গুনে ক-টা দিন পার করতে চায়। অথচ ওরা যখন খেলে বিশ্বসংসার ভুলে যায়। তখন মনে হয় না কেবলমাত্র ক-টা দিন পার করে দেয়ার জন্যই ওরা একটা অবলম্বন খুঁজে নিয়েছে। একবার চক্রধী আর সাধন পাক্কা ছয়দিন এক জায়গায় বসেছিল। কেউ কাউকে মাত করতে পারে না, ফলে ওঠেও না, শেষে পাড়ার লোক এসে খেলা ভেঙে দিয়ে দুজনকে উঠিয়ে দেয়। ধনশ্রী অবশ্য বেশিক্ষণ খেলে না, কিন্তু বসলে আর কোনোদিকে ফিরে তাকায় না। ভৈরবী প্রথম প্রথম রাগ করত, এখন আর রাগে না, রেগে কোনো লাভ হয় না। ধনশ্রী প্রতিদিন যেমন তেমনই। সংসারে খুব আসক্তি নেই, আবার অনাসক্তিও নেই, যেনতেন চললেই ধনশ্রী খুশি।

'পলা, যা দুধের ভাঁড়টা নিয়ে আয়।'

'এনে কী হবে?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

‘দেখি আমি কী করতে পারি।’

পলা কথা না বলে আবার বেরিয়ে যায়। ভীষণ চঞ্চল ছেলে, কখনো হাঁটে না, দৌড়ুতে থাকে। ভৈরবী জানালার কাছে এসে বসে। পলা লাফিয়ে লাফিয়ে চলে যাচ্ছে। ওর ছোটো শরীর আরেকটা টিলার আড়ালে চলে যায়। দূরের বাড়িগুলো ছবির মতো, বিকেল প্রায় শেষ, একটু পর সন্ধ্যা হবে। মাত করতে না পারলে কিংবা না হারলে মিটমিটে আলোয় খেলেই যাবে ধনশ্রী। বউ ছেলে অতিথি কারও কথা মনে করেই উঠবে না। কেউ হাত ধরে টেনে উঠিয়ে দিলে উঠবে, দেখবে তখন মধ্যরাত, সব পাখির ডাক থেমে গেছে। ভৈরবীর বুক কেমন করে, কোথাও যেতে ইচ্ছা করে, কোথায় নিজেও জানে না। কখনো মনে হয় ওই দূরের বনে, কখনো ডোম্বির নৌকায় চড়ে নতুন কোনো জায়গায়। পেটের ভেতরে আবার নড়াচড়া, ভৈরবী চমকে ওঠে, যেন ছিড়েখুঁড়ে বেরিয়ে আসতে চায়, বেরিয়ে আসার জন্যে ছটফট করছে। নিজেকে সামলে নেয়, মুখে একদলা থুতু উঠে আসে, এবার যেন একটু বেশি খারাপ লাগছে। আগে এমন হয়নি। ভৈরবী জোরে জোরে শ্বাস নেয়, বাতাসে মহুয়ার গন্ধ টের পায়। মনে হয় এখন ধনশ্রী পাশে থাকলে সময় এমন বিষণ্ণ থাকত না, হয়তো অন্যরকম হত। ও গালে হাত দিয়ে তাকিয়ে থাকে।

‘মা, নাও। বাবা টেরই পায়নি যে আমি এটা নিয়ে এলাম।’

‘খেলতে বসলে কি তোর বাবার হুঁশ থাকে?’

‘আচ্ছা মা, বাবা কেমন করে সব কথা ভুলে যায়? তুমি তো কিছু ভোলো না।’

ভৈরবী কিছু না বলে হাসে।

‘বড়ো হলে আমিও বাবার মতো হব। ভুলে যাওয়া বড্ড মজা।’

‘কে বলেছে?’

‘কেউ বলেনি। আমি জানি।’

‘পাগল।’ ভৈরবী ছেলের মাথায় হাত বুলোয়। ‘তুই ঘরে থাক পলা, লালাকে দেখবি, আমি এক্ষুনি আসব।’

‘আমার ভয় করে মা।’

‘কিছু ভয় নেই সোনা। আমি যাব আর আসব।’

ভৈরবী দুধের ভাঁড় নিয়ে বেরিয়ে যায়। প্রসবের সময় বেশি নেই, ভার শরীর নিয়ে তাড়াতাড়ি হাঁটতে পারে না। পা শিথিল হয়ে যায়, চলতে চায় না। কোনোমতে কামোদের দোকানে আসে, দোকানে ক্রেতা নেই। কামোদ নিজের মনে হিসেব কষে।

‘কামোদদা?’

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

‘বুঝেছি। অতিথি এসেছে তো?’

‘না বললেই সব বোঝো। এমন বোঝো বলেই তো বেঁচে আছি।’

কামোদ চোখ বড়ো করে বলে, ‘সত্যি কি আমি তোমাকে বাঁচিয়ে রেখেছি ভৈরবী?’

ভৈরবী অন্য প্রসঙ্গে গিয়ে বলে, ‘এই দুধটা রেখে কিছু চাল দাও।’

‘দুধ কে খাবে?’

‘তুমি?’

‘আমি কেন দুধ খাব? আমার কি অসুখ করেছে?’

‘এত কথা ভালো লাগে না কামোদদা। ঘরে ছেলেরা একলা, তাড়াতাড়ি দাও।’

‘যদি না দেই?’

‘ইস কী শুরু করলে। আমি জানি তুমি রোজ দুধ খাও। ঘরে দুধ না থাকলে তুমি বউদির সঙ্গে রাগারাগি করো।’

‘আজ থেকে আর খাব না।’

‘তোমার পায়ে পড়ি কামোদদা। একটু পরে অতিথিরা ঘরে ফিরবে। রান্না না হলে কী লজ্জা পাব।’

‘এমন করে সংসার করতে তোমার রাগ হয় না ভৈরবী?’

কামোদের গম্ভীর কণ্ঠ ভৈরবীর কানে খট করে বাজে। কথা না বলে চুপ করে থাকে। কামোদও আর কথা বাড়ায় না। ছোটো একটা হাঁড়ি এগিয়ে দেয়, ‘এর মধ্যে ঢেলে দাও।’

ভৈরবী দুধ ঢেলে দেয়, হাত কাঁপে, ছিটকে পড়ে দুধ।

‘তোমার শরীর দুর্বল হয়ে গেছে।’

‘কী করব বলো।’

ভৈরবী মাথা নীচু করে রাখে। কক-কক শব্দে একটা পাখি উড়ে যায় মাথার ওপর দিয়ে। কামোদ চাল মেপে দিলে ও আর একটি কথাও বলে না, পোঁটলাটা বুকের কাছে ধরে ফিরে যায়। দিনেরবেলা হলে নদীর ধার থেকে হেলেঞ্চা নিয়ে আসত, এখন সে উপায় নেই। সজারুর মাংসের সঙ্গে অনেক কাঁচামরিচ দিয়ে শাক ভেজে দিতে পারত অতিথিকে। এই দিতে না পারার জন্য ওর মনখারাপ হয়ে যায়। ধনশ্রী শাকপাতাই বেশি পছন্দ করে, মাংস খুব একটা খেতে চায় না। আয়োজনের সামর্থ নেই, তবু ভৈরবীর কত কী রাঁধতে সাধ হয়। রান্নার মতো সুখ আর কিছুতে নেই, ভাবতে ভাবতে ঘরে এসে পৌঁছোয় ও।

ভৈরবী চলে যাবার পর কামোদের হিসেবে ভুল হয়, কিছুতেই আর মন বসে না। ছোটোবেলায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভৈরবীর সঙ্গে খুব ভাব ছিল। ওরা দুজনে অনেক ঘুরেছে টিলা থেকে টিলায়, বনেজঙ্গলে রান্নাবাড়ি খেলেছে, ফুল কুড়িয়েছে। সেসব কথা এখন মনে রাখেনি ভৈরবী, নয় বছর বয়সে ওর বিয়ে হয়ে যায়। ভৈরবীর বিয়ের দিন লুকিয়ে লুকিয়ে কেঁদেছিল ও, খুব কষ্ট হচ্ছিল। কাউকে কিছু বলতে পারেনি। ভৈরবী বড়ো ভালো, ওর বউ হলে বেশ হত, দু-জনে হাসিখুশিতে সংসার করত। তপতী ওকে বড্ড জ্বালাতন করে, সংসারে অভাব তপতির সহ্য হয় না। অকারণে কামোদের ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে, যা-তা বলে চিৎকার করে গালাগালি করে, মুখে কোনো কথা আটকায় না। তপতী কেন ভৈরবী হয় না? ভৈরবীর মতো শান্ত সুবোধ ধৈর্যশীলা। স্বামীর ভালোবাসায় যার অগাধ বিশ্বাস। সব আচরণে অকুণ্ঠ সমর্থন। কামোদের মাথা ঝিমঝিম করে। দোকানের কেনা-বেচা ভালো লাগে না। ও ঝাঁপ আটকিয়ে ভেতরে চলে যায়।

অতিথি খাইয়ে, ছেলেদের ঘুম পাড়িয়ে রাত জেগে বসে থাকে ভৈরবী। ধনশ্রীর ফেরার নাম নেই। রাত কত হল কে জানে, চারদিকে সাড়া নেই। কিছুক্ষণ আগেও হঠাৎ হঠাৎ মানুষের গলা পাওয়া গেছে, এখন সেটাও বন্ধ। চাঁচর বেড়ার গায়ের ওপর চাঁদের আলোর লুটোপুটি, আকাশে মেঘ নেই একটুও। দোরগোড়ায় বসে থাকে ও, ঘুম আসে না। শরীর যতই খারাপ লাগুক ধনশ্রী না এলে কিছুতেই ঘুম আসবে না। এটা একটা অভ্যেস হয়ে গেছে। ধনশ্রীর সঙ্গে ওর বয়সের ব্যবধান ষোলো বছরের মতো, কিন্তু কোনো বিরোধ নেই। ধনশ্রী অসম্ভব ভালো। ভৈরবীও নিজে থেকেই সুখ সৃষ্টি করে নিয়েছে। তবু মাঝে মাঝে কেমন নিঃসঙ্গ লাগে, কামোদের কথা মনে হয়। ছোটোবেলায় ওকে ছাড়া কামোদের চলত না। সব খেলার সাথিদের বাদ দিয়ে ওর সঙ্গে খেলতে চাইত সারাক্ষণ। ওর সঙ্গে কত উজ্জ্বল মুহূর্ত কাটিয়েছে। সেইসব স্মৃতিকে ভৈরবী এখন ভয় পায়। কখনোই ট্রাঙ্কে গাদানো কাপড়ের মতো ভাদ্রের রোদে মেলে ধরে না। সংগোপনে জমিয়ে রেখেছে। ধনশ্রী ওকে ভীষণ ভালোবাসে, বিশ্বাস করে, ওকে ছাড়া চলতে পারে না এক মুহূর্তও। কোনোদিন অবহেলা করেনি, অকারণে রাগারাগি করেনি, সেইজন্যে ধনশ্রীর গণ্ডির বাইরে যেতে পারে না ভৈরবী। মনটা এদিক ওদিক করলেও আবার লক্ষ্মী ছেলের মতো ফিরে আসে আপন জায়গায়। ধনশ্রীর যা একটাই দোষ, দাবা খেলতে বসলে সব কথা ভুলে যায়, তার জন্যে রাগ নেই ভৈরবীর। যা কিছু প্রতিকূল তাকে মেনে নেয়াই ওর স্বভাব। বিরোধ এড়ানোই ওর কাম্য। শ্মশান থেকে শেয়ালের ডাক আসছে, কোনো করুণ কান্নার বিলাপধ্বনি একটানা আসতেই থাকে। বুকটা কেমন করে ভৈরবীর। কামোদের কথা মনে হয়। সংসারে কামোদের কোনো সুখ নেই, তপতী যন্ত্রনা দেয়। দূর ছাই, কামোদের জন্য কী দায় পড়েছে। যত্তসব বাজে ভাবনা। ওর ছেলে আছে, স্বামী আছে, সংসার আছে। চাঁচর বেড়ার বাড়ি আছে। বাড়ির সামনে লাউয়ের ঝাপ আছে, কচি লাউয়ের ডগায় সাদা ফুল—বিশাল প্রশান্তি। আর কিছু চায় না ভৈরবী। আর তখুনি ধনশ্রীর উঁচুকণ্ঠের গান শুনতে পায় ও। রাতে একলা পথ চলতে হলে এমনি করে গান গাইতে গাইতে আসে ধনশ্রী। নইলে নাকি গা ছমছম করে। গান ওকে সঙ্গে দেয়, নিজেকে একলা মনে হয় না।

দোরগোড়ায় ভৈরবী দেখে অপ্রস্তুত হয়ে যায় ধনশ্রী। ধপ করে ওর পাশে বসে পড়ে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

‘এখনও জেগে আছ বউ? খাওনি তো?’

ভৈরবী মাথা নাড়ে। ধনশ্রী মাথাটা ওর ঘাড়ে ঘঁষে নেয়।

‘খেলতে বসলে সব ভুলে যাই বউ। রাগ করেছ?’

‘না।’

‘সত্যি?’

ধনশ্রী ভৈরবীকে বুকে জড়িয়ে চুমু খায়।

‘লক্ষ্মী বউ, সোনা বউ। আজ শরীরটা কেমন?’

‘ভালো। জানো মনে হয় সময় আর বেশি নেই।’

‘এবার একটা মেয়ে হলে ভালোই হয়।’

ধনশ্রী গদগদ স্বরে কথা বলে। আবেগে গলা জড়িয়ে আসে।

‘খাবে না? চলো? ঘুম পেয়েছে।’

দুজনে উঠে ঘরে আসে। হরিণের চামড়ার আসনটা ধনশ্রী বিছিয়ে নেয়। কলসি থেকে জল ঢালে। ভৈরবী ঠান্ডা ভাত বাড়ে মাটির বাসনে, সজারুর মাংস তুলে দেয় ধনশ্রীর পাতে। হাঁড়িয়া এনে সামনে রাখে। ধনশ্রীর খাওয়া হলে সেই বাসনে নিজের ভাত মাখিয়ে নেয়। ঢকঢক করে হাঁড়িয়া খেয়ে ভৈরবীকে বুকে জড়িয়ে ঘুমোয় ধনশ্রী, কিন্তু ঘুম আসে না ভৈরবীর। ধনশ্রীর বুকের উত্তাপও ঠান্ডা হয়ে যায়। অন্ধকারে চোখ মেলে কান পেতে থাকে। যদি কোনো সুকণ্ঠী পাখির ডাক শোনা যায়। সেই শৈশবের স্মৃতির মতো। হঠাৎ মনে হয় তপতী কেন ভালো মেয়ে হয় না। না, জীবনকে জটিল করে তোলার কোনো ইচ্ছে ওর নেই। বিশেষ করে ধনশ্রীর মতো সহজ সরল লোকের সঙ্গে যার বিয়ে হয়েছে। ভৈরবী ঘুমিয়ে পড়ার চেষ্টা করে। না, ওর কোনো দ্বিতীয় ভুবন নেই। ভৈরবী এক এবং অভিন্ন থাকতে চায়।

শিল্পিত প্রসাধন নিয়ে রাতের এক প্রহর পার করে দেয় শবরী। কাহ্নুপাদ আসে না, অপেক্ষায় অপেক্ষায় শিথিল গুঞ্জার মালা, ময়ূর-পালক। একসময় সব কিছু টান দিয়ে কুটিকুটি করে ফেলে ও। লক্ষ্মীবিলাস শাড়ি মেঝেতে গড়ায়, কত যত্ন করে পরেছিল। অনেকক্ষণ সময় নিয়ে চন্দনের ফোঁটায় নিজেকে সাজিয়েছিল। পায়ের পাতা থেকে শুরু করে মেজাজটা রাগতে রাগতে ক্রমাগত ওপরের দিকে ওঠে। ইচ্ছে করেই পায়ে আজ নূপুর পরেনি শবরী। মনে করেছিল কাহ্নুপাদের কাছে আজকের অভিসার হবে শব্দহীন। শব্দের একটা চমক আছে, মনের মধ্যে ময়ূর-নৃত্যের আমেজ আনে। শব্দহীন হলে কেমন লাগে সেটাই আজ অনুভব করতে চেয়েছিল ও। সারা দিনের আয়োজন যেন ব্যঙ্গ করছে শবরীকে। রাত্রি দু-প্রহরও শেষ হয়, তবু আসে না কাহ্নুপাদ। শবরীর বিবাহিত জীবনে এমন আর কোনোদিন হয়নি। সারা দিন যেখানেই থাকুক না কেন সন্ধ্যার সময়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঠিক ঠিক ঘরে ফেরে। কেবল রাজসভায় গীত পড়ার দিন ফেরেনি। বলেছিল, সারারাত মাঠে শুয়েছিল। মরে যেতে ইচ্ছে করছিল দেখে ঘরে ফেরেনি। সেটাই বিশ্বাস করেছিল শবরী কিন্তু আজ কী হল? আজ কেন ঘরে ফিরল না কানু? চাঁচর বেড়ার আগল বন্ধ করে শুয়ে পড়ে। ধাতুর খাটে একা। লক্ষ্মীবিলাস শাড়ি শবরীর যত্ন থেকে বঞ্চিত হয়। বাইরে প্রবল হাওয়া এদিক ওদিক ছোটে। চাঁচর বেড়ার সঙ্গে তার শর্তহীন ইয়ার্কি।

শেষ রাতের কিছু আগে ঘরে ফিরে আসে কাহ্নুপাদ।

শবরী আজ প্রতীক্ষায় উন্মুখ হয়ে নেই। টিলার গায়ে হাঁড়িয়ার গন্ধ নেই। কিছুতেই আগল খোলে না শবরী। এমনটি হবে জানা ছিল কাহ্নুপাদের, এখন সাধ্যসাধনা করে শবরীর মান ভাঙাতে হবে। দেবকির ঘরে আজ অনেক মদ খেয়েছে কাহ্নুপাদ। নেশায় বুঁদ হয়েছিল, ভাগ্য আজ ওর অনুকূলে কাজ করেছে। রামক্রী ছিল না বলে দেবকী যত্ন করেছে অনেক। রামক্রী পাঁচ ক্রোশ দূরে মামার বাড়িতে গিয়েছে। দরজার ওপর সাংকেতিক চিহ্ন এঁকে দিয়েছিল দেবকী। ঘরে কাহ্নুপাদ একা খদ্দের। ওর আকাঙ্ক্ষাকে আজ ও বাধা দেয়নি। কিন্তু সীমা টানা আছে দেবকীর। সে দাগের এক পা এপাশে আসতে দেয় না কাউকে। দোকানের সামনে দিয়ে ঘরে ফেরার সময় নিজেই ডেকেছিল কাহ্নুপাদকে। হেসেছিল অকারণ উচ্ছ্বাসে, ইঙ্গিতও ছিল সে হাসিতে।

'যাচ্ছ কোথায়?'

'যাব আর কোন চুলোয়, ঘরে যাচ্ছি। তা ভর-সন্ধ্যায় ডাকছ কেন?'

'বসবে নাকি?'

'অনুমতি দিলে ঘরে ফিরবে কোন শালা?'

'এসো।'

দেবকীর হাসিতে বুকটা তোলপাড় করে উঠেছিল। শবরীর কথা মনে ছিল না ঠিক সেই মুহূর্তে। তারপর দেবকী সাংকেতিক চিহ্নটা খুলে নিয়েছিল দরজা থেকে।

'ও কী, সন্ধ্যাতেই দোকান বন্ধ করে দিলে?'

'দেই যাতে কেউ বিরক্ত না করে।'

'তার মানে আজ আমি একলা?'

'কোনোদিন নাকি তোমার নেশা জমাতে পারি না, আজ নেশা জমিয়ে দেব।'

ভীষণ নেশা জমিয়েছিল দেবকী, সব ভুলিয়ে দিয়েছিল। আধো-অন্ধকার ঘর, মিটমিটে আলোতে দীর্ঘ ছায়া কাঁপে। দেবকী রহস্যময়ী নারী। মোমের মতো নরম শরীর, হাতে বেলের খোলে পানীয়। সে-মুহূর্তে কাহ্নুপাদ একজন চিত্রশিল্পী হয়ে গিয়েছিল। ও যেন একমনে এঁকে যাচ্ছে জীবনের শ্রেষ্ঠ ছবি। দ্রুত ওর মগজে স্পষ্ট হয়ে ওঠে নীলাভ দেবকী, পরনে সাদা শাড়ি, খোঁপায় জুঁই ফুলের মালা,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পটভূমিতে আলো-আঁধারি রাত্রি। ওর মনে হয়েছিল ওর চোদ্দোপুরুষের জনম সার্থক হয়ে গেল। এখন ওর সামনে সৃষ্টির দুয়ারই খোলা। এজন্যই শবরীর কথা ভুলে গিয়েছিল ও। হয়তো এমনটি হওয়া উচিত হয়নি, ও ভাবল এবং নিজেকে শাসন রাখে এই বলে যে একজীবনে সব উচিত না বলে অনেক কিছু থেকে বঞ্চিত হতে হয়। গুঞ্জার মালা, ময়ূর-পালক তো উপলক্ষ্য মাত্র, ভালোবাসাই সব। ভালোবাসাই তো সব সৌন্দর্যের দরজা খুলে দেয়। এ সত্য কাহ্নুপাদের চাইতে কে আর বেশি জানে। তবু এমনটি হয়েছে। ও উপেক্ষা করতে পারেনি। তার জন্য ওর কোনো গ্লানি নেই। শবরী বিমুখ হয়েছে, দরজা বন্ধ, হাজার ডাকলেও খুলবে না। ও পেছন ফিরে দাঁড়ায়। এখন আর কোনো নেশা নেই কাহ্নুপাদের। শুধু দেবকীর সঙ্গ উপলব্ধি করে কাহ্নুপাদের শরীর ঝাঁকিয়ে ওঠে। ও টিলা বেয়ে নামতে থাকে। শবরীর দরজা আজ বন্ধই থাক। চারপাশে তাকায় ও, রাত বেশি নেই। কাহ্নুপাদ মাথাটা ঝাঁকিয়ে নেয়, আর কোনো স্নায়ুর চাপ নেই। বেশ ঝরঝরে লাগছে। গান গাইতে ইচ্ছা করে কাহ্নুপাদের, কিন্তু কিছু মনে আসে না। কোথায় যাবে ও? একটাই জায়গা আছে তা হল মল্লারীর ঘর। গোটা পল্লি একটা সমুদ্র, তার মধ্যে মল্লারীর ঘর সবুজ দ্বীপ, অনবরত হাতছানি দেয়। মল্লারীর সামনে দাঁড়ালে কোনো গ্লানি হয় না, কোনো অপরাধবোধও কাজ করে না। চাঁদের আলোয় পিপুল গাছের দীর্ঘ ছায়া মাটির বুকে চমৎকার আলপনা। কাহ্নুপাদ দাঁড়িয়ে দেখতে থাকে।

তখনই ডোম্বির ঘর থেকে একজন লোক বেরিয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে যায়। রাত আর বেশি নাকি নেই। দাঁড়াবে না ফিরে যাবে ভাবার ফাঁকে ডোম্বি বের হয় ঘর থেকে। ঘাড়ে গামছা, হাতে ঘড়া। কাহ্নুপাদ এগিয়ে গিয়ে সামনে দাঁড়ায়। চমকে ওঠে ডোম্বি। অপ্রস্তুতের হাসি হাসে। চট করে নিজেকে সামলে নেয়।

'তুমি? কী যে ভাগ্য আমার।'

'কোথায় যাচ্ছ?'

'একটা ডুব দিয়ে আসি। সারারাত যা গরম গেল। একটুও ঘুমুতে পারিনি।' মিথ্যা বলতে গিয়ে বুক কেঁপে ওঠে। কাহ্নুপাদের সামনে সত্যি কথা বলার সাহস নেই ডোম্বির। সঙ্গে সঙ্গে ও কাহ্নুপাদের পায়ের কাছে বসে পড়ে পায়ের ওপর হাত রাখে।

'তুমি রাগ কোন্নো না কানু। বামুনগুলোকে সবদিন ঢুকতে দেই না। যেদিন কড়ি থাকে না, উপোস করতে হয় সেদিন কেবল দেই। তুমি রাগ করেছ কানু?'

কাহ্নুপাদ কথা বলতে পারে না। শুধু ভালোবাসার কথায় ডোম্বির কি পেট ভরে? পেটের জন্য ডোম্বিকে কড়ি জোগাড় করতে হয়। সারারাত না ঘুমিয়ে জোগাড় করে ও। কাহ্নুপাদের মন কেমন অস্থির হয়ে ওঠে।

'আমার মনের মধ্যে একটা প্রতিশোধের আগুন আছে কানু।'

কাহ্নুপাদ চমকে ওঠে। 'মানে?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

‘ওরা তোমাকে গীত পড়তে দেয়নি। আমাদেরকে বড্ড অপমান করে।’

‘কী করবে?’

‘সে আমার মনে আছে।’

‘মল্লারী!’

‘তোমার গলা কাঁপছে কেন?’ ডোম্বি শব্দ করে হাসে। হাসিতে ভেঙে পড়ে।

‘এত হাসি ভালো না।’

‘বাবা! দাদাঠাকুরের মতো উপদেশ দিচ্ছ। তুমি আমার ঘরে বসো। আমি চট করে একটা ডুব দিয়ে আসি।’

‘না বসব না। বসতে ভালো লাগে না।’

‘কী করবে?’

‘আমার যদি অনেক কড়ি থাকত মল্লারী?’

‘তাহলে বুঝি পথে পথে ছিটিয়ে বেড়াতে?’

‘না পথে নয়। ভালোবাসা বাঁচাতাম।’

‘মা গো গীতের কথা হয়ে গেল।’

ডোম্বি আবার হাসতে আরম্ভ করে। কাহ্নুপাদ জোরে নিশ্বাস টানে। চাঁচর বেড়ার বাড়িগুলো অন্ধকার থেকে গা-ঝাড়া দিয়ে উঠছে, ভোর হচ্ছে। এ সময়টা ওর চমৎকার লাগে। একটু পর বনমোরগের ডাক ভেসে আসবে। কতদিন শবরীকে নিয়ে এ সবুজ ঘাস পায়ে দলেছে।

‘চলো আমিও নদীর দিকে যাই মল্লারী।’

‘তাই চলো।’

দুজনে নদীর দিকে হাঁটতে থাকে।

‘আমাদের সাধ্যমতো সাধ মেটে না কেন কানু?’

‘আদায় করে নিতে পারি না বলে।’

‘ঠিক বলেছ। কেবল পিছু হটি বলেই তো ঠকে যাই।’

‘আচ্ছা মল্লারী, তোমার ঘর বাঁধতে সাধ হয় না?’

‘না।’

‘কেন?’

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

‘একবার তো দেখলাম সাধটা কেমন? এই তো ভালো আছি। হাত পায়ে বেড়ি নেই। তা ছাড়া —’ডোম্বি কথা শেষ না করে আবার হাসে।

‘তা ছাড়া কী?’

‘ঘর বাঁধলে কি তোমাকে পেতাম?’

‘আমাকে না পেলেই বা কী?’

‘তোমাকে পাওয়া ভাগ্য।’

ডোম্বি আবার হেসে গড়িয়ে পড়ে, হাসি যেন থামতে চায় না।

ডোম্বি হাসতে হাসতে নদীর জলে নামে। তখন কাকভোর, কেউ কোথাও নেই, শান্ত নদী থিরথির। দূরে বনের মাথায় আলো আভা। ডোম্বি সাঁতরে অনেক দূরে যায় আবার ফিরে আসে। ডুব দিয়ে কোথায় গিয়ে যে ওঠে হদিস করা মুশকিল। কাহ্নুপাদের মনে হয় মল্লারীর সঙ্গে জলের একটা সখি ভাব আছে। ও যেখানেই যাচ্ছে জলের বুকে সে সখ্য ছলকে উঠছে। অন্য কেউ হলে জল বুঝি এত অত্যাচার সইত না। ইচ্ছেমতো জল আছড়েপিছড়ে তছনছিয়ে ডাঙায় ওঠে ডোম্বি। কাহ্নুপাদের কাছ থেকে ইশারায় বিদায় নিয়ে ভিজে শরীরে ছপছপিয়ে চলে যায়। যতদূর দেখা যায় চেয়ে থাকে কাহ্নুপাদ। একা একা ঘাটে বসে থাকে ও। দু-একজন করে লোক আসা যাওয়া করছে। কাকভোরের নদী যেন সুগন্ধময়। কাহ্নুপাদের মনে হয় সত্যি বুঝি নদীর গা থেকে গন্ধ আসছে। প্রাণভরে শ্বাস নিলে ফুসফুসে ভিজে শরীরের ছপছপ শব্দ হয়। নদীটাকে যদি বুকের মধ্যে পুরে রাখা যেত তাহলে বেশ হত। তখন শবরীর কথা মনে হয়। এতক্ষণে শবরীর ঘুম ভেঙেছে, ময়ূরের গলা জড়িয়ে ধরেছে, না, হয়তো ধাতুর খাটে পা ঝুলিয়ে বসে আছে। কাল রাতে শবরী ওকে ঘরে নেয়নি। ও রাগ করেছে, রাগে শরীরকে কষ্ট দিয়েছে শবরী। কাহ্নুপাদ এক মায়াবীর আশ্রয়ে দুঃখ ভুলতে চেয়েছিল, না ঠিক দুঃখ নয়, আসলে নিজেকে টুকরো টুকরো করে দেখা। একজন সৃষ্টিশীল লোক এভাবেই নিজেকে টুকরো করে। সে টুকরো থেকে বেরোয় পবিত্র সাদা ফুল, কাহ্নুপাদ যাকে অস্তিত্বের অংশ মনে করে। না, সব সময় সেটাও খুব প্রয়োজনীয় উপাদান নয়। জীবনের আরও অনেক জটিল ও গভীর ব্যাপারস্যাপার আছে। তা কখনো হরিণ-পোড়া আগুন হয়ে প্রবল বাতাসে শনশন করে। দগ্ধীভূত করে চৈতন্য এবং শিখা প্রোথিত করে চৈতন্যের গভীরে। তখন নিজেকে ঠিক রাখা কঠিন, লড়তে হয় প্রবল পরাক্রমে। হার অথবা জিত—এই শক্তি এখন ওকে নিক্ষিপ্ত করেছে আকাশেপাতালে, পাথরে কিংবা গনগনে লাভাস্রোতে। ওর মুক্তি নেই। সমস্ত শরীর ছিঁড়েখুঁড়ে বেরিয়ে আসছে মাংসপেশি। দেবকী ওর জন্য ক্ষণিকের ঘিয়ের আলো, আনন্দ দেয়, যন্ত্রণা বাড়ায় এবং নিজের সঙ্গে মুখোমুখি করে। এই মুহূর্তে ওর ইচ্ছে করছে নদী পেরিয়ে দূরের কোথাও যেতে, কিন্তু ঘাটে পারাপারের কেউ নেই। বারুয়া মাঝিও না, কাজেই আরও কিছুক্ষণ বসতে হবে। তখুনি দৌড়ুতে দৌড়ুতে ছুটকি আসে। ছুটকির চেহারায় দেবকীর ছাপ আছে। দেবকীর মতো ওর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আদলেও ভীষণ টান, দেখলে কাছে বসিয়ে কথা বলতে ইচ্ছা করে।

‘কাকু তুমি বুঝি সারারাত ঘুমোওনি?’

‘কেন রে?’

‘নইলে এত ভোরে এখানে কেন?’

‘আসতে নেই বুঝি?’

‘কেন? আমি চাই না আমার আগে কেউ আসুক।’

কাহ্নুপাদ অবাক হয়।

‘আমার ইচ্ছে আমি সবার আগে এই ঘাসের ওপর পা রাখি। আর কেউ মাড়িয়ে গেলে খুব খারাপ লাগে।’

‘সেজন্যে বুঝি এত ভোরে বেরিয়েছিস?’

‘ঠিক বলেছ।’

‘মা বকে না?’

‘মা টেরই পায় না। অনেক রাত পর্যন্ত মদ বেঁচে মা সকালে উঠতে পারে না। সেজন্যেই তো আমার এত মজা। জানো কাকু আমার মদ বেঁচতে একটুও ভালো লাগে না।’

‘কী করতে ইচ্ছা করে?’

‘কেবল ঘুরে বেড়াতে। বড়ো হলে আমি ঘরে থাকব না। পথে পথে ঘুরে বেড়াব। আচ্ছা কাকু এই রাস্তাটা কতদূর গেছে?’

‘কতদূর? অনেক দূর।’

‘দূর ছাই, অনেকদূর তো আমিও জানি। কতদূর বলো না?’

‘চোখ বুজে চিন্তা করে নে। যতদূর তোর মন চায় ততদূর।’

‘তুমি কিছু জানো না। কতজনকে জিজ্ঞেস করি কেউ বলতে পারে না। কেউ কিছু জানে না।’

‘বড়ো হলে তুই কী হবি ছুটকি?’

‘তোমার মতো গীত লিখব। হাড়ের মালা পরে গান গাইব, আর সারা দেশে ঘুরে বেড়াব। এই দেশটাকে প্রাণভরে দেখব’

‘দেশের জন্য কী করবি?’

‘একটি টোল খুলব। ছেলেমেয়েদের পড়াব। ওদেরকে তোমার মতো করে গড়তে চাইব।’

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'কেন রে?'

'তুমি যে সবার ভালোর জন্য কথা বলো। তোমার মতো সবাই মিলে কথা বললে আর আমাদের দুঃখ থাকবে না। যাই ঘুরে আসি। মা আবার উঠে আমাকে খুঁজবে।'

ছুটকি বড়ো শিমুল গাছটার আড়ালে চলে যায়।

হয়তো এখুনি ছুটবে ওই দূরের টিলার দিকে। কাহ্নুপাদ আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে থাকে। বুকের ভেতর এক বিশাল পৃথিবী গড়ে তুলেছে ছুটকি, সে পৃথিবীর কোনো সীমানা নেই। একটু পরে ছুটকি সত্যি সত্যি ছুটতে থাকে, ছোট্ট শরীরটা অস্পষ্ট হতে হতে মিলিয়ে যায়। ও আর বসে থাকতে পারে না। বারুয়া মাঝি ঘাটে এসেছে। নদী পার হয়ে চলে আসে কাহ্নুপাদ, বনের দিকে হাঁটতে থাকে, গাছের ছায়া মন্দ লাগে না। হঠাৎ করে গতরাতের কথা মনে হয়, শবরীর ওপর বুনো রাগ একগুঁয়ে হয়ে ওঠে। একগাদা পাখির বিচিত্র শব্দ, মাটির সোঁদালো গন্ধ, ঝোপঝাপের ওত-পাতা ভঙ্গি দেখতে দেখতে কাহ্নুপাদ মায়া হরিণের ছোট্ট বাচ্চা আবিষ্কার করে। কাহ্নুপাদকে একটুও ভয় পায় না। ঝোপের কাছে একটা দুটো লাফ দেয়। কিছুদূর গিয়ে ঘাড় বেঁকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। কাহ্নুপাদও দু-পা এগিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে, যেন দুজনের মধ্যে মজার খেলা জমে উঠেছে। সেই অবাক-করা চোখের ওপর চোখ পেতে রাখে কাহ্নুপাদ। মনের মধ্যে দারুণ হুটোপুটি। যদি ধরতে পারত, নিয়ে গিয়ে পুষত। কিন্তু তা হবার নয়। রাজার আইনে ওরা কেউ হরিণ পুষতে পারে না। টের পেলে কেড়ে নিয়ে যায়। আর তখুনি বাচ্চাটা মায়ের ডাক শুনে দৌড়ুতে দৌড়ুতে চলে যায়। কাহ্নুপাদ বিশাল কড়ুই গাছের ছায়ায় বসে পড়ে, হলুদ পাপড়ি ঝরে পড়ে টুপটাপ। একটু দূরে অনেক ময়ূর-পালক ছড়িয়ে থাকে, একটা নিয়ে গালে বুলোয় ও। শবরী প্রায়ই ময়ূর-পালক খুঁজতে বনে আসে, গুঞ্জার ফুল নিয়ে যায়, দ্বিতার বিচি সংগ্রহ করে মালা গাঁথে। শবরী কি এখন আসবে? বনের ছায়ায় স্নিগ্ধ বাতাসে ঘুম আসে কাহ্নুপাদের। ভাবতে থাকে, শবরী ওর তুলসীতলার প্রদীপ, ঘর আলো করা, যে ঘর একজন কবির সৃষ্টিশালা। এখানে মালমশলা জমা হয় তারপর নির্মাণ চলে—ঠুকঠাক হাতুড়ি বা কাস্তে ছেনি নয়—ঘাম ঝরে মগজের ভেতর, প্রাণ প্রায় ভুর্জপত্র। ও ঘুমিয়ে পড়ে পরম নিশ্চিন্তে।

বারুয়া মাঝির কাছ থেকে খোঁজ নিয়ে কাহ্নুপাদকে খুঁজতে বেরোয় শবরী। শরীরের কোথাও শিল্পিত পরিচর্যা নেই। খোঁপায় শুকনো ফুলের মালা, পায়ে বাসি আলতা, চন্দনের গন্ধ নেই কোথাও। রাত জাগা চোখে ক্লান্তি, কেমন বিবর্ণ দেখায় শবরীকে। গত রাতে কানুকে দরজা না খোলার জন্যে এখন প্রচণ্ড অনুতাপ হচ্ছে। রাগ পড়ে যাবার পর কেবলই ভোরের প্রতীক্ষা করেছে। কখনো কানুর উপর এত দীর্ঘ রাগ ও করেনি। তাই নিজেকে আর সামলে রাখতে পারছে না। মনে হচ্ছে ছুটে গিয়ে কানুর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে বলে, 'মান ভাঙো কানু। আমি আর রাগ করব না।' নৌকায় বসে পানিতে পা ডুবিয়ে রাখে ও। চোখে মুখে জ্বালা, আঁজলা ভরে জলের ছিটা দেয়। কিছুই ভালো লাগে না। কানুর ওপর অভিমান হয়। কানুও তো অপেক্ষা করতে পারত। তা না করে সরসর করে নেমে চলে এল। এখন কোথায় কে জানে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বনে বনে ঘোরে শবরী। সুন্দর ময়ূর-পালক পেলে আঁচলে জড়িয়ে রাখে। একগুচ্ছ গুঞ্জার ফুলও নিয়েছে। এখন ইচ্ছে করছে সব কিছু ছিঁড়ে টুকরো করে ফেলতে, অহেতুক বোঝা যেন। কানুকে না পেলে এ সবেই বা কী হবে। খোঁপা খুলে গেলে শুকনো ফুল ঝরে যায়, এলোমেলো চুল পিঠের ওপর ছড়িয়ে থাকে। অর্জুনের বিচি নরম পায়ে শক্ত ঠেকে, কখনো ব্যথা পায়। মায়া হরিণের দিকে তাকিয়েও দেখে না। গঙ্গাফড়িং উড়ে এসে ঘাড়ে বসে। অন্যমনস্ক হয়ে যায় শবরী। বন আজ আর ভালো লাগে না। ঝোপঝাড় কেটে বনটা উদোম মাঠ করে ফেলতে ইচ্ছা করে। কানুকে না পেলে আজ ওর চুলোয় আগুন জ্বলবে না। না খেয়ে সারাদিন কাটিয়ে দেবে। এখন যদি দুটি খরগোশ পেয়ে যায়, তাও ছুঁয়ে দেখবে না। ওর রসনায় আজ আর জল নেই। অন্যমনস্কতায় খেয়াল করেনি যে দেশাখ ওর থেকে খানিকটা দূরে তিরধনুক তাক করে বসে আছে, লক্ষ্য ওর দিকে, মুখে মিটিমিটি হাসি। হঠাৎ করে চমকে চেঁচিয়ে ওঠে শবরী।

'কী করছ?'

'শিকার করছি?'

'কী?'

'বনে কেমন সুন্দর মায়া হরিণ এসেছে। আগে কখনো দেখিনি এমন প্রাণী।'

'শিকার করতে পারবে?'

'খু-উ-ব।'

খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে শবরী।

'ওঠো ওঠো, আর বীরত্ব দেখাতে হবে না। শিকার তো ধরে নিয়ে খাঁচায় পুরেছ। আর কত?'

'একটায় কিছু হয় না বউদি। অনেক দরকার, দেবে অনুমতি?'

'ইয়ার্কি হচ্ছে?'

দেশাখ শবরীর কাছে এসে দাঁড়ায়।

'তোমাকে যখন দেখেছি বউদি, আজ নিশ্চয় ভালো একটা কিছু মারতে পারব।'

'উলটোটাও তো হতে পারে? আজ তুমি কিছু নাও পেতে পারো?'

'অলুক্ষনে কথা বোলো না। ওইসব কথা সইতে পারি না। যদি কিছু না পাই তাহলে গুষ্টিসুদ্ধ উপোস।'

'নাও বাপু কথা ফিরিয়ে নিলাম। উপোসে কাজ নেই। আজ যেন শিকারের বোঝায় বাড়ি ফিরতে কষ্ট হয়।'

'হ্যাঁ, এই তো এমন করে বলবে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

‘এই সাতসকালে কেন এসেছি জিজ্ঞেস করলে না তো?’

‘তুমি যা খুশি তা করতে আসো আমার কী? চলো তোমাকে একটা মজার জিনিস দেখায়।’

‘না আমার শখ নেই।’

‘চলো না, ঠকবে না।’

দেশাখ শবরীর হাত ধরে টানে। কাটা ঝোঁপে শবরীর হাত কাটে, পায়ে ব্যাথা পায়, কিন্তু দেশাখ হিড়হিড় করে টানছে।

‘নাহ্ তোমার সঙ্গে পারব না? এবার ছাড়ো। যথেষ্ট হয়েছে।’

দেশাখ কথা বলে না। গম্ভীর মুখে হাঁটে। ওর হাতে তিরধনুক। পিঠে পাখি ধরার ফাঁদ। শবরীকে একটা ঝোপের দিকে ঠেলে দেয়।

‘ওই ঝোঁপের আড়ালে গিয়ে দ্যাখো বউদি? বুঝবে দেবরটা কেমন কাজের হয়েছে। আমি চললাম।’

এতক্ষণে শবরী সব বুঝতে পারে। নিশ্চয় কানু আছে ওখানে। কথাটা একবারও মনে হয়নি। ভেবেছিল দেশাখ হয়তো কোনো ফাঁদে-পড়া পাখি দেখাবে। ঝোপের আড়ালে দু-পা গিয়ে থমকে দাঁড়ায় ও। কড়ুই গাছের বিরাট ছায়ায় চিতপাত শুয়ে ঘুমোচ্ছে কাহ্নুপাদ। হাতের মুঠোয় ময়ূর-পালক। সব গ্লানি ঘুচে গেল শবরীর। ওই ময়ূর-পালক ক-টাই শবরীর জন্যে ভালোবাসা। ঘুমন্ত কাহ্নুপাদকে আজ অন্যরকম দেখাচ্ছে, শবরীর ভালোবাসায় সিক্ত নতুন মানুষ। কাহ্নুপাদের রচিত গীত কি ওই ঘুমন্ত প্রশান্তির চেয়ে সুন্দর? কী নির্বিবাদ, দ্বিধাহীন। শবরী হাঁটু মুড়ে কাহ্নুপাদের পাশে বসে, ঘুম ভাঙায় না, থাক ঘুমোক ও। ঘুম ভাঙার পর শবরীকে দেখলে হাত বাড়িয়ে যে দৃষ্টিতে ছুঁয়ে দেখবে সেটা ভাবতে শবরীর বুকটা কেঁপে ওঠে। আর এজন্যই কাহ্নুপাদ ওর কাছে প্রতিদিনের হয়েও নতুন।

তখনই ও চুলের গোছা গুছিয়ে ময়ূর-পালক গুঁজে নেয়। ঘাসের লম্বা ডাঁটায় গুঞ্জারের মালা গাঁথে। বাতাসে বার বার এলোমেলো হয় চুল। কড়ুইয়ের হলুদ ফুলের পাপড়ি উড়ে আসে। পাপড়ি কুড়িয়ে কপালে টিপ পরে, নাকে নাকছাবি। শবরী একদৃষ্টে কাহ্নুপাদের মুখের দিকে তাকিয়ে বসে থাকে। যেন চোখ খুলে কাহ্নুপাদ ওকে দেখে চিৎকার করে বলে উঠবে, ‘আহা এ কী অলৌকিক আনন্দ! সৃষ্টির নতুন জোয়ার। এখনই সময় নতুন গীত লেখার।’

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অপণা মাঁংসে হরিণা বৈরী

কার্তিকের শুরু, হিমে কুঁকড়ে যায় শরীর। ভোরের কুয়াশা নদীর ওপর দুধের ঘন সরের মতো, দু-হাত দুরেও কিছু দেখা যায় না। বেলা করে ঘাটে আসে ডোম্বি। কাঁথা ছেড়ে উঠতেই ইচ্ছে করে না। মালসায় কয়লার আগুন রেখে ঘরটা গরম রাখে। ঘরের এই ওমের সঙ্গে বাইরের অনেক তফাত। বাইরে বেরুলেই নাক-কান দিয়ে পিনপিনে হিম ঢুকে গিয়ে ভেতরটা জমিয়ে ফেলে। ওর বেশ কষ্ট হয়। বারুয়া মাঝি তো সূর্য ওঠার পরও কানমাথা চাদরে মুড়ে রাখে। তবুও এ মাসটা ডোম্বির ভীষণ পছন্দ, আরও পছন্দ এ মাসের সুখরাত্রিব্রত উৎসব, গাঁয়ের সবারই প্রিয় উৎসব। ভোরে বাড়ি বাড়ি অতিথি অর্চনা হয়। কপালে চন্দনের ফোঁটা, একটি সুগন্ধী ফুল আর হাতের তালুতে দই—এ দিয়ে সবাইকে বরণ করা হয়। এর আগের দিন সন্ধ্যায় রাজাবাড়িতে গাঁয়ের সবার নিমন্ত্রণ থাকে। খাওয়ার আগে পায় কর্পূর মেশানো সুগন্ধী জল, খাওয়ার শেষে মশলাযুক্ত পানের খিলি, মাঝখানে কাগনি ধানের ভাতের সঙ্গে দই আর রাই সরিষার তৈরি ভীষণ ঝাল দেয়া ছাগলের মাংস। খাবার জন্য সারা বছর সবার প্রতীক্ষা থাকে, যত ইচ্ছে পেট পুরে খাওয়া যায়। সন্ধ্যে হতেই দলে দলে বেরিয়ে যায় নারী-পুরুষ-ছেলেমেয়ে। এক দল খেয়ে এলে আর এক দল যায়। এই একটা দিন বারুয়া মাঝির পারাপারের কড়ি আসে রাজকোষ থেকে। ডোম্বি এ দিন নৌকা বায় না। এ দিনটি কেন ওর প্রিয় ভাবতে গিয়ে ডোম্বির মনে হয়, এ উৎসবের বড়ো আকর্ষণ চন্দনের ফোঁটা, সুগন্ধী ফুল আর হাতের তালুর দই। চৈত্র মাসের কাম উৎসবও ওর এত প্রিয় নয়। এ উৎসবের পবিত্রতা আছে, মনকে ভগবানের কাছে নিয়ে যায়, সবার মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করতে ভালো লাগে। নাচ, গান, বাদ্যে গাঁ মুখরিত হয়। গত বছর কানুকে একটা চমৎকার চুমকুড়ি ফুল দিয়েছিল। তা ছাড়া কপালে চন্দনের ফোঁটা দিতে কী যে আরাম। মনে হয় সব কিছু এক অন্যরকম নদী হয়ে বইছে, সে নদীর জলে আশ্চর্য গন্ধ, দিগবিদিক মাতিয়ে রাখে। ডোম্বি সে নদীতে একলা নৌকা বায়, ঢালু কূলে গুন টানে। কেউ আর কোথাও নেই। এ বছর কানুর জন্য একটা গোলাপ রেখেছে। অনেক কষ্ট হয়েছে জোগাড় করতে। বেশির ভাগ বাড়িতেই তো জবা থাকে। দেখতে দেখতে দিনটি এসে যায়।

ভোররাতে শবরীর ঘুম ভেঙে গেলে ও কানুকে জড়িয়ে ধরে। আগের দিন রাতে চন্দন ঘষে রেখেছে। দুটো খুব সুন্দর হলুদ আর লাল মেশানো শুন্দা ফুল খুঁজে এনে কলাপাতায় করে শিশিরে রেখে দিয়েছে, দই বানিয়েছে।

কাহ্নুপাদ বুকের নীচে বালিশটা টানতে টানতে বলে, 'আজ সোহাগটা একটু বেশি মনে হচ্ছে?'

'কেন কখনো কি কম দেখেছ?'

'হুঁ, অনেক দেখেছি। কখনো কমতে কমতে এতই কমে যায় যে—'

শবরী মুখ চেপে ধরে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

‘দ্যাখো মিছে কথা বোলো না।’

‘মিছে বুঝি?’

‘তা নয়তো কী? ঠিক আছে মিছে না হলে আজকে আরও কিছু হোক।’

‘হুঁ এজন্যেই ভণিতা।’

কাহ্নুপাদ মিটমিটিয়ে আসে। বুকের নীচ থেকে বালিশটা সরিয়ে দেয়। শবরীর ঘন কালো একরাশ চুল বিছানায় ছড়িয়ে পড়ে। ধাতুর খাটে দুজন মানুষ শান্ত হয়ে যাবার আগে ভাবে, কানুটা সাংঘাতিক, হুটোপুটিতে অস্তাদ। কানু ভাবে, শবরী সব ব্যাপারগুলো নিখুঁত বোঝে। রাজা ওকে রাজদরবারটা সাজিয়ে তোলার কাজ দিতে পারত। ভোরের আঁধার ছুটতে না ছুটতে পটহ মাদল বেজে ওঠে, দ্রিম দ্রিম। যেন ঘোষনায় মুখরিত, আজ সুখরাত্রিব্রত, পুরবাসী ওঠো, জাগো।

দু-দিন কোনো কাজ নেই। কেবল নাচ, গান, হল্লা। রাজবাড়িতে নেমন্তন্ন খাওয়া। ছোটো ছোটো ছেলেমেয়ের দল ছুটে আসে। উদ্দাম নাচে ডোম্বি, ও আজ ঘাটে যাবে না, নৌকা বাইবে না, জায়গায় জায়গায় নাচবে। ধাতুর খাটে শুয়ে থেকে কাহ্নুপাদ ভাবে, ডোম্বি দিনভর নাচে বলেই সুখরাত্রিব্রত আকাঙ্ক্ষিত। ওর কাছ থেকে পাওয়া ছোট্ট একটি ফুল সারা বছর ওকে গন্ধ দেয়। এই ছোটখাটো সুখের অনুভূতিগুলো বাঁচিয়ে রাখার সহায়ক। শবরী ভাবে, আজ কানুর দরবারে যেতে হবে না। কানু সারা দিন ঘরে থাকে বলে সুখরাত্রিব্রত এত সুন্দর। আজ সারা গায়ে চন্দন লেপে দেব। নাচের মাঝে মাঝে ডোম্বির মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে, কাল ভোর ছাড়া কানুর কপালে চন্দন দেয়া যাবে না। এই উন্মুখ প্রতীক্ষাটুকু আছে বলেই ওর সব কিছু সার্থক মনে হয়।

বাজনার শব্দে সবাই পথে নেমে আসে। ডোম্বির নাচের ফাঁকে ছোটো ছেলেমেয়েরা গান গায়। গাইতে গাইতে পথে চলে। দেশাখের চঞ্চল চোখ বিশাখাকে খোঁজে। বিশাখাকে নিয়ে দূরের পাহাড়ে যাবে, আজ কোনো কিছুতে মানা নেই। তিরধনুকে বিশাখার হাত বেশ পাকা হয়ে উঠেছে। এত তাড়াতাড়ি শিখতে পারবে দেশাখ নিজেও ভাবেনি। বিশাখার আজ ঘুঘু মারার পরীক্ষা, কিন্তু ওকে কোথাও খুঁজে পায় না। ও কি এখনও ঘর থেকে নামেনি? গতবছর দুজনে সন্ধ্যায় বাজি ধরেছিল যে কে আগে নামতে পারে। বিশাখার সঙ্গে দেশাখ কোনোদিন পারেনি। তখন ও রেগে যেত, ‘তুমি কি রাতে ঘুমোও না?’

‘ঘুমোই। কিন্তু ঠিক সময় আমার ঘুম ভাঙে। আমি মন্ত্র পড়ে ঘুমাই।’

‘কচু।’

দেশাখ ভেংচি কাটে। বিশাখা খিলখিল শব্দে হাসে।

‘রাগলে তোমাকে ভালো দেখায়।’

দেশাখ বিশাখার চুল টেনে ধরে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

‘উঃ ছাড়ো।’

‘আগে বলো সামনের বার আমার আগে আসবে না?’

‘ঠিক আছে আসব না।’

কিন্তু বিশাখা কোনোবার সে-কথা মনে রাখেনি। প্রত্যেকবার আগে এসে হাজির হত। কিন্তু আজ কী হল? এখন অবশ্য ও আগের মতো চঞ্চল নেই, অনেক গম্ভীর হয়ে গেছে। শরীর ভারী হয়েছে, চোখে বুনো দৃষ্টি ঝলসে ওঠে। দেখলে আবেগ উথলে ওঠে। দেশাখ তখন দলছুট হয়ে বিশাখার বাড়ির দিকে যায়। কার্তিকের এই হিমেল ভোরের সুখরাত্রিব্রতের উৎসবে ওর মন বিষণ্ণ হয়ে ওঠে। জীবনের অনেক গোঁজামিল এখন ওকে ভাবায়, কিন্তু প্রতিকারের পথ খুঁজে পায় না বলে মেজাজ খিঁচড়ে থাকে। বিশাখাদের বাড়ি পর্যন্ত যেতে হয় না। মাঝপথে ওর সঙ্গে দেখা হয়। বিশাখা ছুটতে ছুটতে আসে।

‘আজ তুমি জিতে গেছ?’

বিশাখা তড়বড়িয়ে কথা বলে। দেশাখকে অপ্রত্যাশিতভাবে পেয়ে যাবার ফলে কিছুটা বিহ্বল। দেশাখ একদৃষ্টে ওর দিকে তাকিয়ে থাকে। ঘুম থেকে উঠে আসার দরুন আশ্চর্য সতেজ। কোনো বিষণ্ণতা যেন ওর পবিত্রতা নষ্ট করেনি।

‘তোমার আজ দেরি কেন বিশাখা?’

‘কাল রাতে বাবার অসুখ ভীষণ বেড়ে গিয়েছিল। আমি মা কেউই ঘুমোইনি। ভোররাতে একটু শুয়েছিলাম, তাই ঘুম ভাঙেনি।’

‘বাবা এখন কেমন?’

‘ভালো। মা বললেন আমাকে উৎসবে যেতে। উঃ তোমাকে এখানে না পেলে আমার যে কী খারাপ লাগত।’

‘দেখলে তো তোমার মনের কথা আমি সব টের পাই। চলো।’

‘অ মা উলটো দিকে যাচ্ছ যে?’

‘না, উৎসবের দলের সঙ্গে আমরা থাকব না। তুমি আর আমি সারাদিন একসঙ্গে কাটাব।’

‘সত্যি খুব মজা হবে।’

দুজনে হাত ধরে পাহাড়ের দিকে হাঁটতে থাকে।

‘দেশাখ তোমাকে না পেলে আমার দিনগুলো অন্যরকম হত।’

‘কেমন?’

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

‘আমি তা জানি না। বোধহয় খারাপ। জানো মাঝে মাঝে মনে হয় আমার জন্যে কোথাও কোনো আনন্দ নেই।’

‘থাক এসব কথা ভাবতে নেই।’

‘শুধু তোমার কাছে এলে সব কিছু অন্যরকম হয়ে যায়।’

‘দ্যাখো বিশাখা আমরা অনেকদূর চলে এসেছি।’

‘সত্যি তো পটহ মাদলের শব্দ আর নেই।’

‘তোমার ভালো লাগছে না?’

‘হ্যাঁ।’

‘চলো দৌড়াই?’

‘না আস্তে আস্তে যাব। দৌড়ালে তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যায়।’

‘তবে থাক।’

‘আজ আমরা কী করব দেশাখ।’

‘খেলব।’

‘কী খেলা।’

‘মিছেমিছি খেলা।’

দেশাখের মনে হয় বিশাখার শরীরে নতুন ঘাসের গন্ধ ভোঁ-ভোঁ দৌড়োচ্ছে। একটু পর ওরা একটা বড়ো টিলার আড়ালে চলে যাবে। আর সেখানে গেলেই সব কিছু থেকে আড়াল হয়ে যাবে ওরা। তখন বিশাখার শরীরের ভোঁ-ভোঁ করা গন্ধটাকে দেশাখ ধরে ফেলতে পারবে।

পটহ মাদলের ঝংকারে ডোম্বির উদ্দাম নৃত্য সমগ্র পল্লি মাতিয়ে তোলে। কেউ আর ঘরে নেই, সবাই পথে নেমে এসেছে। যার যা ইচ্ছেমতো হাসছে, গাইছে, নাচছে। ফুর্তির শেষ নেই। কারও ঘরেই আজ রান্না হবে না। ফলমূল, বাসি খাবার যা সামান্য কিছু খেয়ে দুপুর কাটিয়ে দেবে। তারপর বিকেল পড়লেই ছুটবে রাজবাড়ির দিকে। কাহ্নুপাদ পথের ধারে দাঁড়িয়ে থেকে অবাক হয়ে দেখছে ডোম্বির প্রাণশক্তি। একটুও ক্লান্তি নেই, যেখানে সেখানে নেচেই চলেছে। শবরী কোথায় যেন বেরিয়েছে। কাহ্নুপাদ ঘুরে ফিরে আবার ঘরে চলে আসে। পাখির পালকের কলমটা বেড়া থেকে নামিয়ে লিখতে বসে। মনে হয় লেখার জন্যে মনের ভেতরে অনুকূল পরিবেশ। ডোম্বির উদ্দাম নাচের ছন্দের মতো পংক্তি আসছে।

ভবনির্বাণে পড়হ-মাদলা
মন বপন বেণি করণ্ডকশালা।।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জঅ জঅ দুন্দুহি-সাদ উছলিআঁ

কাহ্ন ডোম্বি-বিবাহে চলিআ।।

এ পংক্তিটা লিখে হেসে ফেলে কাহ্নুপাদ। মনের বিচিত্র আনাগোনায় কখনো মুগ্ধ হয়, কখনো শঙ্কিত। কলম ছেড়ে ঘরে পায়চারি করে। বাজনা খুব মৃদু শব্দে আসছে। শবরী যে কোথায় গেল? জানালার ধারে দাঁড়িয়ে দূরের পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে থাকে। কুক্কুরীপাদ এখন ওখানে কী করছে? ইদানীং লুইপা আর বিরুআ বেশ ভালো গীত লিখছে। ওদের কয়েকটা গীত কাহ্নুপাদ দেখেছে। ওদের উপলব্ধি তীক্ষ্ণ, নিজেদের পারিপার্শ্বিক সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন। ওদের লেখা গভীর প্রত্যয়নিষ্ঠ। কাহ্নুপাদের এই ভেবে ভালো লাগে যে ওর চারপাশের মানুষগুলো ধারালো হয়ে উঠছে। ভাবতে ভাবতে নিজের ভেতরের আবেগটা মুহূর্তে চনচনিয়ে ওঠে। ও আবার হরিণের চামড়ার ওপর উপুড় হয়ে পড়ে।

ডোম্বি বিবহিআ অহারিউ জাম।

জউতুকে কিঅ আনতু ধাম।।

অহণিসি সুরঅ পসঙ্গে জাঅ।

জোইণিজালে রএনি পোহাঅ।।

পংক্তিগুলো গুনগুনিয়ে গায় কাহ্নুপাদ। সুরটা ঠিক করে। ভেবে পায় না কী করে লিখে ফেলল যে, ডোম্বিকে বিয়ে করে পুনর্জন্ম হল। হ্যাঁ, আরেক জন্মে ও ওকে চাইবে। কখনো কারও সঙ্গে এমন দেরিতে সখ্য গড়ে ওঠে যে তখন আর সময় থাকে না। তখন কেবলই বুক ভেঙে দীর্ঘশ্বাস আসে, কেবলই পিছন ফিরে তাকাতে হয়। ও বিড়বিড়িয়ে বলে, 'যার এত দুর্বার আকর্ষণ তাকে উপেক্ষা করা সহজ নয়। শেষের পংক্তি দুটোর জন্যে ওকে আর ভাবতে হয় না।'

ডোম্বিএর সঙ্গে জো জোই রত্তো।

খণহ ন ছাড়অ সহজ-উন্মোত্ত

ডোম্বির সঙ্গে যে যোগী অনুরক্ত হয়, ক্ষণমাত্রও সে সেই ডোম্বিকে ছাড়ে না। পুরো গীতটা লেখার পর শরীর কেমন অবশ লাগে, উঠতে ইচ্ছে করে না। হরিণের চামড়ার ওপর টানটান হয়ে শুয়ে থাকে। মনে হয় বুকের নীচ দিয়ে ভীষণ শীতল এক জলের রেখা গড়িয়ে যাছে।

কার্তিকের দুপুর কবুতরের বুক হয়ে ওম ছড়ায়। গায়ের কুটোটুটো ঝেড়ে উঠে বসে বিশাখা। অর্জুনের গাছের কালো গোটাগুলো সবখানে ছড়িয়ে আছে। দেশাখ অনেকগুলো জড়ো করেছিল। এখন একটা দুটো করে এদিক ওদিক ছুঁড়ে মারে। কনুইতে ভর দিয়ে কাত হয়ে শুয়ে আছে ও। বিশাখা নখ দিয়ে মাটি খুঁটে। আনত দৃষ্টিতে ঘাসের বেগুনি ফুলের স্নিগ্ধতা। সংসার মানেই কেবল বাবার অসুখ নয়। এ বোধ থেকে ছাড়া পাবার দরুন ওর দৃষ্টি, নিশ্বাস, বুকের ওঠানামা আমূল পালটে যায়। অকারণে দেশাখে চুল ধরে টানে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

‘আমি আর এখান থেকে বাড়ি ফিরব না।’

‘ইস এ যেন আমার রাজ্য? যেমন খুশি তেমন চাইলেই হল আর কী?’

দেশাখ কপট ভেংচিতে বিশাখার পায়ের আঙ্গুল ধরে নাড়া দেয়।

‘এটা যদি আমাদের বাড়ি হত?’

‘আবার মিছে ভাবনা!’

‘ভাবতে দোষ কী।’

‘কষ্ট বাড়ে। মিছেমিছি নিজেকে কষ্ট দেয়া হয়।’

‘আমরা কেন নিজেদের ইচ্ছেমতো থাকতে পারিনা। রাজার আইন কেবল আমাদের পিছু পিছু ছোটে।’

তখনই দেশাখের বুকে গোল ওঠে। ও বুঝতে পারে বহুলোক একসঙ্গে হইচই করছে সেখানে। ওর একটা স্বপ্ন আছে। সেজন্যে ও তৈরি হচ্ছে। প্রতিক, মিহির, খিন্তি, বিপিন, অরুণকে ধনুক ছোঁড়া শেখাচ্ছে। আস্তে আস্তে আরও বাড়বে, বাড়তে বাড়তে হাজার হবে। তখন ও ডাক দেবে, ভয়ানক একটা ডাক। সে হাঁকে মন্ত্রমুগ্ধের মতো সকলে ছুটবে ওর পিছু পিছু। সকলে জানবে লক্ষ্যটা কোথায়, লক্ষ্যটা কী। বিশাখা থাকবে ওর পাশে। বিশাখা চমৎকার শিখেছে।

‘এই, কী ভাবছ?’

বিশাখা ওকে নাড়া দেয়। ও ভীষণ ছেলেমানুষ হয়ে গেছে। খুশির সীমাপরিসীমা নেই।

‘বিশাখা?’

দেশাখ গম্ভীর হয়ে ডাকে।

‘কী বলো?’

‘ধরো এই বনটা আমাদের রাজ্য। গাছপালা, পশুপাখি সব প্রজা, তুমি আমার রানি।’

বিশাখা খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে।

‘হাসছ যে?’

‘বা রে আমি রানিই তো। এটা আবার বলতে হবে নাকি?’

‘ওহ্ খুব বিশ্বাস। যদি না করি।’

‘তোমার মুণ্ডু কাটা যাবে।’

‘সত্যি পারবে?’

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেশাখ ওকে কাছে টানে। 'আমার ওপর তোমার এমন জোর যেন সব সময় থাকে বিশাখা।' বিশাখা কিছুটা আদুরে গলায় বলে, 'কিন্তু রাজা রানি এসব আমার একটুও ভালো লাগে না। তুমি রাজা অন্য কাউকে বানিয়ে দিও। তুমি আমি যেমন আছি তেমন থাকব। বনে বনে ঘুরব আর পাখি ধরব। যেমন খুশি তেমন, কেউই শাসন করতে আসবে না।'

দেশাখ কথা বলে না, ঘাসের ডগা চিবুতে থাকে।

'কী পছন্দ হল না?'

'বনে বনে ঘুরলেই চলবে না। প্রজাদের সুখশান্তির ব্যবস্থা করতে হবে। বুঝলে রানি?'

'রানি নয়, বলো রাজমহিষী।'

দেশাখ ঘাসের ডগা ছুঁড়ে ফেলে। সূর্যের খরখরে তেজ অর্জুন গাছের মাথায়, বনটা নিথর। এতদূরে পটহ মাদলের শব্দ নেই। স্বপ্ন দেখতে দেখতে এক বিশাল প্রান্তরে এসে যায়। বিশাখা আর কোথাও নেই। সে প্রান্তরে বুকের ওপর একশো একটা ঘোড়া দৌড়ে যায়। নড়ে উঠে আবার শান্ত হয় বিশাখা, মনে মনে প্রার্থনা করে অর্জুন গাছের ছায়াটা রাতের আঁধার হোক, ডালপালা চাঁচর বেড়ার ঘর, কিন্তু বেশি ভাবতে পারে না। দেশাখ ওকে দ্রুতগামী ঘোড়ার পিঠে উঠিয়ে নেয়। সময়ের গতি ওরা রুখতে পারে না। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়। ওদের মনের ইচ্ছে দুপুরটা একটু থামলে পারত।

দুপুরের পর থেকেই ডোম্বি নৌকা নিয়ে বসে। বারুয়া মাঝি ওর কাছ থেকে ছুটি নিয়ে মেয়ের বাড়ি গেছে। একবেলা নেচে এখন শান্ত ডোম্বির মন। ভালই লাগছে বিনে কড়িতে পার করতে। আজ আর কোনো পারাপার নয়। সবার যাত্রা একদিকে। ছোটোরা বেশি খুশি, লাফিয়ে লাফিয়ে নৌকায় ওঠে।

'মাসি আজ আর আমাদের মানা করতে পারবে না।'

ডোম্বি হাসে। অনেকদিন কাউকে নৌকায় ওঠায় না। কেউ এলে ভাগিয়ে দেয়। নইলে ওরা বড্ড জ্বালাতন করে। ডোম্বি লক্ষ করে সকলের চোখেমুখে চকচকে খুশি। সামান্য খেয়ে, না খেয়ে, আধ পেটা খেয়ে যাদের দিন কাটে তাদের জন্য এ উৎসব বিরাট আয়োজন। লোক পার করতে করতে শেষ বিকেল হয়ে যায়, তবু কানু আসে না। ডোম্বি কেমন অবসন্ন বোধ করে। তবে কি কানু যাবে না? পরক্ষণে খুশি হয়। হাত-পা ছড়িয়ে নৌকার ওপর বসে পড়ে। কানু নিশ্চয় যাবে না, না যাওয়াই ভালো। যাদের হাতে এত অপমান একদিনের ওই অন্ন কি সে ক্ষতি পুষিয়ে দিতে পারে? তখুনি বিশাখাকে ঘরে পৌঁছে দিয়ে ঘাটে আসে দেশাখ, ও নিজেও যাবে না। বুকটায় চড়চড় আওয়াজ হয়। রাই সরিষা আর দইয়ে রাঁধা ছাগ-মাংসের আকর্ষণ গতবার পর্যন্ত ছিল। এবার আর নেই। মনে করলেই শরীরে বমির ভাব হয়। ডোম্বিকে হাত-পা ছড়িয়ে বসে থাকতে দেখে খুশি হয়। অন্তত কথা বলার লোক পাওয়া গেল। জানে ঘরে ফিরে কাউকে পাবে না। সবাই এতক্ষণে চলে গেছে। বিশাখাও যাবার জন্যে ছটফট করছিল, কিন্তু শেষপর্যন্ত দেশাখের যুক্তি মেনেছে। ও লাফিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নৌকায় উঠে বসে, মৃদু ঢেউয়ে নৌকা এপাশ ওপাশ করে। ডোম্বি নিজেকে গুছিয়ে নেয়।

'কাছি খুলব?'

'না।'

'যাবে না?'

'না।'

'খাবে কী?'

'নদীর জল।'

ডোম্বি খিলখিলিয়ে হাসে।

'বাবা কথা তো না যেন একদম খটখট শব্দ।'

'শুনলে কি প্রাণ জুড়ায়?'

'একদম না।'

'তাহলে আর কী? তা ছাড়া তোমাকে খুশি করা কার সাধ্যি। এক কানুদা কেবল পারে।'

অন্ধকারে ডোম্বির মুখে আলো ছলকে যায়।

'কে বলল তোমাকে?'

'বলবে আবার কে? চোখে দেখলে সব বুঝি। বলো সত্যি কি না?'

'অত কথা জানি না।'

'জানো সবই, বলবে না।'

'আজ সারাদিন কোথায় ছিলে? দেখলাম না যে?'

'আমার কথা কি তোমার মনে হয়?'

'বা রে হবে না কেন?'

'কী জানি বাপু, তোমার কি আর অন্য দিকে চোখ দেবার সময় আছে?'

ডোম্বি উত্তর দেয় না। দেশাখের কথাগুলো মনের মধ্যে নেড়েচেড়ে উপভোগ করে। দেশাখের কথাগুলো যদি সবদিক দিয়ে সত্য হত! যদি সামাজিক জীবনে শবরী না হয়ে মল্লারী হত কাহ্নুপাদের সঙ্গী! না বেশি কিছু ভাবতে ভালো লাগে না। কষ্ট বাড়ে, একটা বাজে কষ্ট।

'তুমি যাবে না কেন দেশাখ?'

'তুমি তো যাওনি?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

‘তাই তো বলি অন্ধকারে কথা বলে কে? ঠিকই ভেবেছি যে তোমরা।’

‘কানুদা তুমি? তুমি যাওনি?’

কাহ্নুপাদ লাফিয়ে নৌকায় ওঠে। দেশাখ সরবে বলে, ‘তাহলে আমরা অনেকে যাইনি?’

‘অনেক নয় দেশাখ। গুটিকয়েক।’

‘সামনে সুখব্রতরাত্রি উৎসবে কেউ যাবে না কানুদা।’

‘না গেলে রাজার লোক ধরে নিয়ে যাবে। নইলে যে দুঃস্থ খাওয়ানোর পুণ্য পাবে না রাজা।’

কাহ্নুপাদ তীক্ষ্ণস্বরে হেসে ওঠে। কেউ আর কথা বলতে পারে না। দেশাখ জানে এটাই চরম কথা। না গেলে রাজার লোক বেঁধে নিয়ে যাবে। পুণ্য অর্জনের এমন মহান সুযোগ কিছুতেই ছাড়বে না। পাড়াটা আজ একদম সুনসান। কুকুরের ডাকও কোথাও নেই। ফিকে চাঁদের আলো চারদিকে। টুকরো টুকরো মেঘের ইতস্তত ভ্রমণ। বাতাস নেই। কেমন দমধরা গুমোট ভাব। কাহ্নুপাদ চিতপাত শুয়ে পড়ে দেশাখের গা ঘেঁষে।

‘ঘরে ভালো লাগছিল না তাই বেরিয়ে এলাম, ভাবিনি তোমাদের পাব।’

‘আমরা কেউ কারও সঙ্গে যোগাযোগ করিনি তবু আমরা এক জায়গায় এসে গেলাম কী করে কানুদা?’

‘লক্ষ্য যখন এক হয় তখন কেউ কাউকে ডাকে না রে দেশাখ। সবাই আপনা-আপনি এসে জড়ো হয়।’

‘হবে হয়তো।’

দেশাখ সাহসী কণ্ঠে বলে। নদীর পানিতে পা ডুবিয়ে দেয়। গুনগুন করে গান গায় মল্লারী। তিনজনে কেউ আর কোনো কথা বলে না। অথচ একই ভাবনায় তিনজনের হৃদয় মুহূর্তে মুহূর্তে একে অপরের মধ্যে ঢুকে যায়। কখনো ডোম্বির হৃদয় কাহ্নুপাদের হয়, কখনো দেশাখের হৃদয় ডোম্বির। কখনো কাহ্নুপাদের হৃদয় দেশাখের। তিনজনের সচল আনাগোনায় তারা অনুধাবনের একই লক্ষ্যে ক্রমাগত ছুটতে থাকে। হঠাৎ করে ডোম্বি কোমর থেকে একটা ছুরি টেনে বের করে।

দেশাখ চমকে তাকায়।

‘ওটা কী?’

‘চেনো না?’

ডোম্বি জোরে হাসে। কাহ্নুপাদ লাফ দিয়ে উঠে বসে। ডোম্বির হাতটা মুচড়ে ধরে।

‘এটা দিয়ে কী হবে?’

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

‘আমার বুকে একটা প্রতিশোধের আগুন জ্বলে।’

‘কী বলছ ডোম্বি?’

‘এত কথা জানতে চাও কেন দেশাখ?’

ডোম্বি আবার হাসিতে গড়িয়ে পড়ে। নদীর বুকে ছপ ছপ শব্দ, একটা নৌকা চলে যাচ্ছে। কাহ্নুপাদ অন্ধকারেও যেন মল্লারীর দৃষ্টি দেখতে পায়। তীব্র সে দৃষ্টি আগুনের চাইতেও বেশি, আগুনের চাইতেও সর্বনাশী। কাহ্নুপাদ দেখল দেশাখের হাতে তিরধনুক, ডোম্বির হাতে ছুরি আর ওর হাতে কলম। পরিবেশটা কেমন সুন্দর ভাবে ঘণীভূত হচ্ছে। তারপর ফাটবে, ফেটে চৌচির হবে। আস্তে আস্তে ডোম্বির হাসি থেমে যায়। ওপরপারে লোক এসেছে, ওকে ডাকছে। দেশাখ আর কাহ্নুপাদ লাফ দিয়ে পাড়ে নামে। ডোম্বি কাছি খুলে নৌকা বায়।

কাহ্নুপাদ এবং দেশাখ এলোমেলো হাঁটতে থাকে। দুজনে মগ্ন হয়ে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা করে। হঠাৎ করেই শুনতে পায় বিলাপের ধ্বনি আসছে।

‘কে দেশাখ?’

‘জানি না তো। চলো দেখি।’

দুজনে এগোয় এবং ভানুমতীদের বাড়িতে এসে থামে। ভানুমতির মা বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদছে। সুখব্রতরাত্রি উৎসব-সন্ধ্যায় মারা গেছে ভানুমতী। মেয়েটি ওর লম্বা লম্বা নখগুলো নিয়ে নিথর ঘুমিয়ে আছে। ওগুলো কেউই কাটতে পারেনি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুটো যমজ ছেলে বুকের কাছে নিয়ে শুয়ে থাকে ভৈরবী। শারীরিক এবং মানসিক কোনো দিক দিয়েই ওর কোনো শক্তি নেই। যমজ ছেলে দেখার পর থেকেই ভীষণ কান্নায় বুকটা ফাটা মাঠের মতো টুকরো টুকরো। শুক্তির মা বাচ্চা দুটো দেখছে। ধনশ্রী দরজার কাছে মাথায় হাত দিয়ে বসে থাকে। তাকে কেমন বিভ্রান্ত দেখাচ্ছে। বুকের ভেতর কেবল একটা 'না-না' ধ্বনি। কিছুতেই হতে পারে না, কিছুতেই না। ছেলে হবার পর ভৈরবী ওর পা চেপে ধরেছিল।

'তুমি বিশ্বাস করো আমি অসতী নই। আমি তোমাকে ছাড়া আর কাউকে বুঝি না। আমার আর কেউ নেই।'

ধনশ্রী ওর পাশে হাঁটু গেঁড়ে বসেছিল। হাত দুটো জড়িয়ে ধরে কতবার গালে ঘঁষেছিল, 'বউ-বউ আমি তা জানি। আমি বিশ্বাস করি। কিন্তু—।' ওই 'কিন্তু' কাঁটা হয়ে আছে দুজনের মনে। কেউই কিছু বুঝতে পারছে না। অথচ দু-জনে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে কোনো অঘটন ঘটতে পারে না। ভোররাতের ঠান্ডা হাওয়ার প্রশান্ত আমেজেও ধনশ্রী ঘেমে নেয়ে উঠেছিল। সংসারের এই সুখ আর কিছুতেই ধরে রাখতে পারবে না। ধনশ্রী গোরুর গাড়ির চাকার ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ শুনতে পায়। ধুলো উড়িয়ে গাড়িটা চলে যাচ্ছে, ছইয়ের ভেতর ভৈরবী, না, চোখে আর পানি নেই, সব কান্না শেষ। মাথায় আর ঘোমটা নেই, সব লজ্জা শেষ। তখুনি উত্তেজিত অবস্থায় চেঁচিয়ে ওঠে ধনশ্রী, 'না, এ আমি হতে দেব না বউ। কিছুতেই হতে দেব না।' ও ভৈরবীর পাশে এসে বসে। ভৈরবী কথা বলতে পারে না। কেবল ঠোঁট নড়ে, 'আমি তোমাকে ছাড়া আর কাউকে জানি না গো।' ভৈরবীর ইচ্ছে করে এই কথাটা পাড়াময় চিৎকার করে বলতে। কিন্তু কে শুনবে? ছেলেদুটো সরবে চেঁচায়। ধনশ্রী ঘরের দরজা জানালা হাট করে খুলে রাখে।

যমজ ছেলের খবর জানাজানি হলেই রাজার লোক ছুটে আসবে। অসতীর দায়ে ভৈরবীর বিচার হবে। ভৈরবীকে ত্যাগ করতে হবে ধনশ্রীর। এটাই রাজার আইন। এক নারীর গর্ভে এক সঙ্গে দু-সন্তানের জন্ম মানে দু-জনের সঙ্গে যৌনসঙ্গম। সকলেই এটা বিশ্বাস করে। আর সঙ্গত কারণেই সমাজ থেকে ব্যভিচার দূর করার জন্যে রয়েছে কঠিন শাস্তি। রাজার দায়িত্ব সমাজকে কলুষহীন ও পবিত্র রাখা। এর আগে আরও দু-বার এ ধরনের ঘটনা হয়েছিল। সুভাষ তো বউয়ের শোকে পাগল হয়ে গিয়েছিল। আর চন্দ্রদাস নিজেই আইন হয়েছিল। বউকে ইচ্ছে করে ত্যাগ করেছিল। এতবড়ো ব্যভিচার নিজেই সহ্য করতে পারেনি। 'আমি অসতী নই' বলে বুক চাপড়ে কেঁদেছিল চন্দ্রদাসের বউ, কিন্তু চন্দ্রদাস শোনেনি, শোনার মতো মানসিকতা তার ছিল না। কিন্তু ধনশ্রী কী করবে? ধনশ্রী যে মনেপ্রাণে বউকে বিশ্বাস করে। ও কিছুতেই বউকে ত্যাগ করবে না, কিছুতেই না।

ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ও কাহ্নুপাদের কাছে ছুটে আসে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

‘এখন কী হবে কানু?’

সব শুনে দরজার ওপর বসে পড়ে কাহ্নুপাদ। কোনো কথা বলতে পারে না।

‘না, কানু আমি কিছুতেই বিশ্বাস করব না যে আমার বউ অসতী।’

‘তবে কেমন করে হল?’

‘জানি না, জানি না।’

ধনশ্রী অসহিষ্ণু কণ্ঠে জেদের সঙ্গে চিৎকার করে। বুকের ভেতর খচখচে কাঁটাটাকে প্রাণপণে চেপে রাখে। ওটা মাঝে মাঝেই গভীরে ঢুকে যেতে চায়।

‘আমার বউ যদি ব্যভিচার করেই থাকে তবু আমি ওকে ছাড়তে পারব না কানু।’

ভোরের ঠান্ডা বাতাসেও কাহ্নুপাদের মাথাটা গরম হয়ে ওঠে। কিছু ভেবে কুলিয়ে উঠতে পারে না। ধনশ্রী যতই আবেগের কথা বলুক এর পেছনে যুক্তি কী?

‘আমার বউকে আমি যদি ঘরে রাখি তার জন্যে রাজার কী কানু? আমি মানিনে রাজার আইন।’

কাহ্নুপাদ চমকে ওঠে। তাই তো, ব্যভিচার ওদের জন্যে শুদ্ধ, কিন্তু আমরা না করলেও তার বিচার হবে?

‘তুমি কথা বলছ না কেন কানু?’

‘মাথা ঠান্ডা করো ধনাদা। ভেবেচিন্তে এগুতে হবে।’

‘তুমি ভাবো। আমি ঘরে যাই। ঘরে অনেক কাজ।’

কিন্তু না, শেষরক্ষা করতে পারেনি ধনশ্রী। দুজন সন্তানের জন্যে দুজন বাবা, এ যুক্তিটা এত বেশি প্রবল যে এর বিরুদ্ধে কেউ মাথা তুলতে পারেনি। পনেরো দিন সময় দেয়া হয়েছিল ধনশ্রীকে। কিন্তু ধনশ্রী তা মানেনি। আইন ছিল পনেরো দিন শেষ হলে পরদিন ভোরেই ভৈরবীকে গোরুর গাড়িতে উঠিয়ে বাপের বাড়ির পথে রওনা করিয়ে দিতে হবে। ধনশ্রী ইচ্ছে করলে সঙ্গে যেতে পারে। কিন্তু রাজার সে আইন মানেনি ধনশ্রী। তাই পরদিন দুপুরে রাজার লোক এসে জোর করে ধনশ্রীকে ধরে নিয়ে গেছে। প্রথমে একজন এসে ছিল, তার সঙ্গে ধস্তাধস্তি করে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়েছিল। তারপর এসেছিল আরও চারজন। পাঁচজনের সঙ্গে পারেনি ধনশ্রী, যেতে হয়েছিল। আর সেজন্যেই চেঁচাতে চেঁচাতে গেছে ধনশ্রী, ‘আমার অসতী বউ নিয়ে যদি আমি ঘর করি তাতে রাজার কী? আমাদের ভালো রাজার দেখতে হবে না। চাই না এমন রাজা।’ বড়ো শক্ত কথা বলেছিল ধনশ্রী। কিন্তু বেশি বলতে পারেনি। পিটুনির চোটে মুখ দিয়ে গোঙানির শব্দ বেরুচ্ছিল কেবল। এই ঔদ্ধত্যে শঙ্কিত মন্ত্রী দেবল ভদ্র জনা পঞ্চাশেক রক্ষী পাঠিয়েছিল গাঁয়ে। সর্বত্র রাজার রক্ষী ঘুরে বেড়ায়। সারা গাঁ জুড়ে রাজার আইন থমথম করে। এর আগে এরকম বড়ো ধরনের কোনো ঘটনা আর ঘটেনি। লোকগুলো কেবল মাথা নীচু করে আইনই পালন করেছে, অবাধ্য হয়নি। আজ ধনশ্রী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পুরো ছকটা উলটে দিল। কঠিন মূল্য দিতে হবে তাকে। অপরাধ অনেক। অসতী বউ ঘরে রেখে ব্যভিচার প্রশ্রয় দেবার প্রবণতা। রাজার আইন অমান্য করা। রাজার বিরুদ্ধে কথা বলা। দেবল ভদ্র এতবড়ো ধৃষ্টতা কিছুতেই সহ্য করবে না। রাজদরবারে ছিল কাহ্নুপাদ, দেখেছে দেবল ভদ্রের টকটকে মুখে আগুনের আভা আর কঠোর দৃষ্টি। পুরো গ্রাম তছনছ করে দিতেও তার বাধবে না। কাহ্নুপাদ আশঙ্কা আর উৎকণ্ঠা নিয়ে দুপুরটা পার করেছে। ধনশ্রীকে চুনের ঘরে বন্দি করে রাখা হয়েছে। তার ভবিষৎ অনিশ্চিত, কী হবে কাহ্নুপাদ নিজেও তা জানে না। তার চোখের সামনে সব কিছু বিপরীত ধারায় উদ্ভাসিত হতে থাকে। কোথায় যেন আপন নিয়মে একটা ফোঁকর তৈরি হচ্ছে। সেটা ঠেকাবার সাধ্য কারও নেই। দেশে বৌদ্ধ রাজা, কিন্তু অধিকাংশ বৌদ্ধমন্দির ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। সংস্কারের প্রয়োজনে কেউ এগিয়ে আসে না, সর্বত্র ব্রাহ্মণের দোর্দণ্ডপ্রতাপ। সে প্রতাপে প্রাণ ওষ্ঠাগত কাহ্নুপাদদের মতো এক শ্রেণির লোকের। বৌদ্ধ ধর্মের মায়ামমতার কথা গল্পের মতো শুনেছে ওরা। সেটা পেলে জীবনটা হয়তো অন্যরকম হত। আরও একটু স্নিগ্ধ, আরও একটু শ্যামল। বিকেলে তড়িঘড়ি করে ফেরার পথে কাহ্নুপাদের চোখে পড়ে করুণ দৃশ্যটা। বুক হু-হু করে ওঠে। গোরুর গাড়ির পেছনে ভৈরবীর ভাই, মুখ নীচু করে হাঁটছে। খবর পেয়ে দু-তিন দিন আগে এসেছে। মুখ শুকনো, উশকোখুশকো চুল, বিভ্রান্ত দেখাচ্ছে ওকে। বোনকে গালাগাল করলেও ধনশ্রীর ব্যবহারে ও ভীষণভাবে আলোড়িত। দেশাখ গাড়ির সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছে। হয়তো অনেকদূর যাবে। কাহ্নুপাদ জানে ও কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি। কাহ্নুপাদ নিজেও পারেনি। ভৈরবী সকলের পায়ে ধরেছে। কেঁদে বলেছে, সে অসতী নয়। ও যে-কোনো পরীক্ষা দিতে রাজি। শুধু যেন ধনশ্রী ওকে ত্যাগ না করে। কিন্তু এখন রাজার চাইতে মন্ত্রীর শাসন প্রবল। তার মুখের ওপর কথা বলবে কে? ভৈরবীর অনুনয়বিনয় কাউকে স্পর্শ করেছে কাউকে করেনি। কেউ ঘৃণায় মুখ ফিরিয়েছে। সেজন্যেই গোরুর গাড়ির ছইয়ে মাথা ঠুকতে ঠুকতে চলে যাচ্ছে ভৈরবী। পেছনে ধুলো উড়ছে। ওকে আর চেনা যায় না। সন্তান জন্ম দেবার পর শরীরের যেটুকু অবশিষ্ট ছিল এমন একটা চরম পরিণতিতে তার শেষ কাঠামোটা ভেঙে গেছে। বড়ো ছেলে দুটোর সঙ্গে সঙ্গে ছোটো দুটোও সমানে কাঁদছে। কারও প্রতি ওর কোনো আকর্ষণ নেই। ভৈরবী যেন জাগতিক পৃথিবীর সমস্ত সুখ-দুঃখ থেকে হঠাৎ করে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে।

কয়েকদিন রাজার লোক বেপরোয়া ঘুরে বেড়ায় গাঁয়ে। কেউ যদি সামান্য কথাও এদিক ওদিক করে বলে সঙ্গে সঙ্গে ধরে নিয়ে যাবে। গাঁয়ে থমথমে পরিবেশ ভূতুড়ে হয়ে যায়। সন্ধ্যের পর কেউ আর বাইরে থাকে না। দরকার ছাড়া কারও সঙ্গে কথা বলে না। ভৈরবী চলে যাবার পরদিন কামোদ বউকে নিয়ে শবশুরবাড়ি গেছে। শ্বাসরুদ্ধকর এই পরিস্থিতি ওর জন্যে ভয়াবহ হয়ে উঠেছিল। পালিয়ে বাঁচতে চেয়েছে। ভৈরবীর বাসায় এখন আর সন্ধ্যাবেলায় বাতি জ্বলে না। শূন্য ঘর হা-হা করে। হাটুরেরা ও পথ দিয়ে ফেরার সময় চোখ তুলে চায় না। ধনশ্রী এখন বন্দি, কবে ছাড়া পাবে কেউ জানে না। কাহ্নুপাদ নিজে রাজদরবারে থেকেও কোনো হদিশ করতে পারেনি। ডোম্বি একদিন কাহ্নুপাদকে একলা পার করতে করতে বলেছিল, 'তুমি কেমন ঝিমিয়ে গেলে কানু?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

‘ধনাদার জন্যে মনটা পোড়ে।’

ডোম্বি খিলখিলিয়ে হাসে।

‘মনকে পুড়িয়ে কষ্ট দিয়ে লাভ কী? পারলে দেবল ভদ্রের বাড়িটা পুড়িয়ে দাও।’

‘আহ্ আস্তে মল্লারী।’

‘নদী আর নৌকা ছাড়া কেউ এখানে নেই। এদের অবিশ্বাস করি না। আর থাকলেই-বা কী?’

ডোম্বি জোরে জোরে নৌকা বায়। কাহ্নুপাদ হাঁটুতে মাথা রেখে বসে থাকে। গুণ টানে দুজন লোক। ওদের পেশিবহুল শরীরে আশ্চর্য জোয়ানকী। সবাই যদি অমন হত? ওরা কোথায় যায়? ওদের ধরে রাখা যায় না? ওরা গাঁয়ের জোয়ান ছেলেগুলোকে শরীর গড়ার কৌশল শিখিয়ে দিত।

সুলেখা যখন দেশাখের কাছে কথাটা পাড়ল তখন নিজের কানকে অবিশ্বাস করতে ইচ্ছা করছিল দেশাখের। তখন রাত, ফিকে জ্যোৎস্নায় সুলেখার মুখ তেমন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর সব কাজ সেরে দেশাখকে বাইরে ডাকে সুলেখা। রান্নাঘরের বারান্দায় পা ছড়িয়ে বসে, মুখে পান। রাশি চুল উঁচু করে খোঁপা বাঁধা। ঘরের ভেতর লোকী আর গুণীর হাসাহাসির শব্দ আসে। আমড়া গাছের মাথায় বসে একটা কাক থেমে থেমে ডাকে। সব কিছু কেমন বিরক্তিকর মনে হয় দেশাখের। এমনকি সুলেখার এই ডেকে আনার ভঙ্গিটাও।

‘কেন ডেকেছ বলছ না যে?’

‘তোমার দাদার তো কোনো খোঁজখবর পাওয়া যাচ্ছে না দেশাখ।’

‘হ্যাঁ, অনেক তো খোঁজখবর করলাম।’

‘আর হয়তো ফিরবে না।’

‘তাই তো মনে হয়।’

দু-জনে কিছুক্ষণ সময় কাটায়। কাকের ডাক আর নেই। দেশাখ হাই তোলে। সারা বিকেল ছেলেদের তির ছোড়া শিখিয়েছে। এখন ভীষণ ক্লান্তি লাগছে, বসে থাকতে ইচ্ছে করে না।

‘আমার ঘুম পাচ্ছে বউদি।’

‘বলছিলাম কি আমি একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি।’

সুলেখার গলা কেঁপে যায়।

‘সিদ্ধান্ত?’

‘হ্যাঁ। সুদাম আমাকে বিয়ে করতে চায়।’

‘বউদি?’

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

‘আমি রাজি হয়েছি দেশাখ।’

‘কী বলছ?’

‘তোমার ঘাড়ে বসে আর কতকাল খাব। তোমার দাদাও ফিরবে না। ভেবেচিন্তে দেখলাম নিজের পথ করে নেয়া ভালো।’

‘আমরা কি তোমাকে অনাদর করেছি?’

‘ছিঃ দেশাখ অমন কথা আমি কোনোদিন ভাবিনি এবং তোমার এই কষ্টের উপার্জনেও আমি খুশি ছিলাম। কিন্তু কতকাল টানবে? তোমার নিজেরও তো নিয়ে করতে হবে। এখন তুমিই ব্যাপারটাকে মিটিয়ে দিতে পারো।’

‘আমি ভেবে দেখি বউদি? আমাকে সময় দাও।’

দেশাখ আর দাঁড়ায় না। একরকম দৌড়ে নিজের ঘরে চলে আসে। বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ওর ভীষণ কান্না পায়। ছেলেমানুষের মতো শব্দ করে কাঁদে দেশাখ। পাশের ঘরে শুয়ে সে কান্না শোনে সুলেখা, বুকটা কেমন করে, কিন্তু কিছুতেই পিছুবে না। এখনই উপযুক্ত সময় পথ দেখার।

শেষ পর্যন্ত সুলেখার কথাই রাখতে হয় দেশাখের। গাঁয়ের একদম শেষ সীমান্তে নিরিবিলি সংসার পাতে সুলেখা। সুদাম পাকা চাষি। চাষবাস খুব ভালো বোঝে। সংসারে অভাব কিছুটা কম। দুজন মানুষের দিন ভালোভাবেই কেটে যায়। সুলেখার মনে হয় বহুদিন অন্ধকার ঘরে বন্দি থাকার পর ও ছাড়া পেয়েছে। এখন রোদ দেখছে, বাতাস পাচ্ছে। সুদাম ভারি ভালো মানুষ। নিরীহ, গোবেচারা। সুলেখার সংস্পর্শে জীবনের নতুন বাঁকবদলে সুখী। মাঝে মাঝে দেশাখের বুক খাঁ-খাঁ করে। সুলেখার জন্যে একটা শূন্যতা অনুভব করে। শ্বাশুড়ি মুখ বেঁকিয়ে বলে, ‘গেছে ভালো হয়েছে। আপদ গেছে।’ হুলটা হজম করা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। সংসারের হালটা ধরে রেখেছিল সুলেখা। এখন সেটা এলোমেলো, বিধ্বস্ত। লোকী, গুণী বউদিকে ভুলতে পারে না। লুকিয়ে দেখা করতে যায়। অরুণের লুকোছাপা নেই। সোজাসুজি এখন, ‘আমার বউদি’ বলে দাবি নিয়ে উপস্থিত হয় সুলেখার কাছে। সুলেখার মাঝে মাঝে খটকা লাগে। সংসারটা ছেড়ে এসেও এখনও ওটা যেন ওরই রয়ে গেছে।

সুলেখার ঘটনা অনায়াসে সবাই ভুলে যায়। কিন্তু ধনশ্রী সবার বুকের মধ্যে একটা কালো কাঁটা হয়ে গেঁথে আছে। কেউ ভুলতে পারে না। লোকটা আর ফিরে আসেনি। কী হয়েছে কেউ কিছু জানে না। কেউ কাউকে জিজ্ঞেস করতে পারে না। ভয়, পাছে কোনো অশুভ সংবাদ শুনতে হয়। কেবল বুকের নীচে খচখচ শব্দ টের পায়। যখন তখন রাজার লোক আসে। সামান্য কারণে একে ওকে ধরে নিয়ে যায়। দু-একদিন আটকে রেখে ছেড়ে দেয়, নয়তো মারধর করে। কাউকে কোনো কারণ জানাবার দরকার নেই। অপরাধ কী সেটাও জানে না। দেশাখের তিরধনুকের দলে জোয়ান ছেলে বাড়ে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিমাই, বাদল, গৌরঙ্গ, শিবু। ওরা শিকারের নামে দূরের বনে চলে যায়। সারা দিন পর ফিরে এলে এখন আর একটুও ক্লান্তি লাগে না দেশাখের। শরীরে যেন একটা আলগা যন্ত্রের আবির্ভাব হয়েছে। সেটা থেকে অনবরত শক্তি চুঁয়ায়। চুঁইয়ে চুঁইয়ে ধুয়েমুছে পরিষ্কার করে দেয় অবসাদ আর ক্লান্তি। সন্ধ্যায় নিজের হাতে তিতির আর হরিয়ালের পাখ ছাড়াতে ছাড়াতে ভুসুকুর কথা মনে পড়ে। দাদাটা সেই যে গেল আর কোনো খবর নেই। যদি বেঁচে থাকে? যদি ফিরে আসে? মুহূর্তে হাতের কাজ বন্ধ হয়ে যায়। ভয় করে দেশাখের। একজন মানুষের স্বপ্ন গুঁড়িয়ে যাবার ভয়। ধনশ্রী এ বোধটা সকলের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে গেছে। পরক্ষণে নিজেকে সামলে নেয়। আসলে সুলেখা যাওয়াতে পুরো সংসারের গোছানো ভাবটা নষ্ট হয়ে গেছে। মা খেয়ালখুশিমতো রান্নাবান্না করে। লোকী গুণী নিজেদের ইচ্ছেমতো ঘুরে বেড়ায়। সোহাগের কেউ নেই, শাসনের কেউ নেই। দেশাখ পাখি দুটো তৈরি করে মাকে ডাকে। মা ঘর থেকেই কোঁকাতে কোঁকাতে বলে, 'বাতের ব্যথায় উঠতে পারছি না বাবা।'

'রাতের খাওয়া হবে না?'

'দুপুরে যে চারটি ভাত আছে তা ভাগ করে খেয়ে নে। রাতে তো ঘুমিয়ে থাকবি। আর রাঁধতে পারব না।'

'পেটে খিদে থাকলে আমার ঘুম আসে না।'

দেশাখের মেজাজটা খারাপ হয়ে যায়। মার কাছ থেকে কোনো জবাব আসে না। অগত্যা দেশাখ কুয়োতলায় গিয়ে পাখি দুটো ধুয়ে আনে। উনুন জ্বালিয়ে ঝলসে নেয়। এর বেশি কিছু করার সাধ্যি ওর নেই। তারপর বারান্দায় বসে মনের সুখে কামড়ে খায়। ভালোই লাগে, প্রতিদিনের রাঁধা তরকারির চাইতে স্বাদটা ভিন্ন তো বটেই। সারাদিনের পরিশ্রমে পেটে ভীষণ খিদে। সুলেখা থাকলে কিছু তৈরি খাবার পাওয়া যেত। না, সে-কথা ভেবে মন খারাপ করে না ও।

একটু পর নিঃশব্দে লোকী গুণী ঢোকে। দেশাখকে বারান্দায় দেখে দু-জনের বুকের মধ্যে ভীষণ তোলপাড়। ধরা পড়ে যাবার ভয়, কিন্তু দেশাখ খাবার আনন্দে ওদের খেয়াল করে না। দু-জনের কোঁচড়ভরা শামুক। চুপচাপ ঘরের কোণে ঢেলে রেখে দু-জনে কুয়োতলায় আসে। ঝপাঝপ পানি ওঠায়। লোকী হেসে গড়িয়ে পড়ে।

'নিখিলদার মতো মানুষ হয় না, না রে গুণী?'

'ঠিক বলেছিস।'

'আজ তোকে অনেকক্ষণ রেখেছিল। পাহারা দিতে আমার যা ভয় করছিল। সারাক্ষণ মনে হচ্ছিল এই বুঝি কেউ এসে পড়ে।'

'ভয় না ছাই।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

‘কেন?’

‘ভাবছিলি গুণীটা এলেই আমি নিখিলদার কাছে যেতে পারি। তোর দেরি সইছিল না।’

‘যাঃ মিছে কথা।’

‘বুঝি রে বুঝি।’

দু-জনেই শব্দ করে হাসে। তারপর ঘরে এসে দুপুরের চাট্টি ভাত খেয়ে শুয়ে পড়ে। কিন্তু দু-জনে দু-পাশে শুয়ে থাকলেও ঘুম আসে না কারোই। নিখিলদার সঙ্গে কেমন একটা মজার কাণ্ড ঘটে যায়। এতদিন এতসব কথা কিছুই জানতো না। পা থেকে মাথা পর্যন্ত কেমন জানি করে।

‘ঘুম আসছে না গুণী!’

‘আমারও আসছে না।’

আবার চুপচাপ। দু-জনের নিশ্বাস ওঠানামা করে। একে অপরের পিঠের সঙ্গে লেগে আছে। একসময় লোকী ফিসফিস করে ডাকে।

‘গুণী?’

‘বল।’

‘আমার এখন মরে যেতে ইচ্ছে করছে।’

‘ঠিক বলেছিস, আমারও।’

আবার চুপচাপ। নিজেদের ওপর বিরক্ত হয় নিজেরাই। চোখ ব্যথা করে। জোর করে আর কতক্ষণ চোখ বুঁজে থাকা যায়।

‘লোকী?’

‘বল।’

‘আমার খুব মনখারাপ লাগছে।’

‘আমারও।’

‘চল বাইরে গিয়ে বসি।’

‘চল।’

দু-জনে উঠে বাইরে আসে। উঠোনে আমড়া গাছের ছায়ার আলপনা। বারান্দায় পা ছড়িয়ে বসে থাকে ওরা।

‘এসব কথা কাকে জিজ্ঞেস করা যায় রে?’

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

‘চুপ চুপ। কাউকে না।’

‘চল ঘরে যাই।’

‘চল।’

দু-জনে আবার ঘরে এসে শোয়। চুপচাপ। কিন্তু প্রাণপণ চেষ্টাতেও ঘুম আসতে চায় না ওদের।

দেখতে দেখতে হুট করে চোত মাস এসে পড়ে। এ মাসে কাম মহোৎসব হবে। শুকনো খটখটে খেতে জল ঢেলে কাদা বানিয়ে বাদ্য বাজিয়ে গান আর জোড় নৃত্য হয়। সকলের বিশ্বাস এতে পরিতুষ্ট হয়ে কামদেব প্রচুর শস্য দেবে। চৈতালি ফসলে ভরে উঠবে আঙিনা। আর শস্যের প্রাচুর্য মানেই ধন। এ উৎসবের জন্যে যুবক-যুবতীদের বাছাই করে গাঁয়ের বুড়োরা। দশজোড়া যুবক-যুবতী নাচবে, সারারাত উলঙ্গ হয়ে। ভোররাতে ফিকে আঁধারে মিলিত হবে তারা। সে মিলনের বীর্যপাত শস্যের প্রাচুর্য বয়ে আনবে। উৎসবের তোড়জোড় শুরু হয়। জমি ঠিক হয়। এক-একবার এক-এক জমিতে উৎসব হয়। চিঁড়া আর নারকেল দিয়ে তৈরি নানারকমের খাবার এ রাতের প্রধান দিক। সব বাড়িতে এক আয়োজন। যুবক-যুবতীদের সে খাদ্য পোঁটলা করে বেঁধে দেয়া হবে। ওরা উৎসবের আগে খাবে, জমিতে ছিটাবে, কামদেবের কাছে প্রার্থনা করবে। যখন পটহ মাদলে শব্দ উঠবে শুরু হবে ডোম্বির গান, তখন থেকে উৎসবের শুরু। সন্ধ্যার আলো-আঁধারি মিলিয়ে গেলে ওরা গান গাইতে গাইতে জমিতে যাবে, তেমন একটা জমির কাছে যে ফসল দেবে, জীবন বাঁচাবে। প্রাচুর্যে, ধনে, সুখে, শান্তিতে সে জীবন মহিমান্বিত হবে। প্রথমবারের মতো লোকী, গুণী এবার এ উৎসবে যোগ দেবে। দুজনের খুশির শেষ নেই। লোকী নাচবে নিমাইর সঙ্গে, গুণী শেখরের সঙ্গে। প্রতিবছরই নতুন নতুন জোড় ঠিক হয়।

বিকেলবেলা গা ধুয়ে, চুল বেঁধে, চোখে কাজল টেনে লোকী এবং গুণী অস্থির হয়ে ওঠে। মা চিঁড়ে নারকেল পায়েস রেঁধেছে। কলাপাতায় পোঁটলা করে বেঁধে নিয়েছে ওরা। বাড়িতে খাবার নিয়ম নেই ওদের। মা মনে মনে প্রার্থনা করে যেন কোনো ছেলের চোখে পড়ে যায় ওরা। তাহলে বিয়ের জন্যে কোনো ঝইঝামেলা হবে না। বুড়ো বাপ অসুস্থ। কে আর এ দায়িত্ব পালন করবে।

নাচতে গিয়ে পা যেন আর উঠতে চায় না লোকীর। কেবলই নিখিলের কথা মনে পড়ে। নিমাই না হয়ে নিখিল হলে আনন্দ হত বেশি।

‘এই লোকী সন্ধ্যারাতেই ঝিমুচ্ছিস কেন?’

নিমাই ওর কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দেয়।

‘ইস তুই যেন কী?’

‘আমাকে তোর পছন্দ হয়নি?’

‘হয়েছে।’

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

‘না হয়নি। তোর শরীরে তেমন সাড়া নেই।’

‘ছাই বুঝিস।’

লোকী ওর বুকের সঙ্গে মিশে যায়। গলার কাছে নাকটা ঘষে। নিমাই শরীরে ঝাঁকুনি দিয়ে উদ্দাম নেচে ওঠে, রক্তে মাতাল বন্যা। সবার এক অবস্থা। নাচটা যেন জীবনযাপনের অঙ্গ হয়ে গেছে। কামদেবতা তুষ্ট হলে ফসল ফলবে। সে ফসলে পেট ভরবে। নইলে উপোস। সেজন্যেই এ নাচের সঙ্গে আরও কিছু থাকে। ফসলের প্রাচুর্যের আবেগ। সেজন্যে এ নাচে ঢিলেমি সয় না। উদ্দাম হয়ে ওঠা প্রথম শর্ত। এ আসরে ওরা নতুন। কিছুটা দ্বিধা, কিছুটা জড়তা ওরা কাটিয়ে উঠতে পারে না। তবু এটা একটা সামাজিক স্বীকৃতি। এতে সকলের সমর্থন আছে। এই একটা রাত ওরা নিজের করে পেয়েছে। এভাবে আর কোনোদিন পাবে না। পটহ মাদলের দ্রিম দ্রিম শব্দ ক্রমাগত বাড়ছে। সে সঙ্গে বাড়ছে ডোম্বির গলা। সেই সঙ্গে বাড়ছে শরীরের উত্তেজনা, নৃত্যের উদ্দামতা। আস্তে আস্তে নিখিলের কথা ভুলে যায় লোকী। সেই ঝিমুনিভাব আর নেই। গুণী প্রথম থেকেই শেখরের সঙ্গে জমে গেছে। মন খারাপের বালাই নেই ওর। আজ রাত এবং এই নাচের অনুষ্ঠানই ওর কাছে আনন্দের। অন্ধকারে কেউ কারও মুখ পুরো দেখতে পায় না। কেবল কতগুলো অবয়ব। তীক্ষ্ণ। ধারালো। অন্ধকার ভেদ করে তার নগ্ন দ্যুতি ছড়িয়ে পড়ে। ডোম্বি গান গাইতে গাইতে ভাবে, আজকের অনুষ্ঠানের ছোঁড়াগুলো যেমন মরদ, ছুঁড়িগুলোও তেমন, কেউ কারও চাইতে কম না। নিজের ষোলো বছর বয়সটা কল্পনা করে বুক ফেটে শ্বাস বেরোয়। ক্রমাগত ডোম্বির জোর নিস্তেজ হতে থাকে। মাঝরাত পেরিয়ে গেছে। আর একটু পর ওরা চলে যাবে। তখন আর বাজনার দরকার হবে না। গানের দরকার হবে না। ছেলেমেয়ের শরীরটা আপন নিয়মে বাজবে, গাইবে।

পিচ্ছিল মাটি কাদায় থ্যাকখ্যাক করছে। বার বার পা পিছলে যায় লোকীর। নিমাই শক্ত হাতে ধরে রাখে। আশেপাশের অনেকেই সরে পড়েছে। দূরে দূরে ঘাসের উপর শুয়ে পড়েছে। শেখরের হাত ধরে গুণী চলে যাচ্ছে। তার পেছনে সুমন্ত আর পারুল। লোকীর বুকটা কেমন জানি করে। পায়ের নীচে থকথকে কাদা। এতক্ষণ কিছু মনে হয়নি। এখন শরীরটা কেমন কুঁকড়ে আসে। ভালো লাগে না। কিন্তু আজকের রাতের নাচের উদ্দেশ্য ভেবে নিজেকে শাসন করে। প্রাণপণে ভালো লাগাতে চায়। নিমাই আবার ওকে ঝাঁকুনি দেয়।

‘আমাকে তোর পছন্দ হয়নি লোকী?’

‘বার বার একটা কথা বলিস কেন বল তো?’

‘তুই যে যাবার কথা বলিস না? মাটি তৈরি না হলে কি ফসল ফলে?’

নিমাইর কণ্ঠ করুণ শোনায়।

‘আমি কি মাটি?’

‘এসব কী বলিস? সব তো জানিস।’

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

‘কিছু মনে করিস না নিমাই এত নাচের পর সব কেমন এলোমেলো লাগছে।’

নিমাই ওকে বুকে টেনে আদর করে। ‘তুই উর্বরা ধরণি। আমি চাষা, চাষ করি। লোকী এই জন্যেই তো এত আয়োজন। এলোমেলো লাগলে সারা বছর নষ্ট হয়ে যাবে।’

‘না রে আমি ঠিক আছি। তুই মিছে ভাবনা করিস না। চল যাই।’

‘তুই একটা পাকা চাষি হবি নিমাই।’

‘হবই তো। চাষির ছেলে চাষি হব না তো দেশের রাজা হব?’

‘হলে বেশ হত।’

‘বুঝতে পারছি তোর মনটা অন্য কোথাও বাঁধা পড়ে আছে। তাই এমন আনমনা। তোর এখানে আসা ঠিক হয়নি। দেবতা রুষ্ট হবে।’

‘দূর কী যে বলিস আবোলতাবোল।’

লোকী ভয় পায় কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে উড়িয়ে দেয় এসব কথা। শব্দ করে হেসে ওঠে। নিমাইর গায়ে ঢলে পড়ে। নিমাই যদি এসব কথা কাউকে বলে তাহলে কী যে লজ্জা। কারও কাছে মুখ দেখানো যাবে না। সকলে ছি ছি করবে। লোকী সপ্রতিভ হবার চেষ্টা করে। নিমাই ওকে নিয়ে ঘাসের ওপর বসে পড়ে। কাছাকাছি সবাই আছে। কেউ কাউকে খোঁজে না। নেশার জমাট অবস্থা যেন। চারদিকে অন্ধকার। দূর থেকে শেয়ালের ডাক ভেসে আসে। উদোম মাঠে হা-হা বাতাস বয়, মৃদু অথচ শীতল। সবার মনের মধ্যে ফসলের স্বপ্ন। সবার শারীরিক চেতনায় নতুন ধানের অনুভব। নিমাই পাকা চাষির মতো চাষের কাজে মন দেয়। নরম হাতে মাটি কোপায়। আগাছা সাফ করে। তারপর ভীষণ যত্নে গাছ বোনে। নিমাই ফসলের প্রার্থনায় ওর সমস্ত শরীর মন উৎসর্গ করে দেয়। লোকী মাটি হয়ে বুকে টানে।

কাম উৎসবের পর গোটা পাড়ায় চাষের সাড়া পড়ে যায়। সুদামের এক মুহূর্তের সময় নেই। দুপুরে ঘরে ফেরে না। খাবার বেঁধে নিয়ে যায়, ফেরে সেই সন্ধ্যায়। সুলেখা একলা ঘরে বসে চাঙারি বোনে। একটুও খারাপ লাগে না। জীবনের কোথাও আর কোনো ফোঁকর নেই, সব শূন্যতা ভরে গেছে। শরীরের অন্তঃস্থলে আর একটি প্রাণের শব্দ বাজে। সুলেখা আনমনা হয়ে সে শব্দ শোনে, কে যেন দু-পায়ে টলতে টলতে ওর দিকে ছুটে আসছে। ভুসুকুর সঙ্গে পাঁচ বছর বিবাহিত জীবন যাপন করেছে। কোনো ছেলেমেয়ে হয়নি। সেই অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা এখন সুলেখার ছোট্ট ঘরে দ্বিগুণ আনন্দে ফিরে আসে। যেদিন সুদামকে খবরটা দিয়েছিল সেদিন সুদাম কেমন বিব্রত, ভয়ার্ত মুখে ওর দিকে চেয়েছিল। কথা বলতে পারেনি।

‘কী হল তুমি খুশি হওনি?’

‘খুশি? হ্যাঁ খুশি হয়েছি তো।’

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুদাম আড়ষ্ট কণ্ঠে কোনোরকমে কথা ক-টি বলেছিল। তারপর কেমন এলোমেলো স্বরে বলেছিল, 'বাচ্চা হতে গিয়ে তোমার যদি কিছু হয় তাহলে আমি বাঁচব না সুলেখা।'

'কী হবে?'

সুলেখা অবাক হয়ে তাকিয়েছিল।

'যদি কোনো অঘটন ঘটে?'

'যাঃ কিচ্ছু হবে না। ভয় করলেই ভয়। তুমি কিচ্ছু ভেবো না।'

সুলেখা জানত না সুদামের আগের বউ বাচ্চা হতে গিয়েই মারা গিয়েছিল। খবরটা সুদামকে খুশি করেনি। সন্তানে ওর তেমন আকাঙ্ক্ষা নেই। ও চায় একজন ভালো বউ আর নিরিবিলি সংসার। কাজ শেষের পর খোশগল্প। তারপর প্রশান্তির ঘুম। একদল ছেলেমেয়ের ঝইঝক্কি ওর পছন্দ নয়। তবু সুলেখার ঝলমলে মুখের দিকে চেয়ে আর কিছু বলেনি ও। একা একা বুকের মধ্যে অকারণ বেদনা বহন করা। সারাক্ষণ হারাই হারাই ভাব। চাষের কাজে মন বসে না ঠিকমতো। এদিকে সুলেখা সপ্তাহে দু-দিন পিপুল গাছের গোড়ায় জল ঢেলে তিনবার প্রদক্ষিণ করে পুজো করে। পুত্রসন্তান চায়। উপার্জনক্ষম পুত্র। বাপ-মার বুড়ো বয়সের দায়দায়িত্ব যে নিজের কাঁধে নেবে। সুলেখা পেটের সন্তানকে কেন্দ্র করে সেই অনাগত দিনের স্বপ্ন দেখে।

রাজদরবারে পাখা টানার কাজটা আর ভালো লাগে না কাহ্নুপাদের। যে কাজটার জন্যে নিজেকে ধন্য মনে হত আজ সেটার ওপর ভয়ানক বিতৃষ্ণা। জীবিকার প্রশ্নে আপোশে আর মন ওঠে না। অন্ন যেন গলা কামড়ে ধরে নামে। সে জ্বালা বিষের মতো সারা শরীরে ছড়িয়ে যায়। মনে হয় অন্ন নয় অপমান আর অবজ্ঞার দলাগুলো থোক থোক নামছে। সারাদিন কেমন বিষন্ন হয়ে থাকে কাহ্নুপাদ। এ চাকরিটা ছেড়ে দিলে একটা অনিশ্চিত জীবনের মোকাবিলা করতে হবে। প্রতিদিন খাবার জুটবে না, দিনের পর দিন উপোসেও কাটতে পারে। তবু সমগ্র অস্তিত্ব তাতেই সাড়া দেয়। দারিদ্র্যে আপত্তি নেই, অভাব সইতে পারব। কোনো কিছুতেই এখন আর ভয় নেই। পিছু হটতে এখন ওর প্রচণ্ড ঘৃণা।

একদিন খাবার সময় শবরী কেমন অসহায়ের মতো তাকিয়ে ব্যাকুল হয়েছিল, 'খাচ্ছ না কেন? রান্না ভালো হয়নি?'

কাহ্নুপাদ ম্লান হাসে। শবরীর সিঁথিটা চওড়া মনে হয়।

'রান্না খুব ভালো হয়েছে। কিন্তু ইদানীং খেতে আমার একটুও ভালো লাগে না।'

'কেন? শরীর খারাপ? কই আমাকে বলোনি তো? আজই আমি হরিহর কবরেজের কাছ থেকে বড়ি নিয়ে আসব। বোধহয় হজমে গণ্ডগোল হয়েছে।'

শবরীর উৎকণ্ঠিত মুখের দিকে তাকিয়ে কাহ্নুপাদ কিছুক্ষণ কথা বলতে পারে না। একটুক্ষণ থেমে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলে, 'ভাবছি চাকরিটা ছেড়ে দেব শবরী।'

'কেন?'

'ওদের ওই অপমান আর অবজ্ঞা সইতে পারছি না আমি।'

'তাহলে খাব কী আমরা?'

'অন্য কোনো কাজ জুটিয়ে নেব। একটু অভাব হবে, পারবে না সইতে? তুমি কী বলো শবরী?'

শবরী কথা বলে না। মুখ নীচু করে রাখে। তরকারির বাটিটা নাড়াচাড়া করে। সেই আনত মুখের দিকে তাকিয়ে কাহ্নুপাদ বোঝে যে শবরীর সায় নেই। ওই চাকরিটুকুর জন্যে তবু ভাত ভাত জোটে, না থাকলে উপোস। নিরম্বু উপোস মানতে শবরী রাজি নয়। ও চায় একটু সুখ, কিছুটা নিরুদ্বেগ দিনযাপন। শবরী মল্লারী নয়। মল্লারী হলে ওই অপমানের কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে তখুনি চেঁচিয়ে উঠত, 'ওখান থেকে তুমি চলে এসো কানু। দুটো মানুষের পেট একরকম করে চলে যাবে। ও নিয়ে ভাবতে হবে না। তবু ওই অপমানের দলা গলা দিয়ে নামাতে পারব না।' অথচ শবরী কথা বলতে পারছে না। ওর ধাতই আলাদা। কাহ্নুপাদ ভাত নিয়ে নাড়াচাড়া করে। শবরী জল আনার ছলে সামনে থেকে উঠে যায়। কাহ্নুপাদ হাসে। তার এই মানসিক আশ্রয়টুকুর জন্যেই মল্লারীর কাছে ছুটে যেতে হয়। ও মাঝনদীতে নৌকা ঠেকানোর মতো অবলীলায় শক্ত হাত বাড়িয়ে দেয়, একটুও ভয় পায় না। শবরীর আনত মুখের সৌন্দর্য ওকে যতই বিচলিত এবং মোহিত করুক না কেন সেদিকে তাকিয়ে কাহ্নুপাদ নিজের সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসতে পারে না। তেমন বুঝলে শবরীকে রেখে ও একাই এগিয়ে যাবে, প্রয়োজন নেই শবরীর। শরীরের ভেতর কোথায় যেন একটা ইস্পাতের ফলা গেঁথে আছে, সেটা থেকে প্রয়োজনমতো আগুনের রশ্মি ঝলকায়, সে রশ্মি কাহ্নুপাদের ধ্যানধারণায় নতুন প্রলেপ দেয়, বদলে যায় কাহ্নুপাদ। অপমানের আগুনে পুড়ে ও কালো হয়ে গেছে। সেদিন সারাদিন শবরী কথা বলেনি। মুখ গুঁজে শুয়েছিল। কাহ্নুপাদ ওর ওপর রাগতে পারে না, বরং ওকে বুঝতে চায়। যে ব্যঞ্জনায় শিল্পী হয়ে ওঠে সে, একই ব্যঞ্জনায় ও শাণিত হতে পারে না কেন? যার লক্ষ্যভেদী আঘাতে এঁফোড় ওঁফোড় হয়ে যায় নির্ধারিত বস্তু?

কাহ্নুপাদ মাটিতে বসে শবরীর গভীর চুলে হাত ডুবিয়ে ডাকে ওকে, 'ওঠো সই মিছে ভয় পেয়ো না।'

শবরীর ডাগর চোখের কালো তীরে জলের রেখা। আসলে কানু ছাড়া ও আর কিছু বোঝে না। কানুর সঙ্গে ওর তেমন কোনো ঝগড়াঝাটি হয়নি। যত মন খারাপই করুক সেটা কাটিয়ে উঠতে সময় লাগে না শবরীর। আজও ফিক করে হেসে কাহ্নুপাদের ঘাড়ে মুখ গোঁজে। নাকের ডগা লাল হয়ে গেছে।

'কানু তুমি যা করতে চেয়েছ তাই করো। দুজন মানুষের আর ভাবনা কী! কোনোমতে চলেই যাবে। এমনিতে তো আমরা রাজার সুখে নেই। আর একটু অভাব হবে এই যা। তুমি সইতে পারলে আমিও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পারব। তোমার জন্যে আমি সব করতে পারি কানু।'

কাহ্নুপাদের বিস্মিত মুখের দিকে তাকিয়ে শব্দ করে হেসে ওঠে ও। নাকটা চেপে ধরে।

'দেখছ কী? আমি সত্যি বলছি। প্রথমে মন খারাপ হয়েছিল। এখন আর আমার একটুও মনখারাপ করছে না। আমি ভেবে দেখলাম তোমার কথাই ঠিক। ধনাদাকে ওরা কী কষ্টটাই না দিল? ভৈরবীর জন্যে বুকটা আমার কেমন করছে।'

কাহ্নুপাদ শবরীর চুলে মুখ ডুবিয়ে রাখে। মনে হয় ওখান থেকে ভিন্ন ঘ্রাণ আসছে। শবরীর যে সৌন্দর্য কাহ্নুপাদকে প্রতিনিয়ত সঙ্গ দেয় তা নিয়ে শবরী দূরে সরে যায়নি, বরং কাছে এসেছে, আরও গভীরে। শবরীর নির্বিবাদ সমর্পণ ওকে আনন্দ দেয়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সে এটাও অনুভব করে যে শবরীর সমর্পণটা তেমন জরুরি নয়। ও সমর্পণ না করলেও কাহ্নুপাদ যা চাইছিল তা হত। ওকে কেউই পিছু টানতে পারত না। নিজের এ পরিবর্তন কাহ্নুপাদকে সাহসী করে তোলে।

নৌকার ওপর কথাটা শুনেই বইঠা থেমে যায় ডোম্বির হাতে। হাঁ-করে তাকিয়ে থাকে কিছুক্ষণ। কাহ্নুপাদের মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, চোখে রাত জাগার ক্লান্তি, কেমন বিশুষ্ক চেহারা। মনে হয় ভেতরে প্রচণ্ড ওলটপালটের ক্ষান্তিহীন আক্রোশ।

'কী বলছ তুমি কানু?'

'বিশ্বাস হচ্ছে না?'

'ভালোই হয়েছে কানু। তোমাকে আমি নৌকা বাওয়া শেখাব। সারা দিন পারাপার করে যা পাব তা ভাগ করে নেব। তাতে তোমার চলে যাবে, কী বলো?'

'সে দেখা যাবে। পেটের কথা অত চিন্তা করি না।'

'এখন থেকে তুমি সারাদিন গীত লিখবে। এই ঘাটে বসেই লেখো। পারাপার করতে ভালো না লাগলেও আপত্তি নেই। সন্ধ্যায় তোমার কড়ির ভাগ আমি তোমাকে দিয়ে দেব।'

কাহ্নুপাদ হো-হো করে হাসে। অপ্রস্তুত হয়ে যায় ডোম্বি।

'হাসছ যে?'

'আমার জন্যে তোমার ভাবনা দেখে হাসছি।'

'তোমার সবটাতে ঠাট্টা।'

'রেগো না মল্লারী। একটা কিছু জুটিয়ে নেয়া এমন আর কঠিন কী? কাজ না পেলে বনের ফলমূল তো আছে, ভাত নাই-বা খেলাম। তবু ওই অপমান আর সয় না।'

কাহ্নুপাদের দৃষ্টি ঝকমক করে। মল্লারী কথা বলে না। সেটা যে ওরও মনের কথা। শুধু কয়েকটা কথা বলে তার কি প্রকাশ হয়? কেবল হাতের বইঠা ছপছপ বায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেবল ভদ্রের সামনে কথা বলতেই বাঘের মতো গর্জে ওঠে মন্ত্রী। সে জানে কাহ্নুপাদ আরও একশোজনের মতো নয়। একটু আলাদা। কাহ্নুপাদ ভাবতে জানে। ইচ্ছে-অনিচ্ছের কথা প্রকাশ করতে জানে। কেবল মাথা পেতে সব কিছু মেনে নেয় না। সেজন্যে কাহ্নুপাদের ওপর একটা রোষ আছে দেবল ভদ্রের। আছে মনের ভেতর কিছুটা ভয়ও, পাছে অপমান করে এই ভয়। তা ছাড়া কাহ্নুপাদ গীত রচনা করে সেটা আরও অসহনীয়। ছোটোলোকের বাড় সীমাহীন মনে হয়। সেটা কিছুতেই সম্ভব না। বেশি সহ্য করলেই ছোটোলোকগুলো মাথায় চড়ে বসবে। কাহ্নুপাদ তার সামনে আর কাজ করবে না বলতেই তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠে দেবল ভদ্র। এতবড়ো কথা তার মুখের সামনে দাঁড়িয়ে বলার সাহস কারও নেই। ছোটোলোকগুলো কেবল হুকুম শোনার জন্যে। অন্য কোনো ধরনের কথা বলার অধিকার ওদের নেই। তাই কাহ্নুপাদের ঔদ্ধত্য ও ধৃষ্টতা অসহ্য।

দেবল ভদ্র পারলে ওর টুঁটি চেপে ধরে। 'এতবড়ো কথা বলার সাহস তোর হল?'

'সাহসের কী আছে? আমি আর কাজ করব না শুধু এটাই তো বলেছি।'

'কেন কাজ করবি না শুনি?'

'আমার ভালো লাগে না।'

'কী? কী বললি?'

দেবল ভদ্র হিংস্র দৃষ্টিতে তাকায়। কাহ্নুপাদ আবারও বলে, 'আমার ভালো লাগে না।'

'তাহলে করবি কী? গীত লিখবি?'

দেবল ভদ্রের বিদ্রূপাত্মক কণ্ঠে দপ করে জ্বলে ওঠে কাহ্নুপাদ।

'হ্যাঁ তাই করব। ওটাই আমার কাজ।'

'হ্যাঁ তাই করব।' দেবল ভদ্র চিবিয়ে চিবিয়ে বলে।

'কাজে যা। আর যেন এ ধরনের কথা না শুনি।'

দেবল ভদ্র ওকে আর কোনো কথা বলার সুযোগ না দিয়ে গটগট করে অন্যত্র চলে যায়। আজ দরবারে কীসের যেন উৎসব, সবাই ব্যস্ত। কাহ্নুপাদ নিঃশব্দে বেরিয়ে আসে, বুকভরে শ্বাস নেয়। আজ থেকে ও মুক্ত, কোথাও কোনো দায়ভার নেই। নিজের ইচ্ছেমতো চলাফেরা। তবুও বুকটা থরথর করে ওঠে। দেবল ভদ্রের পরবর্তী আচরণ ওকে শঙ্কিত করে রাখে। আজ সারারাত রাজদরবারে উৎসব হবে, কাল ছুটি। তারপর? কাহ্নুপাদ সব ভাবনা ঝেড়ে ফেলে জোরে হাঁটতে থাকে। ভাবলে অকারণে বুক আতঙ্কিত হবে। তার চেয়ে ওই চুকিয়েবুকিয়ে দেবার চেষ্টাই ধরে রাখা ভালো। এতে শক্তিতে স্রোত বাড়ে।

পথে দেশাখের সঙ্গে দেখা। কাঁধে দুটো বনমোরগ ঝুলিয়ে গান গাইতে গাইতে ফিরছিল ও।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

‘কী ব্যাপার কানুদা অমন জোরে জোরে হাঁটছ যে?’

‘কাজটা ছেড়ে দিয়ে এলাম।’

‘মানে?’

‘মানে আর কী? ওদের ওই অপমান আর সইছে না।’

‘উঃ কানুদা ঠিক করেছ। এবার আমরা একটু অন্যরকম হব। ওদের বোঝাতে হবে আমাদের ভেতরেও মানুষ আছে। কেবল ছোটোলোক নেই।’

‘আমারই ভুল হয়েছিল দেশাখ। ভেবেছিলাম রাজদরবারে নিজের লেখা গীত পড়লেই আমার ভাষার সম্মান হবে। এখন দেখছি আসলে তা নয়। কেবল রাজদরবারই কোনো ভাষাকে টিকিয়ে রাখতে পারে না। ওরা যতই সংস্কৃতের কদর করুক ওটা কারও মুখের ভাষা নয়। ওটাকে বাঁচিয়ে রাখবে কে? আমাদের ভাষা আমাদের মুখে মুখে বেঁচে থাকবে দেশাখ।’

‘ঠিকই বলেছ কানুদা। রাজদরবার কোন ছার! নিজেরাই নিজের ভাষার সম্মান করব। ওদের কোনোকিছুতে আমাদের দরকার নেই।’

দু-জনে আবার চুপচাপ হাঁটে। দু-জনের ভেতরেই উত্তেজনা।

‘তুমি এখন কী করবে ভাবছ কানুদা?’

‘এখনও ভাবিনি।’

‘চলো তোমাকে তিরধনুক চালানো শেখাই। তারপর দু-জনে শিকার করব। যা পাই দু-জনে ভাগ করে নেব কানুদা। তোমার হবে না তাতে?’

‘খুব হবে।’

‘তুমি যেন কিছু ভাবছ?’

‘দূর পাগল।’

খোলা প্রান্তরে দাঁড়িয়ে কাহ্নুপাদ ঠা-ঠা হাসে।

‘যাদের সম্বল নেই তাদের আবার সম্বলের চিন্তা কী রে?’

‘আমিও তো তাই বলি।’

কাহ্নুপাদ দেশাখের ঘাড়ে হাত রাখে। আশেপাশে খুব একটা লোকজন নেই। চারিদিকে বুক-চেতানো উদোম মাঠ হাঁ-হাঁ করছে। বিক্ষিপ্ত গাছ। দূরে দূরে দাঁড়িয়ে। যেন অনেকদূর থেকে কেউ ছুঁড়ে মেরেছে। তাই এখানে ওখানে পড়ে আছে, কুড়োবার কেউ নেই, অযত্ন এবং অবহেলাই সই। সরু মেঠো পথে কাহ্নুপাদের পদক্ষেপ আজ অন্যরকম। দেশাখের চঞ্চলতাও বাড়ে। দু-জনের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনের ভেতর সুখের পাখি নড়চড়া করে। দু-জনেই হাঁটতে হাঁটতে ভাবে, নদীটা খুব কাছে। আরও দূরে হলে ভালো হত। হাঁটতে একটুও ক্লান্তি নেই।

পরদিন ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে হাত-পা ছুড়ে আড়িমুড়ি ভাঙে কাহ্নুপাদ। খুব ভালো লাগছে। জানালা গলিয়ে রোদ এসেছে। কখনো এত বেলা পর্যন্ত ঘুমোয় না ও। আজকের প্রসন্ন সকাল কাহ্নুপাদের জীবনের বাঁক বদলের সূচনা। ও বিছানায় শুয়ে গান গায়। তারপর সারা দিন একরকম ওঠেই না। বিছানায় গড়িয়ে, গীত লিখে দিন কাটাতে চায়। শবরীও খুনসুটি করে।

কখনো পাখির পালকের কলমটা নিজের মাথায় গুঁজে রাখে। কখনো চুলের গোছা সামলাতে সামলাতে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে কাহ্নুপাদের সামনে। কাহ্নুপাদ ঘরে থাকলেই ওর আবেগটা বদলে যায়, তখন যা নয় তা করতে ইচ্ছা করে, এবং কাহ্নুপাদের কাছে তা অবলীলায় প্রশ্রয় পায়। একটা পুরো গীত লেখার আবেগে কাহ্নুপাদ এখন উদার। কোনোকিছুতেই বাধা নেই। আজ নিজেকে সত্যিকারের ছোটোলোক বলে মনে হয়, নির্ভেজাল ছোটোলোক, যে ছোটোলোকের সংজ্ঞা ওরা দিতে পারবে না। কথাটা মনে হতেই হাসে ও।

'হাসছ যে?'

'আজ আমি একটা আস্ত ছোটোলোক। কাজ নেই, কাম নেই, চিন্তা নেই, ভাবনা নেই, রাজা নেই, মন্ত্রী নেই। কী বলো সই?'

'ঠিক।'

শবরীও হেসে গড়িয়ে পড়ে। হাসতে হাসতে চুলোর ওপর তরকারি পোড়ার গন্ধ পায়।

'ওই যা, সব গেল? আজ আর খেতে হবে না।'

কাহ্নুপাদ ওর হাত চেপে ধরে।

'যাক।'

'কেন?'

'আজ আর খাব না।'

'উহ্ বাবা ছাড়ো। আমাকে আর পাগল বানিও না।'

শবরী তড়িঘড়ি ছুটে যায়। তরকারি সামলায়। কাহ্নুপাদ আবার কলম নিয়ে উপুড় হয়। মনে মনে বলে, 'কাহ্নিলা তুই একটা আস্ত হারামি। তোর মনের ঠিক-ঠিকানা নেই। কাহ্নিলা তোর জীবনটাই বরবাদ। তুই কিছু বুঝিস না, কিছু জানিস না, তবু গীত লিখতে চাস। কাহ্নিলা রে এত সাহস ভালো না।' কয়েকটি পংক্তি লিখে আবার কেটে ফেলে। আবার লেখে,

ঘুমই ণ চেবই সপরবিভাগা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সহজ নিদালু কাহ্নিলা লাঙ্গা।।

আত্মপর বিভেদ ভুলে ঘুমায়, সহজেই নিদ্রিত হয় কাহ্নুপাদের নগ্ন মন। নিজের আকাঙ্ক্ষাকে গীতের রূপকে নির্বিবাদে প্রবেশ করিয়ে রাখে। জ্বালা জুড়োবার এটাই সহজ পন্থা। নিজেকে এমন প্রকাশ করা যায় বলেই কলম কাহ্নুপাদ ভালোবাসে। কলমটা দাঁতে কামড়ে রাখে ও। তারপর আবার দু-পংক্তি লেখে,

চেঅণ বেওন ভর নিদ গেল।

সঅল সুফল করি সুহে সুতেলা।।

তাঁর চেতনা বেদনা নিঃশেষ, জাগতিক সমস্ত ব্যাপার বিনষ্ট করে কাহ্নুপাদ সহজানন্দে প্রবিষ্ট। এই অবস্থায় ত্রিভূবন তাঁর কাছে শূন্য, স্বপ্নের মতো অলীক; কোনো কিছুর ঘুরপাকে তাকে আর পড়তে হবে না। 'কাহ্নিলা তুই পথ পেয়েছিস। হো-হো কাহ্নিলা তোর সামনে কোনো নদী নেই। কাহ্নিলা রে তুই একদৌড়ে দূর পাহাড়ের চূড়োয় উঠতে পারিস। তোর আর ভাবনা কী। তুই এখন আপন মনে গান গা।' তখন ও লেখার সরঞ্জাম একপাশে ঠেলে রেখে চিৎকার করে শবরীকে ডাকে।

'সই? সই?'

'উহ্ কী হল?'

'দুপুরে খাওয়ার পর আমরা বনে যাব।'

'কেন?'

'তোমার ময়ূর-পালক কুড়াব।'

'সত্যি আজ তুমি যাবে?'

'হ্যাঁ গো হ্যাঁ।'

'উহ্ কী আনন্দ। কতদিন দু-জনে একসঙ্গে বনে যাইনি।'

শবরী দ্রুত কাজ সারার চেষ্টা করে। হরিণের চামড়া পেতে খাবার জায়গা করে। জলের ভাঁড় নামায়। ভাতের সানকি আনে। আজ আয়োজন কম। মৌরালি মাছ আর নলতে শাক।

'বাহ্ রান্নাটা খুব ভালো হয়েছে।'

'ছাই রেঁধেছি। আয়োজন তো তেমন নেই।'

'আয়োজন কী হবে? ঘটা করে খেতে ইচ্ছে করে না। অল্প আয়োজনে তৃপ্তিটাই বড়ো কথা।'

'তাই বলো। আজ তোমার মনে খুশির ঢল।'

'এই ঢলটাকেই সব সময় ধরে রাখতে চাই। মন ভরা থাকলে বাইরের আয়োজন না হলেও চলে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শবরী কথা বলে না। রান্নাঘরে যায়। পায়ের মল ঝুমঝুমিয়ে ওঠে। বাসনে ভাত নিয়ে আসে। বাটি ভরে তরকারি। কাহ্নুপাদ আবেশ করে খায়। খাবার পর পানের রসে ঠোঁট রাঙায়। বাইরে এসে বেলা দেখে। এখনও অনেক বেলা বাকি। দুজন পাহাড়ের গা বেয়ে তড়বড়িয়ে নেমে আসে। শবরীর পোষা ময়ূরটা ওদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছোটে। মাঠ পেরিয়ে ঘাট পেরিয়ে বনে এসে নিজেকে আজ মুক্ত মানুষ মনে হয় কাহ্নুপাদের। এতদিন নিজেকে এক খাঁচার মধ্যে বন্ধ করে রেখেছিল। পাখা মেলে ওড়ার জো ছিল না, চারদিকে ছিল লোহার শিকের মতো শাসন আর চোখরাঙানি, অবহেলা আর অনুকম্পা। এখন ও ছাড়া পেয়ে নিজের ভুবনে এসেছে। ইচ্ছে মতো উড়বে, ঘর বানাবে, পাতার আড়াল তৈরি করবে। কারও পরোয়া করবে না। শবরীর হাতটা নিজের মুঠিতে নিয়ে ঝরা পাতার মর্মর তুলে গাছের ছায়ায় হাঁটে কাহ্নুপাদ। ময়ূর-পালক কুড়োনোটা ছল। নিজেকে ছড়িয়ে দেয়ার ব্যাপারটাই প্রধান।

পরদিন চারদিকে কেমন ঝোড়ো হাওয়া বয়। বৃষ্টি নেই। গুমোট ভাব থমথমে। ঘাটে নৌকা নেই, পথে লোক নেই, আকাশে মেঘ। বিদ্যুতের চাবুক চিরে যায়। জানালায় বসে বাইরে তাকিয়ে থাকে কাহ্নুপাদ। হঠাৎ করে দমকা বাতাসে কেঁপে ওঠে ঘরের জিনিসপত্র। জানালা বন্ধ করার জন্য চেঁচামেচি করে শবরী। কিন্তু কাহ্নুপাদ সে চেঁচামেচি কানেই তোলে না। এভাবে বসে থাকতে ওর কী যে ভালো লাগছে তা শবরীকে কেমন করে বোঝাবে? দই দিয়ে চিঁড়া মাখিয়েছে শবরী। কানুকে খেতে ডাকে। কিন্তু খাওয়ার জন্যেও ওর কোনো গরজ নেই। তাই রাগ করে শবরী ময়ূরের গলা জড়িয়ে কথা বলে। ময়ূরকে শুনিয়ে শুনিয়ে কানুর সঙ্গে আর কথা বলবে না বলে পণ করে। কাহ্নুপাদের মনে হয় একটা মানুষ যেন বাতাস ঠেলে এগিয়ে আসছে। চেনা চেনা লাগছে, কিন্তু পুরো বুঝতে পারছে না। উপরন্তু ধুলোর ঝড়ে মানুষটাকে কেমন বিভ্রান্ত দেখাচ্ছে। কাহ্নুপাদের ভেতরটা ছটফটিয়ে ওঠে। ইচ্ছে করে মানুষটাকে গিয়ে জিজ্ঞেস করে তোমাকে আমার চেনা চেনা লাগছে কেন? ভেতরের আবেগটা চাপতে না পেরে ঠাস করে দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে যায় কাহ্নুপাদ। খোলা দরজা দিয়ে জোরে বাতাস ঢোকে। উড়িয়ে নিতে চায় শবরীকে। কোনোরকমে দু-হাতে দুয়ার সামলায় ও। দেখে, কাহ্নুপাদ সাঁই-সাঁই করে নেমে যাচ্ছে। দ্রুত লোকটার সামনে গিয়ে অবাক হয়ে যায় কাহ্নুপাদ।

'ভুসুকু তুমি?'

'হ্যাঁ, আমি ফিরে এসেছি।'

ভুসুকু ওকে জড়িয়ে ধরে। স্বজন ফিরে পাওয়ার আবেগ ওর দু-বাহুর চাপে। কাহ্নুপাদ সে উত্তাপ অনুভব করে। ভুসুকুকে দেখে আনন্দ এবং বেদনার মিশ্র অনুভূতিতে কাহ্নুপাদ অভিভূত হয়।

'আমরা ভেবেছিলাম তুমি বুঝি আর ফিরবে না।'

'সেরকম অবস্থাই হয়েছিল। তবু দূরে থাকতে পারলাম কই? ফিরতেই হল। নাড়ির টান যে!'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

‘রোগা হয়ে গেছ।’

‘কানুপা আমি আবার গীত লিখব। মনে হয় কতকাল যেন আমি সব কিছু থেকে দূরে সরে আছি। কানুপা ফিরে আসতে পেরে আমার কী যে খুশি লাগছে তা আমি বোঝাতে পারব না।’

‘তা তো ঠিকই ভুসুকু। নিজের জমির গন্ধ না পেলে বুক উচাটন হয়ে যায়। আমি তো অন্য জায়গায় গিয়ে একদম থাকতে পারব না। তোমার গীত শোনার অপেক্ষায় রইলাম। কোথায় ছিলে এতকাল?’

‘সে মেলা কথা। জলদস্যুর কবলে পড়েছিল আমাদের নৌকা। সর্বস্ব লুটে নিয়ে গেছে। অনেকে প্রাণে মরেছে। আমি এত বছর ওদের হাতে বন্দি ছিলাম। দাস হয়ে খেটেছি। কী যে অমানুষিক অত্যাচার সয়েছি! তারপর কোনোরকমে পালিয়ে বেঁচেছি। একদিন বসে বসে শোনাব সেসব গল্প।’

‘সেই ভালো। আজ ঘরে যাও। দম ফেলে বাঁচো।’

‘যা ঝোড়ো বাতাস। তবু কোথাও থেমে থাকতে মন চাইল না। ছুটে বেরিয়ে এলাম। নিজের মাটির টানে উড়তে উড়তে এসেছি কানুপা। শরীরে শক্তি নেই, তবু কেমন করে যে এলাম ভেবে এখন অবাক লাগছে। মনটা কোনো বাধাই মানতে চাইল না।’

‘ভালোই করেছ। তোমাকে আমাদের মাঝে পেয়েছি এ যে কত ভাগ্য।’

‘আমার ঘরের খবর কী কানুপা?’

‘ভালো। সবাই ভালো আছে।’

‘বউটা হইতো ভেবে ভেবে সারা হয়ে গেছে। ঘরে যাই কানুপা।’

‘যাও।’

লজ্জিত হাসি হাসে ভুসুকু। ভুসুকু আর দাঁড়ায় না। পথের বাঁক বদলে নিজের বাড়ির দিকে যায়। একটু দূর থেকে বলে, ‘চেনা পথঘাটের গন্ধে আমি পাগল হয়ে গেছি কানুপা।’ কাহ্নুপাদ কথা বলতে পারে না, মোড়ের উপর দাঁড়িয়ে থাকে । দু-এক ফোঁটা বৃষ্টি শুরু হয়েছে, হয়তো হুড়মুড়িয়ে নামবে, তবু ঘরে ফিরতে ইচ্ছে করে না কাহ্নুপাদের। মনে হয় বৃষ্টি নামলে ভালো, মজা করে ভিজতে পারবে। আসলে তা নয়, বিক্ষিপ্ত মনটাকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্য কাহ্নুপাদ বৃষ্টি চাইছে। আসলে তা নয়, ভুসুকুর গীত ওর মনের মধ্যে বৃষ্টি হয়ে নামছে। সেই কয়টা পংক্তি মনে পড়ছে, যে কয়টা পংক্তি ভুসুকু ওকে শোনানোর পর ওকে একদম অন্যরকম লাগত। মনে হত ভুসুকুর সঙ্গে ওর অনেক ব্যবধান। ও এমন লিখতে পারবেনা। সে পংক্তি এখন কী নির্মম পরিহাসের মতো ব্যঙ্গের স্বরে ধ্বনিত। ভুসুকু আরও একবার জলদস্যুর হাতে পড়েছিল, সেবার এত কষ্ট পায়নি ও। অল্প দিনেই ছাড়া পেয়ে চলে এসেছিল। তখনও বিয়ে করেনি। ফিরে আসার পর এই গীত লিখেছিল। যেন সময়টা সবদিক দিয়ে ওকে বঞ্চিত করল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাজ ণাব পাড়া পঁউআ খাঁলে বাহিউ

অদঅ দঙ্গালে ক্লেশ লুড়িউ।।

আজি ভুসুকুবঙ্গালী ভইলী

নিঅ ঘরিনী চণ্ডলে লেলী।।

ভুসুকুর এই গীতটা কাহ্নুপাদ কোনোদিন ভুলতে পারেনি। বজ্র নৌকা পদ্মাখালে বাওয়া হল। নির্দয় দস্যু সব লুট করে নিল। ভুসুকু আজ বাঙালি হল। নিজ গৃহিণী চণ্ডালে নিয়ে গেল। আহা, তখন কেন এমন লিখেছিল ভুসুকু, কাহ্নুপাদের বুক মোচড়ায়। ধুলোর ঝড় নেই। বড়ো বড়ো ফোঁটায় বৃষ্টি পড়ে। কাহ্নুপাদ সে বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে ঘরে ফেরে।

'সই, ভুসুকু ফিরেছে।'

'ভুসুকু?'

'ওকে দেখেই তো অমন ছুটে গেলাম।'

'কিছু বলেছ?'

'না আমি ওকে কেমন করে বলব। ও যে বউর জন্যে উতালা হয়ে ছুটে গেল। আমার সঙ্গে বেশি কথা বলেনি।'

শবরী কথা বলতে পারে না। শাড়ির আঁচল দিয়ে কাহ্নুপাদের মাথা মুছিয়ে দিয়ে শুকনো কাপড় এগিয়ে দেয়। কাহ্নুপাদ কাপড় না নিয়ে ভিজে শরীরে ওকে কাছে টানে।

'আমি দূরে গেলে তুমিও কি সুলেখার মতো চলে যাবে?'

শবরী ওর মুখ চেপে ধরে। কাহ্নুপাদ হাত সরিয়ে দেয়।

'আসলে এটাই সত্যি। অনেকদিন তো অপেক্ষা করল সুলেখা। যদি ভুসুকু কোনোদিন ফিরে না আসত তাহলে কেমন হত? সময় থাকতে নিজের পথ বেছে নিয়েছে, এটাই নিয়ম। আমরা সবাই নিয়মের দাস, কী বলো?' কাহ্নুপাদ মুচকি হাসে।

শববী চটে ওঠে।

'থামবে তুমি?'

'থামতে বলছ কেন? যদি এমন হয় তাহলে তোমার পথ দেখে নিও।'

'কানু তুমি একটা হাতি। এসব কথা শুনতে আমার একটুও ভালো লাগছে না। ছাড়ো আমাকে। শুকনো কাপড় পরো।'

'যদি না ছাড়ি?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

‘ইস আর ঢং দেখাতে হবে না। নিজে তো ভিজেছ আবার আমাকেও ভেজানো হচ্ছে।’

‘জল ভালো লাগছে না?’

‘একটুও না।’

‘সত্যি?’

‘হ্যাঁ।’

‘তবে দেখাচ্ছি মজা।’

কাহ্নুপাদ শবরীর হাত ধরে জোর করে ঘরের বাইরে টেনে আনে। শবরীর নিষেধ এবং চিৎকার শোনে না। ওকে টানতে টানতে পাহাড়ের গা বেয়ে সমতল ভূমিতে নামে। তারপর কার্পাস খেতে ঢোকে দু-জনে। আর তখনই শবরীরও ভালো লাগে বৃষ্টিতে ভিজতে। অনেকদিন পর বৃষ্টি নেমেছে। তুমুল বৃষ্টির স্রোতে ভেসে যায় আশপাশ। চারদিকে ধোঁয়ার মতো দেখায়। সে অলৌকিকে প্রবেশ করার বড়ো সাধ কাহ্নুপাদের।

পরদিন রাজার লোক এসে কাহ্নুপাদকে খবর দিয়ে যায়। দেবল ভদ্রের হুকুম, রাজদরবারে যেতে হবে। কাহ্নুপাদ চুপচাপ শোনে, কিছু বলে না। লোকটি চলে গেলে নদীর ঘাটে এসে দাঁড়ায়। বুকের জ্বালা বেশি তীব্র হয়ে উঠলে কাহ্নুপাদ কথা বলতে পারে না, গুম হয়ে যায়। এ ওর বরাবরের অভ্যেস। ডোম্বি নৌকা নিয়ে মাঝনদীতে। কাহ্নুপাদ তীরের কাদায় দাঁড়িয়ে নলখাগড়া ছেঁড়ে। দেবল ভদ্রের হুকুম এসেছে, ও জানত আসবে, তবু ও যাবে না। কালকে হয়তো জোর করে ধরে নিয়ে যাবে। তারপর শাস্তি। কী শাস্তি দেবে কে জানে। না, তবুও কিছুতেই যাবে না।

অনেকক্ষণ পর নৌকা বোঝাই লোক নিয়ে ফিরে আসে ডোম্বি। গুনে গুনে কড়ি আদায় করে। কাহ্নুপাদের সঙ্গে কথা বলার ফুরসত নেই। আবার লোক বোঝাই করে চলে যায়। আজ ঘাটে পারাপারের চাপ। ডোম্বি একাই সামলাচ্ছে। বারুয়া অসুস্থ, হাঁপানি বেড়েছে। কাহ্নুপাদ হাঁটতে হাঁটতে দেবকীর দোকানে ঢোকে। দেবকী দোকানে নেই, রামক্রী চুপচাপ বসে আছে।

‘কী খবর রামক্রীদা গালে হাত দিয়ে বসে আছ যে?’

‘মন ভালো নেই।’

‘কেন?’

‘বউর সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে।’

‘ও তাই বলো, এ আর এমনকি, চুকেবুকে যাবে। তা তোমার ঘড়ায় আছে নাকি কিছু?’

‘সব খালি। ওই নিয়েই তো ঝগড়া।’

‘না দিনটাই মাটি। বউদি কোথায়?’

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

‘জানি না। রেগেমেগে কোথায় বেরিয়ে গেল। আমাকে কিছু বলেনি।’

‘তুমিও রেগে আছ দেখছি। ছুটকি কোথায়?’

‘ও কি ঘরে থাকে নাকি? কোথায় কোথায় ঘুরছে কে জানে?’

‘তোমার ছেলেটা খুব ভালো হয়েছে।’

‘ওই ভালো দিয়ে করে খেতে পারবে না।’

‘তুমি অমন করে বোলো না। বয়স হলে ঠিক হয়ে যাবে ছুটকি। যাই গিয়ে। তোমার মেজাজ ভালো না।’

‘বোসো না। এসেই যাই যাই করছ।’

‘মালপানি নেই যখন থেকে আর লাভ কী?’

‘মনখারাপ নাকি?’

‘তোমার মতো বউর সঙ্গে ঝগড়া হয়নি আমার।’

এতক্ষণে রামক্রী হো-হো করে হাসে।

‘তুমি আছ বেশ। সুখের চাকরি।’

‘চাকরি ছেড়ে দিয়েছি।’

‘তাই নাকি? করবে কী?’

‘দেখি কী করা যায়।’

‘ছাড়লে কেন?’

‘ভালো লাগে না।’

‘ও মা এমন কথা তো শুনিনি। তোমার সব কাজকর্মই এমন।’

কাহ্নুপাদ হেসে বেরিয়ে যায়। আবার নদীর ঘাটে আসে। ঘাটে ডোম্বি একলা, লোক নেই। কাহ্নুপাদ লাফিয়ে নৌকায় ওঠে।

‘তোমার ভিড় তাহলে কমল?’

‘চলে গিয়েছিলে যে বড়ো?’

‘করব কী একলা?’

‘তোমার মনটা বুঝি ভালো নেই কানু?’

‘কেন?’

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

‘রাজার লোক এসেছিল ডাকতে?’

‘হ্যাঁ।’

‘ওরা হয়তো সহজে ছাড়বে না।’

‘না ছাড়ুক। বেশি আর কী করবে, কয়দিন শস্তি দেবে না হয়।’

‘ভাবনা হচ্ছে?’

‘মোটেই না। ভাবনা আবার কী। যা করেছি তা তো জেনেশুনেই করেছি।’

ডোম্বির চোখে ঝিলিক, ঝকঝকে ছুরির চমক। কাহ্নুপাদের মনে হয় ডোম্বি ওর কাছ থেকে বুঝি অনেক দূরে সরে গেছে। ওর চেহারায় আগের আদল নেই, বদলে গেছে, ধারালো হয়েছে।

ডোম্বি কোমর থেকে চকচকে ছুরিটা বের করে।

‘ওটা কী হবে মল্লারী?’

‘কী আর, দরকারের সময় কাজে লাগবে।’

‘দরকারটা কী শুনি?’

‘নতুন গীত কী লিখেছ কানু?’

‘এটা বুঝি আমার কথার উত্তর হল?’

‘ওই দ্যাখো লোক আসছে। নৌকা খুলতে হবে?’

‘খোলো। আমিও যাব।’

‘কোথায়?’

‘কোথাও না। নৌকায় বসে থাকব। তোমার সঙ্গে এপার ওপার করব।’

‘সেই ভালো।’

ডোম্বি উচ্ছ্বসিত আবেগে হেসে ওঠে। কানুকে এমন করে পাওয়ার সাধ ওর কত কালের, কখনো পাওয়া হয়নি। ডোম্বির সঙ্গে নৌকা বাইতে ভালো লাগে কাহ্নুপাদের। কত বছর ধরে এসব কাজ থেকে ও অনেক দূরে ছিল, এখন সব কিছু নতুন নতুন লাগে। এতকাল ও নিজের জায়গা ছেড়ে একটা বিদেশি জায়গায় বাস করেছে। যেখানে ওর নিগ্রহ ছাড়া আনন্দ পাবার কিছু ছিল না, যেখানে কোনো আপন পরিবেশ তৈরি হয়নি। এখন নিজের দিকে ফিরে চাইবার সময় হয়েছে।

ঘাটে লোক নেমে গেলে ডোম্বি হঠাৎ করেই বলে, ‘আজকাল একটা বামুন আমাকে বড্ড জ্বালায় কানু।’

‘কে?’

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

‘আগে দেখিনি। বলে দেবল ভদ্রের ভাগনে। মানা করলে শোনে না। একদিন মেজাজ খারাপ হলে সাবাড় হয়ে যাবে।’

কাহ্নুপাদ হঠাৎ করে কিছু বলতে পারে না। ডোম্বি অতিরিক্ত ব্যস্ততায় নৌকার কাছি খুলে দেয়। কাহ্নুপাদের হাতে বইঠা, ছপছপ শব্দে নদীর বুকে ওঠে নামে। দূরে তাকিয়ে দেখে ভুসুকু আসছে। কাহ্নুপাদের বুক তোলপাড় করে ওঠে। ভুসুকুর সামনে নিজেকে কেমন অসহায় মনে হয়।

‘মল্লারী, গতকাল ভুসুকু ফিরেছে।’

‘কী বলছ?’

‘ওই দ্যাখো এদিকেই আসছে।’

‘না ফিরলেই বুঝি ভালো করত।’

ডোম্বি আস্তে করে বলে। হঠাৎ করেই মন বিষণ্ণ হয়ে যায়। ডোম্বি যে আবেগে কাহ্নুপাদের জন্য উচ্ছ্বসিত হয়েছিল তা এক মুহূর্তে ধপ করে পড়ে যায়। তখন ভুসুকু ঘাটে এসে দাঁড়ায়। কাহ্নুপাদ কাদা বাঁচিয়ে লাফ দিয়ে নামে। ডোম্বি আবার চলে যায়। ভুসুকুর সঙ্গে কথা বলা হয়ে ওঠে না।

কাহ্নুপাদ ভুসুকুর কাঁধে হাত রাখে।

‘কী খবর ভুসুকু? সারারাত ঘুমোওনি মনে হয়।’

ভুসুকু হাঁ করে চেয়ে থাকে। রাত্রি জাগরণের ফলে লাল চোখ, বিভ্রান্ত দৃষ্টি। কাহ্নুপাদের হাত ধরে। মাথায় গোটা দুই ঝাঁকুনি দিয়ে বলে, ‘আমার সর্বস্ব লুট হয়ে গেছে কানুপা।’

‘তোমার গীত আছে।’

‘না সেটাও হারিয়েছি। আমি আর কোনোদিন লিখতে পারব না কানুপা। জলদস্যুদের হাতে বন্দি থেকে মনে হয়েছিল আমি আর কিছু করতে পারব না। এখানে এসে দেখলাম, সত্যি পারব না। আমি একদম নিঃশেষ কানুপা।’

ভুসুকু দু-হাতে মুখ ঢেকে হুঁ-হুঁ কাঁদে। কাহ্নুপাদ ওর পিঠে হাত দিয়ে নদীর ধারে ধারে হাঁটে। ভুসুকু নিজেকে থামাতে পারে না। ওর বুকটা কাঁদার জন্যে উন্মুখ হয়েছিল। কাহ্নুপাদের স্পর্শে সে মেঘ অবিরল ঝরল। আহা কান্নাটা কত ভালো। মানুষকে একদম হালকা করে দেয়। নইলে মনটার যে কী হত। অনেকক্ষণ কাঁদার পর ভুসুকু থামে। ওকে সান্ত্বনা দেয়ার কোনো ভাষা কাহ্নুপাদের জানা নেই।

‘আমি কেন এত কষ্ট করে ফিরে এলাম কানুপা? প্রতিটি দিন আমি কার জন্য নষ্ট করেছি? জলদস্যুর কাছে যা হারিয়েছিলাম তার জন্য তো কখনো এমন বেদনা হয়নি। এখন কেন বুকটা ভেঙে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে? তুমি কথা বলছ না কেন কানুপা? তুমি কি বোবা হয়ে গেছ? তুমি কিছু বলো! এখানে আসার পর কেউ আমাকে তেমন কিছু বলে না। কেবলই লুকিয়ে যায়। অথচ আমি প্রাণভরে কিছু শুনতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চাই। তোমরা আমাকে কিছু বলো!'

ভুসুকু কাহ্নুপাদের কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দেয়। কাহ্নুপাদ কিছু বলে না। কী বলবে সেটা ওর জানা নেই। ওর গলার কাছে বেদনা দলা হয়ে থাকে, কিছুতেই নড়তে চায় না। 'না, তোমরা সবাই কেমন যেন হয়ে গেছ, অনেক পালটে গেছ। আমি আর কাউকেই তেমন আগের মতো পাচ্ছি না।'

ভুসুকু বড়ো করে শ্বাস ফেলে।

'শুধু এই নদীর বাতাস বদলায়নি, বদলায়নি ঘাস লতা। অবিকল তেমনি আছে। যেমন করে আগে স্পর্শ দিত এখনও তেমন দিচ্ছে। কিন্তু ওরা কথা বলতে পারে না কানুপা। ওরা আমাকে কিছু বলতে পারে না।'

'ভুসুকু, চলো ওই পাহাড়ের দিকে যাই। ওখানে কুক্কুরীপাদ আছে।'

'তোমাদের সঙ্গ ভালো লাগছে না। আমি একলাই যেদিক খুশি সেদিক যাব।'

ভুসুকু আগে আগে চলে। কাহ্নুপাদ সঙ্গ ছাড়ে না। পেছন পেছন হাঁটতে থাকে। এক সময় ভুসুকুর মন ভালো হবে। তখন ভুসুকু আবার বন্ধুর মতো কথা বলবে। ভুসুকুর গীত কেমন নির্মমভাবে ওর জীবনে সত্য হয়ে গেছে। একেই কি ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলে? হাঁটতে হাঁটতে লোকালয় ছেড়ে আসে ওরা। আশেপাশে আর কোনো মানুষ নেই, কেবল গাছগাছালির অসীম বিস্তার, দূরে পাহাড়। অর্জুন গাছের ছায়া ভুসুকুর নিঃসঙ্গ বুকটার কাছাকাছি হয়। শুকনো কালো বিচির খরখরে শব্দ পায়ের নীচে। হঠাৎ সেই ছায়ায় দাঁড়িয়ে কাহ্নুপাদের মুখোমুখি হয় ভুসুকু।

'তুমি তো আমার বন্ধু কানুপা। তুমি কবি। তুমি কেন সুলেখাকে আমার কথা শোনাতে পারোনি? কেন বলোনি ভুসুকু একদিন-না-একদিন আসবেই সুলেখা। ভুসুকু তোমাকে ভুলে যায়নি।'

কাহ্নুপাদের মনে হয় অর্জুন গাছের বাকল দিয়ে কী যেন একটা ওষুধ হয়। সে ওষুধ দিয়ে কি ভুসুকুর বেদনা কমানো যায় না? পাহাড়টা আর বেশি দূরে নয়। নির্জন পরিবেশ, ভারি চমৎকার দেখাচ্ছে চারদিক। কাহ্নুপাদের ইচ্ছে করছে একদৌড়ে পাহাড়ে চলে যেতে। ভুসুকু একগাদা অর্জুনের বিচি হাতের মুঠোয় তুলে নেয়। ইতস্তত ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারে। কখনো অনেক দূরে ছুঁড়ে দেয়। অকারণে হাসে।

'বুঝেছি, তুমি আমার কোনো কথারই উত্তর দেবে না কানুপা!'

কাহ্নুপাদের কাছ থেকে কোনো উত্তর না পেয়ে ভুসুকু আবার সামনে হাঁটতে থাকে। পাহাড়ের গুহায় কুক্কুরীপাদের আশ্রয়। দু-জনেই সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। সন্ধ্যা নেই, নিশ্চয় ফলমূল কুড়োতে গেছে। কুক্কুরীপাদ যোগীর ধ্যানে নিমগ্ন, ডেকে সাড়া পাওয়া গেল না। ভুসুকু হাত ওলটায়। তারপর পা ছড়িয়ে ঘাসের ওপর বসে পড়ে, নরম সবুজ ঘাস কোনো ব্যবহারে মলিন নয়। স্পর্শ শরীর ঝিম ধরিয়ে দেয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

‘আচ্ছা কানুপা সুলেখা কি ভেবেছিল আমি মরে গেছি?’

‘তা কী করে ভাববে।’

‘তবে ও কেন অপেক্ষায় রইল না?’

‘জীবনের অনেক কিছুই আমি জানি না ভুসুকু।’

এতক্ষণে ভুসুকু শব্দ করে হাসে, প্রাণখোলা হাসি। কাহ্নুপাদের ভালো লাগে।

‘সত্যি কথা বলেছ কানুপা। জীবনের কিছুই আমিও জানি না।’

মাথার ওপর সূর্য। মাঝে মাঝে মেঘের আড়ালে যায়। ভুসুকু টানটান হয়ে শুয়ে পড়ে। রোদের এই আলো-আঁধারি আলসেমি ধরায়। শরীর ম্যাজম্যাজ করে। ঘাসের ডগা চিবুতে মন্দ লাগে না কাহ্নুপাদের।

‘ঘুম পাচ্ছে কানুপা।’

‘ঘুমোও।’

‘মনে হচ্ছে কতকাল ঘুমোইনি। এতদিনে নিজের মতো একটা বিছানা পেয়েছি। বিশেষ সময়ে সুলেখা যেমন বুকে জড়িয়ে ধরত, ঘাসটা আজ তেমন আমাকে মেয়েমানুষের সোহাগ দিচ্ছে।’

‘তুমি ঘুমোও ভুসুকু।’

ভুসুকুর এমন নিঃস্ব কণ্ঠ কাহ্নুপাদের অনুভূতি অবশ করে দেয়। ও উঠে গুহার ভেতরে যায়। কুক্কুরীর ধ্যান এখনও ভাঙেনি, ও যেভাবে বসেছিল ঠিক সেভাবেই রয়েছে, একটুও নড়াচড়া করেনি। কেউ যেন ওকে আসনের সঙ্গে গেঁথে দিয়েছে। কাহ্নুপাদ সে মুখের ভাষা পড়ার চেষ্টা করে। ওই ধ্যানস্ত মূর্তি ওর বুকের ভেতরে ওলটপালট করে দেয়। ভালো লাগে না।

ভুসুকু ঘুমিয়ে গেলে ও ওকে রেখেই চলে যাবে।

কাহ্নুপাদ গুহা থেকে বেরিয়ে আসে। তখন কোঁচড়ে একগাদা ফল নিয়ে ফিরে আসে সন্ধ্যা।

‘বাবা আজ কী ভাগ্য! কার মুখ দেখে যে উঠেছি। কেমন আছ ভুসুকু?’

সন্ধ্যা কলকলিয়ে ওঠে। কাহ্নুপাদকে দেখে চেঁচায়, ‘কানুপা তুমিও?’

‘এলাম তোমাদের খোঁজখবর নিতে। তোমরা অনেকদিন গাঁয়ের দিকে যাওনি।’

‘যাই যাই করেও যাওয়া হয়নি। কবে ফিরেছ ভুসুকু?’

ভুসুকু শুকনো কণ্ঠে বলে, ‘তোমার কথা শুনতে ভালো লাগছে না। কিছু খাবার থাকলে দাও। পেটটা চোঁ-চোঁ করছে।’

‘বোসো আসছি।’

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

‘ঘুমোওনি ভুসুকু?’

‘ঘুম এল না। একটা গীত আমার মনের মধ্যে তৈরি হচ্ছে কানুপা।’

‘সত্যি?’

‘হ্যাঁ। পুরোটা হয়নি। আরম্ভটা করতে পারিনি। মাঝের একটা পংক্তি শোন;

অপনা মাঁংসে হরিণা বৈরী

‘বাহ্ চমৎকার। চমৎকার বানিয়েছো।’

‘বানাইনি কানুপা। আমার ভেতর থেকেই শব্দগুলো এল। ভেবে দেখলাম সুলেখার কোনো দোষ নেই। ওর যৌবনটাই ওর সঙ্গে শত্রুতা করেছে। হরিণের মাংস যেমন হরিণের শত্রু। আমরা জাল বেড় দিয়ে ধরে মারি। আসলে আমরা তো এমন করেই নিজের কাছে হেরে যাই কানুপা। কেমন করে হারলাম বুঝতে পারি না।’

‘ভুসুকু তুমি অনেক বড়ো কবি।’

কাহ্নুপাদ ভুসুকুকে জড়িয়ে ধরে।

‘কী হচ্ছে দুই বন্ধুর? নাও বোসো।’

সন্ধ্যা কলাপাতার ওপর চিঁড়া আর কলা নিয়ে এসেছে। ভুসুকু দেরি না করে খাবারটা নিয়ে বসে পড়ে।

‘কতদিন যে এমন খাবার খাইনি!’

‘কী যে বলো।’

‘এমন মানে, এমন যত্নের খাবার খাইনি। এমন খাবার খেলে পেট যেমন ভরে, মনও তেমন ভরে।’

‘কীই-বা করতে পেরেছি! কেন যে লজ্জা দাও।’

সন্ধ্যা উঠে গিয়ে ঘড়ায় করে জল নিয়ে আসে।

‘তোমাকে আরও চারটে চিঁড়ে দেই ভুসুকু?’

‘না। তুমি বোসো।’

সন্ধ্যার মুখে আনন্দের হাসি। ভুসুকু তাকিয়ে থাকে। সুখ-দুঃখ কোনো কিছুতেই ওদের আর তেমন কিছু আসে যায় না। ওরা এখন সংসারের বাইরে।

‘দেখছ কী তাকিয়ে? খাও।’

‘ভালো লাগছে না।’

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

‘বললে যে অনেক খিদে।’

‘এখন নেই।’

‘খাও ভুসুকু। তোমার খিদে আছে।’

‘আমি আবার বাণিজ্যে যাব কানুপা।’

‘কবে?’

‘যে-কোনো দিন। নদীর বুকে ঘুরতে ভালোই লাগে। ঘরে আমার মন বসে না।’

ভুসুকু একটু খাবার মুখে দেয়।

‘কিছুই খেলে না ভুসুকু? যত্নের কথা বললে কিন্তু যত্নটা নিলে কই?’

‘বেশি যত্নে কষ্ট বাড়ে বউদি।’

ভুসুকু উঠে পড়ে।

‘চলো কানুপা।’

‘সে কী, ওর সঙ্গে কথা বলবে না?’

‘না, তোমার যোগীর ধ্যান আজ আর ভাঙবে না। আরেকদিন আসব। আজ যাই।’

‘এসো কিন্তু মনে করে। গাঁয়ে গেলে যেন শুনি না যে বাণিজ্যে চলে গেছ।’

‘না তা শুনবে না । আসব, কুক্কুরীর সঙ্গে দেখা না হলে নিজেরই খারাপ লাগবে।’

ভুসুকু আগে আগে হাঁটে, কাহ্নুপাদ পেছনে। শেষ বিকেলের আলোয় ভুসুকুর ছায়া ঘাসের বুকে লম্বা হয়ে কাঁপে। কাহ্নুপাদ আনমনে হাঁটতে হাঁটতে ভুসুকুর গীতের ওই একটুখানি নিয়ে নাড়াচাড়া করে। কাহ্নুপাদের বুকে গেঁথে গেছে ওইটুকু। বড়ো চমৎকার! দারুণ তৈরি করেছে ভুসুকু।

কিছুদূর গিয়ে ভুসুকু দাঁড়িয়ে যায়। কাহ্নুপাদ এগিয়ে গেলে বলে, ‘আমার গীতের একটুখানি বানালাম কানুপা।’

‘বলো শুনি।’

তিন ণ চ্ছুপই হরিণা পিবই ণ পাণী।
হরিণা হরিণির নিলঅ ণ জানী।।।

‘বুঝলে কানুপা হরিণ তৃণ স্পর্শ করে না, জল ছোঁয় না। হরিণ হরিণীর নিবাস কোথায় তা জানে না।

কথা ক-টি বলে ভুসুকু হেসে ওঠে।

‘তুমি অমন করে হেসো না ভুসুকু।’

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভুসুকু হাসতেই থাকে, অনেকক্ষণ হাসে, তারপর বুক চেপে ধরে।

'না, আমি আর হাসব না কানুপা। বুকটায় কিছু নেই। হাসলে ব্যথা লাগে। জলদস্যুর হাতে পড়েছিলাম। নির্যাতন করেছে, কষ্ট পেয়েছি। শরীরে ব্যথা হয়েছে। কিন্তু বুকে ব্যথা হয়নি। এখন আমার বুকে প্রচণ্ড ব্যথা। নরক কী কাহ্নুপাদ, তুমিও জানো না, আমিও না। তবু আমার বাড়িঘর, গাছপালা, নদী নরকের মতো অসহ্য। আমি আবার চলে যাব।'

'না, তুমি যাবে না। তোমাকে আমরা যেতে দেব না।'

ভুসুকু ঘুরে দাঁড়ায়।

'কেন? যেতে দেবে না কেন?'

'কেন যাবে? আমরা রয়েছি না? এই মাটি, নদী, আমরা সবাই তোমার দুঃখ ভুলিয়ে দেব ভুসুকু।'

'পারবে, কানুপা পারবে?'

ভুসুকু কাহ্নুপাদের হাত আঁকড়ে ধরে।

'পারব ভুসুকু। তুমি আমাদের সঙ্গেই থাকবে।'

ভুসুকু গলা ছেড়ে হা-হা করে হেসে ওঠে। কাহ্নুপাদের ঘাড়ে হাত রাখে। শেষ বিকেলের আলোতে দুজন মানুষ খুব কাছাকাছি এসে যায়। ভুসুকু হাসতেই থাকে। হাসতে হাসতে বলে, 'আজি ভুসুকু বঙালি ভইলী। বুঝলে কানুপা ভুসুকু আবার গীত বানাবে, অনেক গীত। একদিন সারারাত তোমাকে গীত শোনাব।' কাহ্নুপাদ কথা বলে না। ভাবতে থাকে যে ভুসুকু বিশাল মাপের কবি। ওর গভীরতা যেমন, ব্যাপ্তি তেমন। এমন একটি মানুষকে ওদের বড়ো দরকার। জীবনের বিনিময়ে যার অভিজ্ঞতা হয় সে তো আগুনে ঝলসানো খাঁটি সোনা, তার তুলনা হয় না। ওর দু-কান ভরে শুধু বাজে,

আজি ভুসুকু বঙালি ভইলী।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সে রাতেই কাহ্নুপাদ একটা গীত বানাবার চেষ্টা করে।

নগর বাহিরেরেঁ ডোম্বি তোহোরি কুঁড়িআ।

ছোই ছোই যাইসি ব্রাহ্ম নাড়িআঃ

লিখে ওর ভালোই লাগে। এমন সরাসরি এর আগে ও আর কখনো লিখতে পারেনি। একবার লিখেছিল, কিন্তু শেষ করেনি। এখন মনে হয় সরাসরি লেখা দরকার। সরাসরি না লিখলে প্রকাশটা তীব্র হয় না। শবরী গীতটা শুনে প্রথমে থমকে থাকে। তারপর চেঁচিয়ে ওঠে, 'ঠিকই লিখেছ কানু। ওই এক জায়গায় বামুনরা ছোটোলোকের শরীরের কথা ভুলে যায়। তখন সব পবিত্র হয়।'

শবরী ব্যঙ্গের হাসি হাসে। শবরীকে বড়ো ভালো লাগে কাহ্নুপাদের। শবরী কখনোই খুব একটা মনোযোগ দিয়ে ওর গীত শোনে না। আজ কাহ্নুপাদের গীত শবরীকে অন্যরকম করে দেয়। সকালে পটহ মাদল বিয়ে ডোম্বি ওই গীত গায়। বুনো উল্লাসে উন্মত্ত হয়ে ওঠে ওর কণ্ঠ। দুপুরের মধ্যে পুরো পাড়াতে গীতটা গাওয়া হয়ে যায়। দারুণ উত্তেজনা সর্বত্র। জোয়ান ছেলেরা হাততালি দিয়ে পথেঘাটে গীতটা গায়।

দেশাখ বলে, 'কানুদা এতদিনে মনের কথা লিখেছে।'

কাহ্নুপাদকে জড়িয়ে ধরে ও। কাহ্নুপাদের চোখ দীপ্র জ্বলে। সব মেদ ঝরে গেছে। শরীরের কাঠিন্য দৃষ্টিতে ঝলসে ওঠে।

'ওরা তোমাকে রেহাই দেবে না কানুদা।'

কাহ্নুপাদ দেশাখের কাঁধে হাত রাখে।

'ভয় পাই না দেশাখ। এক কানু গেলে কী হবে, তোরা তো আছিস।'

পরদিন রাজার লোক এসে ধরে নিয়ে গেল কাহ্নুপাদকে। কাহ্নুপাদ শান্তই ছিল। হইচই করেনি। ও জানত হইচই করলে শারীরিক অত্যাচারই বাড়বে আর কোনো ফল হবে না। ওর হাতিয়ার কলম। কাহ্নুপাদ সেটাই অটুট রাখতে চায়। একটি অস্ত্র নিয়েই ওদের কাছে নতি স্বিকার করবে না। কাহ্নুপাদ শান্ত ছিল তবু কাহ্নুপাদের কোমরে দড়ি বেঁধেছিল ওরা। পিছমোড়া করে হাতও। শবরী কাঁদতে কাঁদতে নদীর ঘাট পর্যন্ত এসেছিল, এসেছিল আরও অনেকে। নদীর ঘাটে ডোম্বির চোখে জল ছিল না, ছিল আগুন, দপদপ করছিল। কাহ্নুপাদ সে দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে হেসেছিল। যেন বলতে চায়, 'এক কানু গেলে কী হবে, তোরা তো আছিস।'

মুখ ফুটে বলা হয় না। সামনে-পিছে রাজার লোক। ডোম্বি আজ বড়ো অশান্ত। হাতের বইঠায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উথালপাথাল আবেগের প্রকাশ। মনে মনে কাহ্নুপাদকে ছিঁড়ে ফেলতে চায়। 'কানু তুমি এত নির্বিকার কেন? রেগে ওঠো, প্রচণ্ড রাগে ফেটে পড়ো।'

ডোম্বির ঠোঁট নড়ে। কাহ্নুপাদ একদৃষ্টে সেদিকে তাকিয়ে থাকে। নড়ে-ওঠা ঠোঁটের ভাষা বোঝে। ডোম্বি আমার আর তোমার মতো একজন দুজন করে সকলে যখন রেগে উঠবে তখনই ফাটার সময় হবে যে। নদী কী ভীষণ শান্ত, গর্জন নেই, ঢেউ নেই, যেন কোথাও কোনো আক্রোশ নেই। নদীর পাড়ে কত লোক দাঁড়িয়ে আছে। সবাই দেখছে রাজার লোক কাহ্নুপাদকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। যে লোকটিকে ওরা ভালোবাসে, যে লোকটি ওদের মনের কথা বলতে পারে তার জন্য ওদের মনে যত বেদনাই থাক না কেন, তাকে জোর করে ধরে রাখার ক্ষমতা ওদের নেই। তবু সেই দিকে তাকিয়েই কাহ্নুপাদ তার পায়ের নীচে মাটির অনুভব পায়। সে শূন্য দাঁড়িয়ে নেই। তার জন্য শক্ত মাটি আছে। বন্যায়, ঝড়ে সে মাটি শক্ত থাকে। কাহ্নুপাদ মুহূর্তে ভয়শূন্য হয়ে যায়।

প্রাথমিক শাস্তিস্বরূপ রাজার লোকেরা কাহ্নুপাদকে চুনের ঘরে আটকে রাখে। রাতে ঘুম আসে না ওর। চুনের গন্ধ কেমন তাও প্রকাশ করতে পারে না—মাঝেমাঝে নিশ্বাস আটকে আসতে চায়, বুক ধড়ফড় করে। চোখ জ্বালা করে, পানি পড়ে। আস্তে আস্তে নিশ্বাস ভারী হয়ে আসে। দেয়ালে ঠেস দিয়ে চুপচাপ বসে থাকে। জমাট আঁধারে দৃষ্টি ফেলা যায় না। কাহ্নুপাদের মনের ভেতর এক একটি শব্দ কবিতার মুক্তো হওয়ার জন্যে ফোঁটায় ফোঁটায় জমতে থাকে। ওর মনে হয়, বুকের ভেতর কোথাও কোনো অন্ধকার নেই। পরদিন পিছমোড়া করে বেঁধে রাজার সামনে হাজির করা হয় কাহ্নুপাদকে। দেবল ভদ্রের গনগনে দৃষ্টির সামনে দাঁড়িয়েও কাহ্নুপাদের বুক একটুও কাঁপে না। ও অবিচল, নির্বিকার থাকে, যেন ওর কোনো সুখ-দুঃখ বোধ নেই।

'গীত লিখেছিস, আবার পাড়ার মধ্যে গেয়ে বেড়িয়েছিস? জানিস তুই দেবতুল্য ব্রাহ্মণদের যেভাবে অপমান করেছিস সে অন্যায়ের একমাত্র শাস্তি মৃত্যুদণ্ড।'

দেবল ভদ্রের চেহারা ভয়ানক মনে হয় ওর কাছে। পরক্ষণে তা মুছে গিয়ে ফাঁসি-গাছের দৃশ্য ওর চোখের সামনে ভেসে ওঠে। বহুবার এ দৃশ্য ওকে বিচলিত করেছিল। কিছুতেই সহ্য করতে পারত না ও। দেবল ভদ্র আবার গর্জে ওঠে, 'মৃত্যুদণ্ড থেকে তুই এক শর্তে ক্ষমা পেতে পারিস, যদি তুই রাজার প্রশস্তি রচনা করিস এবং নগরে পল্লির সর্বত্র তা গেয়ে বেড়াবি।'

কাহ্নুপাদের চোখের তারা কেঁপে স্থির হয়ে যায়। ও কথা বলে না। চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। ও ভীষণ আশ্চর্য হয়ে অনুভব করে যে ওর হাঁটু কাঁপছে না, মাথা ঘুরছে না, চোখের সামনে থেকে আলো সরে যাচ্ছে না। ও দারুণ শক্তি অনুভব করছে।

'কথা বলছিস না যে?' দেবল ভদ্র হুংকার দিয়ে ওঠে।

'রাজাকে আমি চিনি না।'

'বলিস কী?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

‘আমি আমার লোকদেরই চিনি। আমি তাদের কথাই বুঝি।’

‘রাজার কথা তোকে লিখতে হবে কানু।’

‘রাজা আমার কেউ না।’

‘এই, একে নিয়ে গিয়ে আটকে রাখ। সোজা আঙুলে ঘি উঠবে না। ওর আরও শাস্তি দরকার।’

রাজার লোক কাহ্নুপাদকে টানতে টানতে নিয়ে আসে। ধাক্কা দিয়ে আবার চুনের ঘরে ফেলে দেয়। দরজা বন্ধ হয়ে গেলে ওর হাঁটুতে চিনচিনে জ্বালা শুরু হয়। বোঝা যায় কেটে গেছে, রক্ত ঝরছে। উপুড় হয়ে পড়ে যাওয়ার ফলে থুতনিতেও লেগেছে। না, কাহ্নুপাদের বুকে কোনো ব্যথা নেই। কাহ্নুপাদ দেয়ালে ঠেস দিয়ে শরীরের যন্ত্রণা ভুলবার চেষ্টা করে।

শবরীর কাছে দিন রাত সব সমান হয়ে যায়। কখনো শুকনো মুখে চাঁচর বেড়ার ঘরে বসে থাকে, কখনো একা একা ঘোরে। উশকোখুশকো রুক্ষ চেহারা কবিতার ভিন্ন আঙ্গিকে ফুটে ওঠে। কানু ছাড়া ও আর কিছু বোঝে না। সেই কানুর জন্যে কখনো শবরীর চোখে জল আসে, কখনো দৃষ্টিতে আগুন জ্বলে ওঠে। জল আর আগুন এখন শবরীর রাতদিনের সঙ্গী। শুয়ে শুয়ে পোষা ময়ূরটার সঙ্গে কথা বলে, ‘তোর কি মনে হয় কানুকে রাজা মেরে ফেলবে? না রে না, তুই একটা পাগলা। কানুকে আমি ভীষণ ভালোবাসি। আমার এত ভালোবাসা রেখে কানু মরবে কেন? কানু মরতে পারবে না। কিন্তু শবরীর কানু মরবে না; কানুকে মারবে। ওকে ফাঁসি-গাছে ঝুলিয়ে রাখা হবে। না, তাহলে আমি রাজবাড়ি আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেব। দাউ দাউ আগুনে জ্বলে উঠবে ওই বাড়ির সব ঘর, পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।’

শবরীর চোখের আগুনে আবার জল আসে। একলা ঘরে কেঁদে বুক ভাসিয়ে দেয় ও। নাওয়া খাওয়া কিছুই ভালো লাগে না। কানুর জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখে। বেড়ায় গোঁজা কলমটা লুকিয়ে রাখে। গত রাতে ও স্বপ্ন দেখেছিল যে রাজার লোক এসে পুরো ঘর তছনছ করে কলম খুঁজছে। কলমটার জন্য শবরীর উপর অত্যাচার করে। তবু কলমটি দেয়নি ও, কিছুতেই বলেনি কোথায় রেখেছে। রাজার লোকেরা শেষ পর্যন্ত ওকে শাসিয়ে চলে গেছে। ঘুম ভাঙার পর কেমন নিথর হয়েছিল শবরীর অনুভূতি। রাত কত বুঝতে পারেনি। বিছানা থেকে উঠে জানালায় দাঁড়িয়েছিল। বুকটা হু-হু করে ওঠে, ভেঙে আসতে চায়, শবরী নিজেকে ধরে রাখতে পারে না। বিছানা ভালো লাগে না, ঘর ভালো লাগে না। ইচ্ছে করে অনেক দূরে চলে যেতে। কানু ফিরে এলে কানুকে নিয়ে অন্য কোথাও চলে যাবে ও। সেখানে মনের সুখে গীত লিখবে কানু। অনেক লোক নিয়ে আসর বসবে। সেখানে গীত পড়া হবে, গাওয়া হবে। কানুর বুকের ভাষা সবার বুকের ভাষা হয়ে মুখে মুখে ফিরবে। ওদের আর কোনো দুঃখ থাকবে না। তেমন একটা জায়গা কি হবে না যেখানে ওদের মুখের ভাষার গীত লিখলে রাজার লোক মারতে আসবে না? যেখানে রাজা-প্রজা সব এক হয়ে যাবে। তেমন একটি জায়গা কি কোনোদিন হবে না? খুব বড়ো জায়গা ওদের দরকার নেই। ছোটো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটু জায়গা হলেই হয়। ওরা ঠাসাঠাসি করে থাকবে। মোটা কাপড়, মোটা ভাতে ওদের দিন কেটে যাবে। স্বপ্ন দেখে শবরী, স্বপ্ন দেখলে মন ভালো হয়ে যায়, অন্তত কিছুক্ষণ ওর কষ্ট থাকে না।

স্বপ্ন দেখে কাহ্নুপাদ, বন্ধ কুঠরির অন্ধকারে বসে স্বপ্ন দেখা ছাড়া ও আর কিছু করতে পারে না। চুনের গন্ধে যখন শ্বাস নিতে কষ্ট হয়, দম আটকে আসে, তখন স্বপ্ন দেখলে নিশ্বাস সহজ হয়। বুক হালকা হয়ে যায়। সারা দিনে একবার খাবার দেয় দ্বাররক্ষী। তাও পরিমাণের তুলনায় একদম কম, পেট ভরে না। ক্ষুধায় নাড়িভুঁড়ি ওলটপালট করে। কাহ্নুপাদ নির্বিকার থাকার চেষ্টা করেও পারে না। দেয়ালের গায়ে লাথি মারে, ঘুঁষি দেয়। হাতে ব্যথা পায়। তখন চিৎকার করে দেবল ভদ্রকে গালাগাল করে। চার দেয়ালের ফাঁকফোকরে সে গালি বাইরে যায় না, তাই কেউ ছুটে আসে না। দমাদম ঘুঁসি মারে না। টেনেহিঁচড়ে বাইরে নিয়ে ফেলে না। অথচ কাহ্নুপাদ চায় কেউ ছুটে আসুক। দরজা খুলুক, ও আলো দেখতে পাবে। সে আলোয় দৃষ্টি ধুয়ে নেবে। চিৎকার করে এক সময় নিজের জায়গায় ফিরে আসে। আজ এক মাস চার দিন হল ওকে এ ঘরে আটকে রেখেছে। এভাবেই ওকে দুর্বল করতে চাইছে দেবল ভদ্র। সেদিনের জিজ্ঞাসাবাদের পর আর একদিনও এ ঘর থেকে বের করেনি। কাহ্নুপাদ বুঝতে পারে ক্রমাগত ওর শরীর দুর্বল হচ্ছে। মাথা ঝিমঝিম করে, পা কাঁপে। শরীরে শক্তি নেই যেন। অথচ সব কিছু কমে গেলেও কাহ্নুপাদের সাহস কমেনি। তা ক্রমাগত জমাট হচ্ছে এবং নিরেটও। সেখানে কোনো ছিদ্র নেই। ছিদ্রপথে ভয়ের স্রোত গলগলিয়ে ঢোকে না। আর সে-কারণেই কাহ্নুপাদের চিত্তে সুখ থইথই করে। ও চুনের ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে একটা নতুন দ্বীপের স্বপ্ন দেখে। সে দ্বীপকে নিজেদের মতো করে কেমন করে গড়ে তুলবে সে পরিকল্পনাও করে। তিন দিন পর রাজার লোক ওকে দরবারে নিয়ে এলে দেবল ভদ্রের ক্রূর হাসি দু-কানে এসে বাজে। কাহ্নুপাদের মাথা ঝিমঝিম করে। দাঁড়াতে কষ্ট হয়। ও ধপ করে মেঝের ওপর বসে পড়ে।

'কী রে তেজ কমেছে?'

কাহ্নুপাদের মাথা মাটির দিকে। দেবল ভদ্রের দিকে তাকায় না। এভাবেই উপেক্ষা করতে চায়। ওর বার বার মনে হয় ওর পায়ের নীচে শক্ত মাটি আছে, কিন্তু দেবল ভদ্রের নেই। দেবল ভদ্রের সব প্রতাপ, ক্ষমতা, দম্ভ, অহংকার নিয়েও সে চোরাবালির ওপর দাঁড়িয়ে আছে।

'এই মাথা ওঠা।'

কাহ্নুপাদ মাথা সোজা করে। সঙ্গে সঙ্গে বুকটাও টান হয়ে যায়।

'কেমন বুঝছিস? এবার আমার কথায় রাজি তো?'

কাহ্নুপাদ কথা বলে না। অন্যদিকে তাকিয়ে থাকে।

'এই, কথা বলছিস না যে? লিখবি আমাদের রাজার কথা। লিখবি আমার কথাও। রাজা তো দয়ালু। কত মহৎ। প্রজাদের সুখের জন্য রাজার প্রাণ কাঁদে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

‘না।’

শব্দটা কাহ্নুপাদের মুখ থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসে।

‘না?’

দেবল ভদ্র মাটিতে পা আছড়ায়।

‘আমার মুখের ওপর না বলার সাহস তোর কোথা থেকে হল শুনি? ধরা-কে-সরা জ্ঞান করতে শিখেছিস?’

‘না তা কেন? আমার ভাষায় আমার লোকের কথাই হয়। রাজারাজড়ার কথা হয় না।’

‘ঠিক আছে মজাটা টের পাবি। একবারে মারব না তোকে, তিলে তিলে মারব। এই নিয়ে যা একে। আগামী রোববার ওর দু-হাত কেটে ফেলা হবে। তোরা ওর শাস্তির ব্যবস্তা কর।’

রক্ষী কাহ্নুপাদকে টানতে টানতে নিয়ে যায়।

একজন ওকে বলে, ‘কেন যে মিছেমিছি গোঁ ধরেছিস? হাত দু-খানা গেলে লিখবি কী দিয়ে?’

‘যা বুঝিস না তা বলতে আসিস না।’

কাহ্নুপাদ রুখে দাঁড়ায়।

‘বাবা তেজ এখনও কমেনি। শালার মরার ভয়ও নেই।’

কাহ্নুপাদের হাঁটতে কষ্ট হয়। মাথার ঝিমঝিম ভাবটা তীব্র হয়েছে। কাহ্নুপাদের বমি বমি লাগছে। অন্ধকার কুঠরিতে ফিরে আসার পর কাহ্নুপাদ অবসন্নের মতো বসে থাকে। ইচ্ছে করে পেট ভরে ভাত খেতে। ইচ্ছে করে শবরীকে দেখতে। ইচ্ছে করে ডোম্বির কাছে ছুটে যেতে। দেয়ালের গায়ে মাথা ঠেক দিয়ে রেখেও কাহ্নুপাদ স্বস্তি পায় না। ওর মুখে দাড়ি গজিয়েছে, চোখের নীচে কালো হয়ে গেছে। বুকের পাঁজর ঠেলে বেরিয়ে আসতে চায়, চোয়াল উঁচু হয়ে উঠেছে, পা সরু কাঠি। কাহ্নুপাদ বড়ো করে নিশ্বাস নেয় এবং ছাড়ে, তারপর মেঝেতে লুটিয়ে পড়ে।

ডোম্বির মেদহীন ধারালো শরীর ঝকঝকে ইস্পাতের ফলা হয়ে গেছে। এখন আর শুধু নৌকা বাইতে ভালো লাগে না। মনে হয় দেশাখের কাছে তিরধনুক ছোঁড়া শিখবে। তাহলে হয়তো একটা কিছু করতে পারবে। শুধু দড়ি, কাছি আর বইঠায় কিছু হয় না। এখন হাত চায় অন্য কিছু, চায় অন্য জিনিস। ডোম্বি অন্যমনস্ক হয়ে নৌকার ওপর বসে থাকে। দেবল ভদ্রের ভাগনের মুখ ভেসে ওঠে। বড়ো জ্বালায়। রাতের অন্ধকার হলেই হুলো বেড়াল হয়ে দরজার পাশে এসে শব্দ করে। ডোম্বির মনে হয়, বড়ো গ্লানি। এ গ্লানির কথা কানু তার গীতে লিখেছে। কানু ব্যঙ্গ করেছে। অপমানে ডোম্বির বুক জ্বালা করে। আর এটা লেখার জন্যেই কানুকে ধরে নিয়ে গেছে। দপ করে জ্বলে ওঠে ও। প্রতিশোধ নিতে হবে। কোমরে গোঁজা ছুরির ওপর হাত রাখে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দু-দিনের মধ্যেই ঘটনা ঘটিয়ে ফেলে ডোম্বি। রাতের অন্ধকারে দেবল ভদ্রের ভাগনে ঘরে আসতেই মনস্থির করে। উত্তেজনার চরম মুহূর্তে ছুরিটা আমূল বসে যায় দেবল ভদ্রের ভাগনের বুকে। বাধা দেবার কোনো সুযোগই ছিল না তার। ওর বিস্ফারিত চোখের দিকে তাকিয়ে চকিতে ওর মনে হয় কানুও কি এমন রক্ত ছড়িয়ে মরে যাবে? বুকটা খালি হয়ে যায়। চেপে আসে নিশ্বাস। ডোম্বি তর্জনী দিয়ে রক্তের রেখায় আঁকিবুকি কাটে। কানুর জন্য বুকটা ফেটে চৌচির। কানু ছাড়া কিছু ভালো লাগে না। ডোম্বির বুকে শোকের পাহাড় গড়ে ওঠে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে।

ভোর হতেই ওর ঘরে লোক এসে ভরে যায়। ডোম্বি কারও দিকে তাকায় না, কথা বলে না। কেবল কাঁদে। মরার আগে কানুর সাথে একটিবার দেখা হল না। দেশাখ একরকম জোর করে ওকে ঘর থেকে বের করে নিয়ে আসে। পিপুল গাছের ছায়ায় বসিয়ে দেয়।

'কাঁদছিস কেন ডোম্বি? ভয় কীসের?'

'ভয়?'

মুহূর্তে ডোম্বির চোখ জ্বলে ওঠে।

'ভয় পেলে আর মারব কেন? ওই বামুনের মুখের ওপর থুতু ছিটাতে ছিটাতে আমি মরতে যাব দেশাখ। শুধু বুকটা ভেঙে যায় যখন ভাবি মরার আগে কানুর সঙ্গে দেখা হবে না।'

'দুঃখ করিস না। আরেক জনমে হবে।'

'তাই যেন হয়।'

ডোম্বি আঁচলে চোখ মোছে। দেশাখ অভিভূতের মতো ডোম্বিকে দেখে। এইমুহূর্তে ওকে ভালোবাসতে ইচ্ছে করে। ডোম্বি বড়ো একরোখা, সাহসী, ডোম্বি দুর্বিনীত। এই সাহসটা সবার বুকের মধ্যে থাকলে ওদের অবস্থা অন্যরকম হত।

গাঁয়ের লোকের মুখে কথা নেই। ঘটনার আকস্মিকতায় এবং পরবর্তী সময়ের ভয়াবহতার চিন্তায় সকলেই নির্বাক। ওরা ভাবতে পারছে না যে এরপর কী করবে? কীভাবে বাঁচবে? নিমাই বুড়ো ভিড়ের মধ্য থেকে দেশাখকে একপাশে ডেকে নিয়ে আসে।

'কেমন হল দেশাখ?'

'কী আর? কানুদার অপমানের প্রতিশোধ নিল ডোম্বি।'

'কিন্তু এখন আমরা বাঁচব তো? ওরা আমাদের শেষ করে দেবে।'

'বাঁচতে না পারলে মরাই ভালো কাকা।'

'তোদের কথাবার্তা আমি বুঝি না। তোরা পেয়েছিস কী বল তো?'

'আহ্ কাকা চুপ করুন। এমনিতে গাঁয়ের লোক ভয়ে চুপসে গেছে, আপনি এমন করলে ওরা আরও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভয় পাবে।'

নিমাই বুড়ো হাউমাউ করে কেঁদে ওঠে।

'চুপ করুন কাকা, চুপ করুন।'

ছেলে বুড়ো নারী সকলের চোখ ছলছল করে।

কত পাপ জমা হয়েছে আমাদের? কী পাপে এমন হল? কান্নার রোল ওঠে। সকলেই কাঁদে। দেশাখ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। কাকে বোঝাবে? এখনও যারা নিজেদের কথা ভাবতে শেখেনি তাদের কাছে দেশাখের উপদেশ অর্থহীন। ও দাঁত কিড়মিড় করে। এখন ওদের জন্যে বড়ো ধরনের একটা আঘাত প্রয়োজন। সে আঘাতে ওদের চেতনার পলকা ছায়া ভেঙে গুঁড়িয়ে যাবে। তারপর ওরা দাঁড়াবে, কোমর সোজা করে, বুক টান করে। তার আগে নয়। ও চুপচাপ সরে পড়ে। ডোম্বির কাছে এসে দাঁড়ায়।

'এতদিনেও কানুকে ছাড়ল না। কানুকে কী ওরা মেরে ফেলবে দেশাখ?'

'জানি না।'

দেশাখের গলা কেঁপে যায়। অন্যদিকে তাকিয়ে থাকে।

'কানু আমাদের সবার জন্যে লড়ছে। একটা বামুন মেরে দেখালাম আমরাও মারতে পারি। আমরা শুধুই ছোটোলোক নই। এই সুখ নিয়েই আমি মরতে পারব দেশাখ।'

ডোম্বির মুখে ক্ষীণ হাসি।

'দেশাখ আমার কথা তোর মনে থাকবে?'

'ডোম্বি। ডোম্বি রে।'

দেশাখ কথা বলতে পারে না। দেশাখের যেন কী হয়। ওর ঠোঁট কাঁপে।

'তোর ছেলে হলে তাকে আমার কথা বলবি দেশাখ?'

'বলব রে বলব। তোকে আমরা কেউ কোনোদিন ভুলব না। আমাদের তেমন দিন এলে তোর সোনার মূর্তি বানিয়ে রাখব ডোম্বি।'

দেশাখ কান্না চাপতে দ্রুত ওর সামনে থেকে সরে যায়। ডোম্বি পিপুল গাছে ঠেস দিয়ে চোখ মোছে। রাজার লোক যখন গাঁয়ে আসে সূর্য তখন মাথার ওপর। ডোম্বির হাত দুটোই পিছমোড়া করে বেঁধে, কোমরে দড়ি দিয়ে টানতে টানতে নিয়ে যায়। আশেপাশে কেউ নেই, ডোম্বি একা। এতক্ষণ যারা মজা দেখার জন্য ভিড় জমিয়েছিল তারা রাজার লোক আসতে দেখেই পালিয়েছে। শুধু দেশাখ অনেকদূর থেকে ওর সঙ্গে ঘাট পর্যন্ত আসে, কাছে আসতে পারে না। রাজার লোকদের শরীরে আগুন, হাতে লাঠি, মুখে গালাগালির বর্ষণ। নৌকায় ওঠার সময় ওদের একজন ডোম্বির পাছায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লাথি মারল। তাল সামলাতে না পেরে ডোম্বি হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল নৌকার ওপর। একজন ওর পিঠের ওপর পা রাখল। ডোম্বি ওঠার চেষ্টা করতে গিয়ে পারল না। ওর হাত বাঁধা বলে আবার গড়িয়ে পড়ে গেল। দেশাখের ইচ্ছে করল ছুটে গিয়ে ডোম্বিকে বুকে তুলে নেয়।

এই ঘটনার পর কারও চোখে ঘুম নেই। সারা পল্লিতে অখণ্ড নিস্তব্ধতা। কোনো বাচ্চা কেঁদে উঠলেও সবাই সন্ত্রস্ত হয়ে যায়। এই বুঝি রাজার লোক এল। একলা ঘরে ঘুম আসে না শবরীর। ডোম্বির জন্যে মন খারাপ করে। ও কানুর জন্য প্রতিশোধ নিয়েছে এটা ভাবলেও বুক টনটন করে। রাগ হয়। ক্ষিপ্ত হয়ে বেড়ায় গোঁজা ময়ূর পালক ছিঁড়ে বাতাসে উড়িয়ে দেয়। জানালায় বসে থেকে লোক দেখার চেষ্টা করে।

কিন্তু কাউকে দেখা যায় না। একজন লোক দেখার জন্যে শবরীর বুক খাঁ-খাঁ করে। মাঝে মাঝে দেশাখ আসে। শুকনো মুখে বসে থাকে। দু-চারটে কথা হয়। দেশাখের গলা ভাঙা, ফ্যাসফ্যাস করে।

'কিছু ভেবো না বউদি? কানুদা নিশ্চয় ফিরে আসবে।'

'কানু তো ওদের কথা শুনছে না। কানুকে ওরা মেরেই ফেলবে।'

অকস্মাৎ দু-জনের কথা ফুরিয়ে যায়। শবরী জানালার কপাটে মাথা রেখে কেঁদে ফেলে।

আজও সন্ধ্যার দিকে দেশাখ আসে। ডোম্বিকে নিয়ে যাবার পর থেকে ও কোথাও দু-দণ্ড বসে স্বস্তি পাচ্ছে না, ছটফট করছে। অমাবস্যার রাত। ঘুটঘুটে অন্ধকার চারদিকে। শবরী ঘরে আলো জ্বালেনি। দেশাখের পায়ের শব্দে চমকে ওঠে।

'কে?'

'আমি দেশাখ বউদি।'

'এসো।'

'আলো জ্বালোনি কেন?'

'ভালো লাগছে না।'

'তোমার মুখে এ ছাড়া কথা নেই। আলো জ্বালো দেখি।'

শবরী মাটির প্রদীপ জ্বালায়। মিটমিটে আলোয় অন্ধকার তেমন কাটে না। শবরী হরিণের চামড়া বিছিয়ে দেয়। দেশাখ ধপ করে বসে হাঁটুতে মুখ গোঁজে। শরীরের ভার কোথাও ফেলে দিতে ইচ্ছে করে। আজ ওর হৃদয় শুধু ডোম্বির জন্যে, সেখানে আর কেউ নেই। এমনকি বিশাখাও না। সকালের ঘটনার পর থেকে ডোম্বি ওর হৃদয়ে মূর্ত হয়ে উঠেছে—দড়ি, কাছি, বইঠা হাতে দুর্বিনীত ভঙ্গিতে। এর বাইরে ডোম্বির অন্য কোনো ভঙ্গি নেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

‘দেশাখ?’

‘বলো।’

‘ডোম্বি কি আমার চাইতেও কানুকে বেশি ভালোবাসত?’

‘এসব কথা থাক বউদি।’

‘তুমি এড়িয়ে যাচ্ছ?’

‘না তা নয়। আমি বুঝি ওদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিবাদ জানানো প্রয়োজন ছিল। ডোম্বি সেটা করেছে। কানুদা করেছে। একে একে আমরা সবই করব।’

‘আর আমি বুঝি ডোম্বি আমার চাইতেও কানুকে বেশি ভালোবাসত। সে-কারণে ওর জন্যে মরতে পেরেছে। আমি পারিনি।’

‘ডোম্বিকে তুমি চিনতে পারোনি বউদি। তোমার মন খারাপের কারণ নেই।’ শবরী কথা বলে না, দেশাখও না। বেশি কথা বলতে ওর ভালোও লাগে না। অনেকক্ষণ দু-জনের চুপচাপ কেটে যায়।

‘কী ভাবছ দেশাখ?’

‘কিছু না।’

‘অমাবস্যার রাতে এমন অন্ধকার আর কখনো দেখিনি।’

‘এটা তোমার মনের ভুল।’

‘মনের ভুল?’

‘হ্যাঁ, তুমি দুশ্চিন্তায় আছ, তাই এমন ভাবছ। সব অমাবস্যার রাতই একরকম। কই তেমন অন্ধকার তো আমার মনে হচ্ছে না।’

‘কোনোকিছুই আমার ভালো লাগে না দেশাখ। একা একা থাকতে আমার ভয় করে।’

বাইরে পেঁচা ডাকে। শব্দটা দু-জনের মনের মধ্যে খট খট আওয়াজ ওঠায়, যেন ভীষণ দুঃসংবাদ বহন করে একটা ঘোড়া ছুটে আসছে।

‘কিছু বলছ না কেন দেশাখ?’

‘আজ আমারও কিছু ভালো লাগছে না। আমি যাই। তোমার কিছু দরকার হলে আমাকে খবর দিও।’

শবরী কিছু বলার আগেই টিলার গা বেয়ে নামে দেশাখ। অন্ধকারে ওকে দেখা যায় না। শবরী আলো নিভিয়ে চুপচাপ শুয়ে থাকে। দেশাখ থাকলে সময়টা ভালো কাটত। এখন শবরী কিছু করতে পারছে না। কান পেতে একটা না পেঁচার ডাক শোনে।

দেশাখ হাঁটতে হাঁটতে বিশাখাদের বাড়ির কাছে আসে। চারদিক নির্জন, ভীষণ অন্ধকার, তবু একটুও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভয় করে না ওর। হাঁটতে ভালো লাগে। এই মুহূর্তে ঘরে থাকতে মন চায় না। ঘরে ফিরলেই ভুসুকুর মুখোমুখি হতে হয়। ভুসুকু ওর দিকে কেমন দৃষ্টিতে যেন তাকায়, মুখে কিছু বলে না, অথচ ওই চোখের ভাষা ভয়ানক তীব্র। ভুসুকুর দৃষ্টি পালটে গেছে। তেমন দৃষ্টি থাকলে মুখ দিয়ে কথা বলতে হয় না। দেশাখ ভুসুকুর সামনে থেকে পালিয়ে বেড়ায়। ভুসুকুর জন্যে ওর মন কেমন করে। কিছুদিনের মধ্যে ও হয়তো পাগল হয়ে যাবে।

এসব ভাবনা ভাববে না বলে দেশাখ মাথাটা ঝাঁকিয়ে নিয়ে টিলা বেয়ে বিশাখাদের বাড়ির দরজায় আসে। বিশাখার মা শুকনো মুখে বসে আছে।

'কেমন আছ মাসি?'

'আর থাকাথাকি। বিশাখার বাবার শরীর ভালো না। তুমি বোসো বাবা।'

দেশাখ দরজার কাছেই বসে। ঘরে মিটমিটে আলো। একসাথে ভাই-বোনগুলো ঘুমুচ্ছে। বিশাখা ওর বাবার মাথার কাছে বসে আছে। বুড়ো কাশছে।

'আমাদের কী হবে বাবা?'

'কেন মাসি?'

'সকালে কেমন একটা কাণ্ড হল? এমনিতেই আমাদের অবস্থা ভালো না। তারপর সারাক্ষণ মনে হচ্ছে ওই বুঝি রাজার লোক এল। বিশাখা তো সারা দিন কিছু খায়নি, কেবলই ভয় পাচ্ছে। জানালার কাছে বসে থাকে, রাস্তা দেখে।'

দেশাখ চুপ করে থাকে। ভয় কোথায় নেই? ওর নিজের মনের মধ্যেও আছে। সেটা প্রবল নয়, ও সাহস রাখতে পারে।

'তোমার মা কেমন আছে দেশাখ?'

'ভালো?'

'বাবা?'

'বাবা বেশি ভালো না। এখন তখন অবস্থা। বড্ড কষ্ট পাচ্ছে।'

'তুমি বোসো। বিশাখা ওকে চারটে মুড়ি দে।'

বিশাখার মা উঠে চলে যায়। দেশাখ কী করবে বুঝতে পারে না। বিশাখার বাবার গলা থেকে ঘড়ঘড় শব্দ আসছে। দেশাখ একমনে সেটা শোনে।

'মুড়ি খাও।'

বিশাখার মুখ শুকনো। কণ্ঠ দিয়ে স্বর বেরুতে চায় না। দেশাখ হাসে। আস্তে করে বলে, 'ভয় পাচ্ছ কেন? তোমাকে না তিরধনুক চালানো শিখিয়েছি?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেশাখ মুড়ির বাটি টেনে নিয়ে একমুঠি মুখে পোরে। বিশাখা চলে যায়। ও কথা বলতে পারে না। দেশাখের মতো বুকের পাটা ওর নেই। সাহসের কথা ওর মুখে আসে না। সেজন্যে কিছু বলতে পারে না।

বিশাখার মা কাছে আসতেই দেশাখ উঠে দাঁড়ায়।

'মাসি শবরী বউদি একা থাকতে ভীষণ ভয় পাচ্ছে। আজ রাতে বিশাখা তার ওখানে থাকুক। আমি বলেছি বিশাখাকে এনে দেব।'

বিশাখার মা চুপ করে থাকে।

'কিছু অসুবিধা হবে না মাসি। ভোরে উঠেই ও চলে আসবে।'

'আচ্ছা নিয়ে যাও। মেয়ে বড়ো হলে কত যে চিন্তা হয়।'

বিশাখার মা দেশাখকে না করতে পারে না। দেশাখ বলেছে মাস দুয়েকের মধ্যে বিয়েটা হয়ে যাবে।

দু-জনে টিলা বেয়ে নেমে আসে।

'দেখলে তো কেমন কৌশলে তোমাকে নিয়ে এলাম।'

'মানে?'

'শবরী বউদির ওখানে তুমি রাতে থাকবে সেটা ঠিক। তার আগে আমার সঙ্গে কিছুক্ষণ। বউদি কিছু বলেনি। তোমাদের ঘরে বসে থাকতে খারাপ লাগছিল। ভাবছিলাম তোমাকে নিয়ে বেরুই কেমন করে। হঠাৎ মাথায় বুদ্ধিটা এসে গেল।'

'উঃ তুমি—'

'গাল দিও না। তুমিও খুশি হয়েছ আমি জানি।'

দু-জনে হাসে। অন্ধকারে কেউ কারও মুখ দেখতে পায় না। শুধু হাতে হাত ধরা। দেশাখের মনে হয় সারা দিনের পর এতক্ষণে ও খোলা হাওয়ায় এসে দাঁড়িয়েছে। গুমোট অবস্থাটা কেটে গেছে।

'বিশাখা, ইচ্ছে করছে তুমি আর আমি প্রাণখোলা হাসিতে সবাইকে মাতিয়ে তুলি। সকলের বুকের ভয় তাড়িয়ে দেই।'

'তা কেমন করে হবে? আমাদের সর্বনাশ হবে।'

'ঠিক আছে এখন এসব কথা থাক। তুমি একটা গান গাও বিশাখা।

'আমি গান জানি না।'

'ডোম্বি খুব ভালো গাইতে পারত।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবার আবহাওয়া ভারী হয়ে যায়। ঘুরেফিরে প্রসঙ্গ এক।

‘ডোম্বিকে ওরা মেরে ফেলবে দেশাখ?’

‘হয়তো।’

‘আমাদের উৎসবগুলো মাতিয়ে রাখবে কে?’

দেশাখ কথা বলে না।

‘কানুদার কী হবে দেশাখ?’

‘জানি না।’

‘খারাপ কিছু ভাবতে আমার ভালো লাগে না।’

‘আমারও না।’

দু-জনে চুপচাপ হাঁটে। এই অন্ধকারে হাঁটতে ওদের ভালোই লাগে। শবরীর টিলা বেশ খানিকটা পর। চালতা গাছের কারুকাজময় ঘন পাতার আড়ালে বসে পেঁচা ডাকে। মহুয়া ফুলের গন্ধ আসছে।

‘এখনও তোমার ভয় করছে বিশাখা?’

‘হ্যাঁ।’

‘জোরে জোরে কথা বলো ভয় কেটে যাবে।’

‘জোরে কথা বলতেও আমার ভয়।’

‘তাহলে কী করব?’

‘জানি না। উহ্ যা অন্ধকার।’

‘চলো দৌড়াই এবং প্রাণখুলে হাসি।’

দু-জনে হাত ধরাধরি করে দৌড়ায়। বিশাখা হোঁচট খেলে দেশাখ ওকে বুকে তুলে নেয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরদিন সকালে ডোম্বিকে ফাঁসি-গাছে ঝুঁলিয়ে দেয়া হল। চারদিক থমথম করছে। ভয়ে কেউ ঘর থেকে বের হয় না। দেশাখ নদীর ঘাটে বসে থাকে। কী করবে বুঝতে পারে না। নিমাই এসে ওর কাঁধে হাত রাখে। বলে, 'দেশাখদা চলো তিরধনুক নিয়ে বনে যাই। হাত কেমন নিশপিশ করছে।'

'আজ থাক নিমাই।'

'কেন?'

'ডোম্বির জন্যে মন কেমন করছে? আমারা কেউ ডোম্বির মতো সাহসী হতে পারলাম না।'

'চলো ডোম্বির লাশ নিয়ে আসি।'

'দেবে না তো।'

'জোর করে আনব।'

'সেটা আমিও ভেবেছি। কিন্তু লাভ কী? তাহলে হয়তো কানুদাকেও মেরে ফেলবে। কানুদাকে আমাদের ভীষণ দরকার নিমাই।'

'ঠিক বলেছ। কানুদাকে ছাড়া আমরা কেমন একা হয়ে যাই।'

দু-জনে বসে থেকে নদীর বয়ে যাওয়া দেখে, আকাশ দেখে, দূরের বন দেখে এবং দু-জনে একসঙ্গে লক্ষ করে আজ কোনো খেয়া পারাপার নেই। ডোম্বির নৌকা বাতাসের ধাক্কায় এপাশ ওপাশ করে। রাজার আইন ফাঁসি-গাছে তিনদিন ঝুলিয়ে রাখা হবে ডোম্বির লাশ।

সেদিনই কাহ্নুপাদকে বের করে নিয়ে আসা হল চুনের ঘর থেকে। ঠিকমতো হাঁটতে পারে না, মাথা টলে। দ্বাররক্ষী ওকে ধাক্কা দিয়ে দরজা দিয়ে বের করে দিতে দিতে বলে, 'তোমাদের একটাকে তো শেষ করা হয়েছে। এবার তোমার পালা।'

কাহ্নুপাদ দেয়াল ধরে নিজেকে সামলে নিতে নিতে আঁতকে ওঠে। বুকের ধুকপুকানি বেড়ে যায়। তবু জোরে শ্বাস নিয়ে বলে, 'কাকে শেষ করা হয়েছে?'

'ওই যে মেয়েলোকটা নৌকা বাইত? সাহস কত, বামুনের গায়ে ছুরি বসিয়ে মেরে ফেলেছে। বাপের জন্মেও এমন কথা শুনিনি। কী যে শুরু করেছে এরা।'

কাহ্নুপাদের মনে হয় ও পায়ের তলায় মাটি খুঁজে পেয়েছে। হাতের কাছে শক্ত অবলম্বনও। না খাওয়ার ফলে শরীরটা কেমন ঝামিয়ে গেছে। কেবল এদিকে ওদিকে লোপাট খায়। এতক্ষণে কাহ্নুপাদ সোজা হয়ে দাঁড়ায়। ডোম্বির হাসি বুকের ভেতরে বাজে, 'কী গো কানু বড্ড ভয় পেয়েছিলে বুঝি? আর কেউ না থাকুক আমি তো আছি তোমার কাছে। একটুও ভয় পেয়ো না তুমি।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাজদরবারে যাবার পথে দূর থেকে ডোম্বির লাশ দেখতে পায় ও। কাহ্নুপাদ চোখ ফেরাতে পারে না। অবিকল তেমনই আছে ডোম্বি। একটুও বদলায়নি। চোখ ঠিকরে আসেনি, জিহ্বা ঝুলে পড়েনি। দড়ি, কাছি, বইঠা হাতে সেই দুর্বিনীত অথচ মোহন ভঙ্গি, যাকে বুকের ভেতর রেখেও কোনোদিন বোঝা যায় না। যার সাহসের থই পাওয়া মুশকিল। কান্নায় ভেঙে পড়ে কাহ্নুপাদ।

'হয়েছে আর অত ঢং দেখাতে হবে না। একটু পরে তো তুমিও ওর সঙ্গী হবে।'

রক্ষীর গুঁতো খেয়ে স্থির হয়ে যায় কাহ্নুপাদ। চোখের সামনে সব কিছু সাদা লাগে।

দেবল ভদ্র গর্জন করে ওঠে, 'না ওকে ফাঁসি-গাছে ঝোলানো হবে না। ওকে মেরে ফেলব না। ওর শাস্তি হবে তিলে তিলে। ধুকে ধুকে মরবে ও। ওর হাতদুটো কেটে ফেলো। গীত লেখার সাধ বুঝুক।'

তারপর আর কিছু মনে নেই কাহ্নুপাদের। জ্ঞান ফেরার পর দেখে শবরী ওর মুখের ওপর ঝুঁকে আছে।

'এখন দিন না রাত?'

'বিকেল হয়েছে।'

'ও।'

'ওগো, এখন কেমন লাগছে?'

কাহ্নুপাদ কথা বলে না। শবরী মুখ হাঁ করিয়ে দুধ দেয়। কখনো তা গলা দিয়ে নেমে যায়। কখনো ঠোঁটের পাশ দিয়ে গড়িয়ে পড়ে। শরীরে অসহ্য যন্ত্রণা। মাথা তুলতে পারে না কাহ্নুপাদ। জগা কবিরাজ ওর কেটে ফেলা হাতের মাথা গাছগাছালির ওষুধ দিয়ে বেঁধে দিয়েছে। এরই মাঝে অনুভূতি তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে। শুধু মনে হয় ওর চারপাশে অনেক লোক, অনেক কথা, অনেক গুঞ্জন। আজ সবাই ওর কাছাকাছি এসে গেছে। সবাই কাহ্নুপাদের কথা বুঝতে পারছে। কাহ্নুপাদ জানে না যে পর পর দুটো ঘটনায় ওর আশেপাশের লোকজন বড়ো দ্রুত বয়স্ক এবং অভিজ্ঞ হয়ে উঠেছে। একসময় সবাই চলে গেলেও দেশাখ চুপচাপ বসে থাকে। অজ্ঞান অবস্থায় রাজার লোক কাহ্নুপাদকে নদীর ধারে ফেলে গেলে ওরা ওকে নিয়ে আসে। বারুয়া মাঝি ওদের খবর দিয়েছিল। ঠিক সময়ে ওরা খবর পেয়েছিল, দেরি হলে হয়তো কাহ্নুপাদকে বাঁচানো যেত না। সেই থেকে দেশাখের মুখে কথা নেই। ওর মনে হয় ওর বুকের গুহার মুখে কেমন করে যেন একটা বড়ো পাথর পড়ে গেছে। সেটা ঠেলে কিছুতেই কথা বেরিয়ে আসতে পারছে না। দেশাখ বোবা হয়ে থাকে। কাহ্নুপাদের আঙুলগুলো নেই। নইলে সেগুলো জড়িয়ে ধরলে দেশাখ একটা অবলম্বন পেত।

সন্ধ্যার দিকে চোখ খোলে কাহ্নুপাদ। দেশাখ ওর মুখের উপর ঝুঁকে আছে।

'কেমন লাগছে কানুদা?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটু ভালো।

‘চুপচাপ শুয়ে থাকো। সব ঠিক হয়ে যাবে। জগা কবিরাজের ওষুধ তো নয় যেন ধন্বন্তরি।’

‘এতদিনে আমার ভুল ভাঙল দেশাখ। আমি এখন বুঝতে পারছি যে শুধু রাজদরবারেই কোনো ভাষাকে টিকিয়ে রাখতে পারে না। ওরা যতই সংস্কৃতের বড়াই করুক ওটা কারও মুখের ভাষা নয়। বাঁচিয়ে রাখবে কে? আমাদের ভাষা আমাদের মুখে মুখেই বেঁচে থাকবে রে দেশাখ।’

‘ঠিকই বলেছ কানুদা।’

‘বংশপরম্পরায় আমাদের মুখের ভাষা নদীর মতো বইবে। কোনোদিন তা মরে-হেজে যাবে না।’

কাহ্নুপাদ হাঁফায়, কথা বলতেও কষ্ট।

‘ওগো আর কথা না। তুমি ঘুমোও।’

কাহ্নুপাদ চোখ বোঁজে। বড়ো করে শ্বাস নেয়। জগা কবিরাজের ওষুধে কাজ হয়েছে। ব্যথা এখন অনেক কম। দেশাখ আস্তে উঠে আসে।

‘আজ রাতে তুমি আর আমি সারারাত কানুদার পাশে বসে থাকব বউদি। আমরা কেউ ঘুমুব না।’

‘ঘুম কি আর আসবে!’

‘আমি একটু ঘুরেফিরে আসি বউদি। দেখি নিমাই ওরা কী করছে। ওদেরকেও ডেকে নিয়ে আসি। খুব সজাগ থেকো বউদি!’

দেশাখ চলে গেলে শবরীর কেবল কান্না পায়। অনেক রাতে শবরীর কান্নায় ঘুম ভেঙে যায় কাহ্নুপাদের।

‘কাঁদছ কেন সই?’

শবরী আঁচলে চোখ মোছে।

‘আমার কিছু হয়নি সই। এখন থেকে আমি বলব আর তুমি লিখবে। দেবল ভদ্র ইচ্ছে করলেই কি আর আমার গীত লেখা বন্ধ করতে পারবে? তুমি আমার কাছে এসে ঘুমোও।’

ঘুম আসে না শবরীর। কাহ্নুপাদ আবার ঘুমিয়ে যায়। শবরী কাঁথাটা কাহ্নুপাদের গলার কাছ পর্যন্ত টেনে দেয়। কপালের চুলগুলো সরিয়ে দেয়। কানু একদম শুকিয়ে গেছে। গালের হাড় ঠেলে বেরিয়েছে। অনেকদিন ঘুমোয় না কানু। শবরীর আশ্রয়ে এখন নির্বিবাদে ঘুমোচ্ছে। শবরীর হৃদয় ফুঁসে ওঠে। ‘কানুকে কেউ আর আমার কাছ থেকে নিয়ে যেতে পারবে না।’ শবরী জানালার কাছে এসে দাঁড়ায়, যে-কোনো সময় কানু উঠতে পারে।

রাত কত বুঝতে পারে না শবরী। আজ পূর্ণিমা, চাঁদের আলোয় ভেসে গেছে প্রান্তর। এমন ফুটফুটে জ্যোৎস্না ও অনেকদিন দেখেনি। হঠাৎ করে শবরীর খুব ভালো লাগে। দেশাখ এখনও আসছে না

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেন? কোথায় গিয়ে আটকে গেল? তখুনি মৃদু কোলাহল ওর কানে আসে। আস্তে আস্তে সেটা বাড়ে। শবরী ভালো করে খেয়াল করে। পুব পাড়ার ওদিকে আগুনের শিখা দেখা যাচ্ছে। শবরীর ভয় হয়। কিছু বুঝতে পারে না। ও দরজা খুলে বাইরে এসে দাঁড়ায়। ঠিকই ধরেছে, বাড়ি পুড়ছে। চড়চড় শব্দে বাঁশ ফাটছে। তবে কি রাতের অন্ধকারে রাজার লোক ওদের ওপর হামলা চালাল? শবরীর হাঁটু কাঁপে ঠকঠক করে। ও দরজার কাছে বসে পড়ে। ছুটতে ছুটতে দেশাখ আসে।

'বউদি?'

'কী হয়েছে দেশাখ?'

'রাজার লোকেরা আমাদের বাড়িঘর সব পুড়িয়ে দিচ্ছে।'

'কী হবে?'

শবরী কেঁদে ফেলে।

'পারো কেবল ফ্যালফ্যাল করে কাঁদতে। এখন কান্নার সময় না কি বউদি? নিমাই, অরুণ আরও বাকি সবাইকে লাগিয়ে দিয়ে এসেছি। ওরা অন্ধকার থেকে তির ছুঁড়ে ওদের অনেকগুলোকে ঘায়েল করেছে। তবে ওদের সঙ্গে আমরা পারব না। ওরা তো অনেক। তাই আমি ছুটে এসেছি কানুদার জন্যে। কানুদাকে অন্য জায়গায় নিয়ে যেতে হবে।'

'কোথায় যাবে?'

'বনের কাছাকাছি যে বড়ো টিলাটা আছে ওখানেই আমি সবাইকে যেতে বলেছি। লোকজন ওইদিকে দৌড়ুচ্ছে। নিমাই আগে ব্যাপারটা টের পেয়েছিস। দেখেছিল ওরা দলে দলে আসছে। আমরা অনেক জায়গায় খবর দিতে পেরেছি।'

'যাদের খবর দিতে পারোনি তাদের কী হবে?'

'জানি না।'

দেশাখের গলা ভার।

'দুঃখ এই যে ওদের সঙ্গে আমরা বেশিক্ষণ লড়তে পারলাম না বউদি। তবে প্রতিশোধ আমরা নেবই। আর কথা না। তাড়াতাড়ি চলো বউদি। কানুদাকে ধরো।'

'জিনিসপত্র?'

'বেঁচে থাকলে ওগুলো আবার হবে।'

দু-জনে কাহ্নুপাদকে নিয়ে দৌড়ুতে থাকে টিলার দিকে। চারদিক আগুন, একটা একটা করে বাড়ি পুড়ছে। মানুষের চিৎকার, কান্না ইত্যাদি অনেক শব্দ ভেসে আসে ওদের কাছে।

ওরা সবাই টিলার কাছে গুটিসুটি হয়ে বসে আছে। কারও মুখে কথা নেই, বাচ্চারাও চুপ। মাথার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওপর ছাউনি নেই। বিশাল আকাশ অন্ধকারে ঢাকা। ওরা কতজন আসতে পেরেছে কেউ জানে না। ওরা কারও মুখ দেখতে পায় না। ওরা পরস্পরের নিশ্বাসের শব্দ পায় কেবল। বাতাসে কীসের গন্ধ ভেসে আঁশে। কাহ্নুপাদ নাক টান করে। তারপর বুকটা ধক করে ওঠে।

'কানুদা?'

'কী রে দেশাখ?'

'কানুদা কীসের গন্ধ?'

'চামড়া পোড়ার গন্ধ।'

কাহ্নুপাদ নির্বিকার উত্তর দেয়। গলার স্বর একটুও কাঁপে না।

'কানুদা?'

দেশাখের কণ্ঠ চিরে যায়।

'কেউ হয়তো আরামের ঘুম ঘুমিয়েছিল দেশাখ। জানতেও পারেনি। তাই আগুনে ছাই হয়ে গেছে।'

ভিড়ের মধ্যে নারীকণ্ঠের কান্নার শব্দ ওঠে।

'তোরা কেউ দুঃখ করিস না দেশাখ। আমাদের তেমন একটা জায়গা একদিন হবে। আমরাই রাজা হব। রাজা-প্রজা সমান হবে। আমাদের ভাষা রাজদরবারের ভাষা হবে। তেমন দিনের জন্য আমাদের প্রস্তুত হতে হবে দেশাখ।'

ভিড়ের মধ্যে মৃদু গুঞ্জন শোনা যায়। সকলেই যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলছে। দম আটকানো উৎকণ্ঠা এক-ফুঁয়ে উড়িয়ে দিয়ে নড়াচড়া করছে।

কাহ্নুপাদ দম নিয়ে আবার বলে, 'একটা ছোট্ট ভূখণ্ড আমাদের দরকার। সে ভূখণ্ডটুকু সবুজ, শ্যামল আর পলিমাটি ভরা হলেই হয়। সে ভূখণ্ডের দক্ষিণে থাকবে একটা সুন্দর বিরাট বন আর তার পাশ দিয়ে বয়ে যাবে সাগর।'

কাহ্নুপাদ থামতেই দেশাখ চেঁচিয়ে ওঠে, 'আহ্ কানুদা কেমন করে যে মনের কথা বলো। তুমি না থাকলে আমরা স্বপ্ন দেখতেই পারি না।'

তখুনি চামড়া-পোড়া গন্ধটা বাতাসের প্রবল ঝাপটায় ওদের সবার নাকেমুখে গলগলিয়ে ঢোকে। সে গন্ধ প্রাণভরে বুকে টেনে হো-হো করে হেসে ওঠে ভুসুকু, 'কাহ্নিলা রে আজি ভুসুকু বঙ্গালী ভইলী।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~